অষ্টাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীসুধারঞ্জন দাস

• পুরাতন সংখ্যা •

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা বিশ্বভারতী পত্রিকার সেট সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের অবগতির জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার সাত সংখ্যা পাওয়া যায়। একত্র ১'৭৫।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে নিলে ১'০০।

¶ পঞ্চম হইতে একাদশ বর্ষ ও পঞ্চদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট হাতে ৪'০০ ও রেজেস্ট্রি ডাকে ৬'০০।

¶ ষোড়শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য হাতে ৩'০০, রেজেস্ট্রী ডাকে ৪'০০।

¶ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত।

¶ পত্র লিখলে পুরাতন সংখ্যাগুলির বিস্তারিত সূচী পাঠানো হয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

সারি সারি ইস্পাতের কাঠামোর ওপর ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে আজ অসংখ্য নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে। কালকের পতিত জমি আজ নতুন নগরের রূপ নিয়ে লক্ষ লোকের প্রাণের স্পন্দনে নব-জন্ম লাভ করছে। ইস্পাতের কড়ির ওপর কড়ি সাজিয়ে হাজার হাজার টন কংক্রীট দিয়ে দিকে দিকে আজ আধুনিক নগরের পত্তন হচ্ছে। সহরতলি ও পল্লীগ্রামেও আজ এর ঢেউ এসে লেগেছে— সেখানেও নতুন পরিকল্পনায় আজ মাটির ঘরের স্থানে তৈরী হচ্ছে অসংখ্য পাকা বাড়ি। এই সব উন্নতির মূলকথা ইস্পাত। দেশের সেই ইস্পাত সম্পদ আজ বাড়ছে, তাই আজ দেশের জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এ সমৃদ্ধির অংশীদার হওয়ার। প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী ইস্পাত— এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত শক্তি আজ নিয়োজিত। আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র জাতির সেবা আমরা করছি ; আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
ইস্পাত
মানেই
উন্নততর
জীবন
দি ইণ্ডিয়ান
আয়রন অ্যাণ্ড
স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL
IIC-80 BEN

জয় ৯.৫০–১৩.৫০
বাহার ২.১০–২.৬০
জুপিটর ৭.৫০–১১.৫০
রাজা ১২.৯৫
শরতের শোভাযাত্রা ... চলুন মেলামেশার মহোৎসবে
বীণা ৯.৫০
এই মহোৎসব আজ
শরতের পথে অগ্রসর।
সকলের কর্তব্য সপরিবারে যোগদান।
তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হতে
হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে।
নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা
জুতো পাবেন বাটার দোকানে।
পদশোভার এখানে বিচিত্র আয়োজন।
সুচিত্রা ১২.৯৫
ইজি ২২.৯৫
মেজর ২৪.৯৫
মনে রাখবেন, দিন যত বাড়ে,
ভিড় তত বাড়ে। সুতরাং আসুন
সকালের দিকে। সকালের বাজার
—আরামের বাজার।
Bata

চিরস্থায়ী
সৌন্দর্য্যের জন্য
স্নায়িত বরষা, খরধার শীত বা গুমোট গরম যা কিছুই হোক না কেন মুখে মাখবার চমৎকার ক্রীম বোরোলীন সব সময়েই আপনার মুখের সৌন্দর্য্য রক্ষা করে। ল্যানোলীন-এ সমৃদ্ধ ও সুগন্ধি বোরোলীন আপনার ত্বকের মলিনতা দূর করে আপনার সৌন্দর্য্যের কোমলতা ও সজীবতা আরও বাড়িয়ে তোলে।
BOROLINE
বোরোলীন প্রস্তুতকারক-এর
নতুন ফাউণ্ডেশন ক্রীম, লোমনাশক ও
এ্যান্টি-রিঙ্কেল ক্রীম শীগ্‌গিরই বাজারে পাবেন।
বোরোলীন
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছন্দময় হয়ে উঠুক
আপনার জীবন
জীবনের প্রতিটি অণু পরমাণু নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে আবর্তিত। তাঁরই ছন্দের লীলায় আকাশে রঙ লাগে, পৃথিবীতে জাগে শ্যামলিমার জোয়ার, মানুষের মনে ওঠে সুরের ঝংকার। যুগে যুগে সুরের মায়াজালে মানুষের জীবনে সামান্য মুহূর্ত্তটী হয়ে উঠেছে অসামান্য, রয়ে গেছে চিরদিনের জন্য ....
পত্র লিখিলে সচিত্র মূল্য তালিকা পাঠানো হয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২
অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৬
কবি-গুরুদেব	শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার	২৫
'ছিন্নপত্র' ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান	শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	৩৪
রবীন্দ্রনাটকের নায়ক	শ্রীভবতোষ দত্ত	৫৫
বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪
স্মরণ		
'শেষ রবিরেখা'	শ্রীঅমিয়কুমার সেন	৭২
পত্রাবলী	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৭৭
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়	৭৯
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য	৯৩
	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১০৪
স্বরলিপি : 'আমার আপন গান· ·'	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	১০৭

চিত্রসূচী

পুষ্পচয়িনী	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার	১
রবীন্দ্রনাথ গান্ধী টলস্টয়		৮
পারাবত	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী		৭২
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত		৮০

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

চিঠিপত্র রাজশেখর বসুকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

এতদিন পরে বাঙ্‌লা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে চলন্তিকায় বাঙ্‌লার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েচেন তাও অপূর্ব্ব হয়েচে।

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। ইংরেজি ভাষার লিখিত শব্দগুলি তাদের ইতিহাসের খোলস ছাড়তে চায় না— তাতে করে তাদের ধ্বনিরূপ আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করেনি। তার বানানের মধ্যে অবঞ্চনা আছে, সে যে প্রাকৃত, এ পরিচয় সে গোপন করেনি। বাংলা ভাষায় যত্বণত্বের বৈচিত্র্য ধ্বনির মধ্যে নেই বল্‌লেই হয়। সেই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় দীর্ঘহ্রস্ব ও যত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিলনা পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়। আজ আমরা ভারতের রীতি ত্যাগ করে বিদেশীর অনুকরণে বানানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত করতে বসেচি।

ভেবে দেখলে বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জ্জন করেচে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদ্‌লে সে হয়েছে মোন্। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই— যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্ত্তি করতুম— এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে যত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব। যে পণ্ডিতমূর্খরা "গভর্নমেণ্ট্" বানান প্রচার করতে লজ্জা পাননি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজো বাংলা বানানকে শাসন করচেন—এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হোলো সজীব বানান, আর কাণ হোলো প্রেতের বানান একথা মানবেন তো? বানান সম্বন্ধে আমিও অপরাধ করি অতএব আমার নজীর কোনো হিসাবে প্রামাণ্য নয়। ইতি ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

আপনার গুণগ্রাহী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩

১০ই অক্টোবর ১৯২৭, সোমবার। প্রাতরাশের পরে আমরা অপেক্ষা করলুম— দশটার সময় এখানকার যুদ্ধবিগ্রহের আর সামুদ্রিক সেনা বিভাগের মন্ত্রী নগর-স্বর্গ (নাখোন্-সারংখ্)-এর রাজকুমারের সঙ্গে শিষ্টাচার-সম্মত সাক্ষাৎ ক'রতে নিয়ে গেল। এই রাজকুমার জার্মানিতে শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন, এঁরই মা যাঁর নাম শ্যামীভাষায় সুখুমাল্ বা সুখুমান্ মারাসিরি, তাঁরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হবে, এবং তাঁরই মৃত্যুর জন্য এই কয়মাস শ্যামজাতি অশৌচ পালন ক'রছে। নগর-স্বর্গের রাজকুমার অতএব মহারাজ চূড়ালংকারের অন্যতম পুত্র বিধায়, এখনকার রাজার এক পিতৃব্য— যেমন রাজকুমার ধনীনিরাৎ। রাজকুমারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাওয়ার পথে রাজা চূড়ালংকারের ব্রোঞ্জে তৈরী অশ্বারোহী মূর্তির পাদপীঠে সমবেত হ'লুম, কবি সেখানে আধুনিক শ্যামের স্রষ্টা এই রাজার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মালা দিলেন। নগর-স্বর্গের রাজকুমারের বাড়িতে অল্পক্ষণ আমরা ছিলুম। ইংরিজিতে কিছু শিষ্টাচার ক'রে, আমরা গেলুম তুষিত প্রাসাদে (শ্যামীভাষায়, তুসিৎ প্রাসাৎ)। সেখানে চূড়ালংকারের অন্যতম রাণী, রাজার সৎঠাকুরমা, নগর-স্বর্গের কুমারের মাতার শবদেহ রক্ষিত হ'য়ে আছে, কয় সপ্তাহ পরে খুব ঘটা ক'রে তার অগ্নিসংকার হবে। প্রাসাদের মধ্যে একটি বড়ো ঘরে যেন সোনায় মোড়া একটি স্তূপের মতন। তার ভিতরে শবাধার রক্ষিত হ'য়ে আছে। চারিদিক যেন সোনার কাপড়ে আর জরিতে মোড়া। মাটিতে অনেকগুলি রাজসেবক এবং রাজবাড়ির দাসী উবু হ'য়ে ব'সে আছে। শবাধারের চৈত্যটির চারি ধারে চারজন সেপাই ফৌজি কায়দায় বন্দুক উল্টো ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে— বন্দুকের কাঠের কুঁদ উপরের দিকে করা, তার মুখ বা নল মাটিতে ঠেকানো। এরা একেবারে পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আর শোক-প্রকাশের জন্য মাথা হেঁট ক'রে র'য়েছে। পরলোকগত রাজমহিষীর নামটির ঠিক পালি বা সংস্কৃত কি হবে, আমি ঠিক-মত ধ'রতে পারিনি। এটা হচ্ছে 'সুকুমার অমরশ্রী'। কিন্তু আমি 'সূক্ষ্ম মাল্যশ্রী' ব'লে ভুল অনুমান করেছিলুম। পরে জানতে পারি এ অনুমান আমার ভুল। শ্যামী ভাষায় শব্দের অন্তে 'র' থাকলে সেটাকে 'ন' উচ্চারণ করে। সেটা পরে জানতে পারি; যেমন Khmer (খ্মের) শব্দকে এরা উচ্চারণ করে 'খ্মেন'। আর শ্যামী ভাষায় রচিত রামায়ণের নাম হচ্ছে "রামকীর্তি"— এদের মুখে এই শব্দ প্রথম হ'য়ে যায় "রামকীর্", তার পর এখন বলে "রামকীয়েন্"। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-মত আমি সাদা কার্ডের উপরে নাগরী অক্ষর আর রোমান অক্ষরে একটী ছোট সংস্কৃত সমর্পণ-বাক্য লিখে দিই, সেটী রেশমী সুতো দিয়ে কালকের আনা ফুলের মালায় গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যক্যটি হ'চ্ছে এই— "পুণ্যচরিতায়া/মহারাজাধিরাজশ্রী-চূড়ালংকরণ-দেব-মহিষ্যাঃ/অগ্রারাজদেব্যাঃ পুণ্যলোকবাসিন্যাঃ/শ্রী-সূক্ষ্ম-মাল্যশ্রিয়ঃ/শ্রদ্ধপোয়নম্/মাল্যময়ম্ অর্ঘ্যম্ এতৎ/অর্পিতং কবিনা ভারতবর্ষাদ্ আগতেন/শ্রীরবীন্দ্রেন// বুদ্ধাব্দাঃ ২৪৭০ / আশ্বিন পৌর্ণমাস্যাম্ ॥"/

কবি মালাটি চৈত্যের পাদমূলে রাখলেন, তারপরে আমরা— ভুঁইয়ের উপর গালচে পাতা ছিল—

তাতে খানিকক্ষণ বসলুম। এর পরে আমরা অমরেন্দ্রপ্রসাদ (অমরিন্ প্রাসাং) দেখে, শ্যামরাজবংশের সবচেয়ে পবিত্র দেবমন্দির, যাতে শ্যামদেশের পুণ্যতম বুদ্ধবিগ্রহ রক্ষিত আছে সেটী দেখতে গেলুম। কিন্তু সেখানে ঐ লক্ষণীয় মূর্তিটি দেখা হ'ল না, কারণ তখন মন্দিরের ভিতর মেরামত হচ্ছিল ব'লে বন্ধ ছিল। এই মূর্তিটি খুব বড় একখণ্ড মরকত বা পান্না কেটে তৈরী। মূর্তির ছবি দেখেছি, কিন্তু কারুকার্য্য তেমন সুন্দর নয়। শ্যামজাতির ধার্মিক আর রাজনৈতিক জীবনের যেন কেন্দ্রস্থান বা পীঠস্থান এই Wat Phra-Keo ব্লাৎ-ফ্রা-কেও ইংরিজীতে শ্যামীরা তাদের Panthaon অর্থাৎ সর্বদেবনিকেতন বা স্বধর্মাসভা বলে অভিহিত করে। এই মন্দিরের আশপাশে ছোটোখাট আধুনিক আর প্রাচীন নানা রকমের মন্দির আর পাথরের আর ব্রোঞ্জের নানা মূর্তি রেখেছে। এইসব মন্দির আর মূর্তি থাই শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। একটি লম্বা হল-ঘরে বা গ্যালারির দেয়ালে শ্যামী রামায়ণের অজস্র রঙিন চিত্র আঁকা। কম্বোজ দেশের বিখ্যাত আঙ্কর-বাৎ মন্দিরের একটী ছোটো অনুকৃতি আছে। ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে একটী মূর্তি এক উঁচু পাদপীঠের উপরে স্থাপিত— এটী বিশেষ লক্ষণীয়— এটি 'রুসি' অর্থাৎ ভারতীয় ঋষির মূর্তি,— এই ঋষিটি অত্যন্ত কৃশকায়, এবং দাড়ি-গোঁফ-বিহীন জটাধারী উপবিষ্ট মূর্তি, মুখে একটু কৌতুকহাস্যের আভাস। ভারতবর্ষের ঋষির সম্মান বহির্ভারতের প্রায় সব দেশেই গিয়ে পৌঁচেছে, আর প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় বিভিন্ন ঋষি আর ঋষিপত্নীদের কল্পিতমূর্তির ছবি চীন ও জাপানেও পাওয়া যায়— যেমন অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি। পাথরের যে মূর্তিগুলি এখানে আছে, তার মধ্যে কতকগুলি হ'চ্ছে জোড়া জোড়— একটী পুরুষ ও একটী নারীর মূর্তি একই পাদপীঠের উপরে। এগুলির মধ্যে দুটী আমার কাছে লক্ষ্মণীয় লাগ্‌ল— একটি হ'ল হনুমান আর "মে-মাচা"-র মূর্তি। হনুমান যখন সাগর অতিক্রম ক'রে লঙ্কায় পৌঁচান, তখন সমুদ্রের এক উপদেবী এই মে-মাচা বা মৎসকন্যা বা জলদেবী হনুমানকে বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু হনুমান তাকে পরাভূত করেন এবং মৎসকন্যা হনুমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আখ্যানে মে-মাচার আর হনুমানের প্রণয়ের কথাও জড়িত। শ্যামদেশে এই অদ্ভুত কাহিনীর মূর্তি বা ছবি খুবই প্রচলিত— বিকট-মুখ হনুমান মে-মাচার পশ্চাদ্ধাবন ক'রছেন। এখানে যা মূর্তি দেখলাম— পাশাপাশি দাঁড়ানো হনুমান আর মৎস্যকন্যা-রূপী নারী। আর একটি জোড়-মূর্তি হ'চ্ছে একটি প্রাচীন শ্যামী উপকথাকে রূপ দিয়ে— একজন রাজকুমার আর একজন রাজকুমারী— প্রেমিক ও প্রেমিকা— সামনাসামনি দাঁড়িয়ে' কথা কইছেন। এই দুটি মূর্তির মধ্যে যেন প্রাচীন শ্যামের সংস্কৃতি আর রোমান্স মূর্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছে। এই ব্লাৎ-ফ্রা-কেও হাতাটি তার এই শিল্পসম্ভারের ঐশ্বর্য্যের জন্য একটী দর্শনীয় স্থান বটে।

ব্লাৎ-ফ্রা-কেও এইভাবে দেখবার পর, নানান্ ছোটো বড়ো আঙিনা আর হল-ঘর অতিক্রম করে একজায়গায় আমরা একটি নূতন ধরনের জিনিস দেখলুম— একটী বড়ো ঘরে জনপঞ্চাশেক যুবক ধীর ললিত নাচের ভঙ্গিতে সমবেত স্বরে গান গাইছে। এদের পরনে শ্যামী 'ফানুম্', আর গায়ে একটা করে সাদা কামিজ, আর খালি পা। বেশ ফুর্তি ক'রে জোর গলায় গান ধ'রেছে— সঙ্গে শ্যামী অর্কেষ্ট্রা বা ঐক্যতান বাদন। কয়েকটী যন্ত্র যবদ্বীপের গামেলান বাদ্যের যন্ত্রের মতো, আর এই বাজনার আওয়াজ গামেলানেরই ধরনের— যেন খালি তালের আধারে। আমাদের তখন বুঝিয়ে দিলে— কি জন্য ছেলেরা এই গানের মহড়া দিচ্ছে। ১৬ই অক্টোবর থেকে, আমরা শ্যামদেশ ছেড়ে

যাবার দিন থেকে, দরবারে একটা বড়ো রকমের উৎসব শুরু হবে, সেইজন্যে। শ্যামদেশে সাদা হাতিকে লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে, যেন সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবের অবতার। হাতিদের মধ্যে কখনও কখনও শ্বেতী রোগের দ্বারা গ্রস্ত Albino বা সাদা জানোয়ার পাওয়া যায়। ইন্দ্রের ঐরাবতের রঙও সাদা। এইরকম সাদা হাতি কালে-ভদ্রে, হয়তো পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে, একটা দেখা দিলে। এইরূপ সাদা হাতির আবির্ভাবকে শ্যামীরা দেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণের কথা ব'লে মনে করে, আর সাদা হাতি পাওয়া গেলে খুব যত্ন ক'রে রাজসম্মানের সঙ্গে তাকে এনে রাজবাড়িতে স্থান দেওয়া হয়। সাদা হাতি পোষা এক খরচের ব্যাপার। সেইজন্য ইংরিজীতেও White Elephant-কে অবলম্বন করে প্রবাদ বাক্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এরূপ বলা হয় যে শ্যামের রাজারা কোনও অমাত্য বা দরবারী লোকের আর্থিক দণ্ড দেবার জন্যেই তাকে এরকম সাদা হাতি উপহার দিতেন, আর এই হাতির পালন-পোষণ আর তার পূজা-সম্মানের জন্যে বেচারীকে ফতুর হ'য়ে যেতে হত। যাই হোক, বহুদিন পরে এই সাদা হাতি পাওয়া গিয়েছে ব'লে তাকে বাঙ্কক্ শহরে যেদিন আনানো হবে, সেইদিন তার স্বাগতের জন্য এই নাচগানের জোর মহড়া চলেছে।

এর পরে আমরা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা বদ্‌লে হোটেলে ফিরলুম। চৌত্রিশ বছর আগে টাকাকড়ির ব্যাপারে আজকের মতো কড়াকড়ি ছিল না। যবদ্বীপে বক্তৃতা দিয়ে যে একশো গিল্ডার দক্ষিণা পেয়েছিলুম, তার বদলে অষ্টাশী শ্যামী টাক টিকল পেলুম। তখন শ্যামের টিকল আমাদের টাকার চেয়েও বেশি দামী ছিল। এবার গত ১৯৫৯ সালে দেখলুম এই টিকলের দাম খুব প'ড়ে গিয়েছে— আমাদের এক টাকার বদলে এখন ওদের সাড়ে-তিন টিকলের বেশি পাওয়া যায়।

হোটেলে ফিরে এলুম, তার পরে বিশ্রাম। তিনটের একটু পরে তিনজন চীনা ভদ্রলোক কবি-দর্শন করবার জন্যে এলেন। অতি বিনীতভাবে কবিকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন। সাড়ে-তিনটের সময় যেতে হ'ল বিদেশ-মন্ত্রী Traidos ত্রৈদস-এর সঙ্গে দেখা করতে। ইনি হচ্ছেন "পিৎসানুলোক্" অর্থাৎ বিষ্ণুলোক নগরের রাজকুমার। এঁর বাড়িতে আমরা অল্পক্ষণ ছিলুম, আর ইনি আগামী কাল ওঁর সঙ্গে ডিনারের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। তার পরে চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কবি মোটরে ক'রে একটু শহর ঘুরে বেড়ালেন। পাঁচটার সময়ে শ্যামদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, রাজকুমার দামরঙ্ রাজানুভাব Prince Damrong Rajanubhav -এর বাড়িতে আমরা গেলুম। ইনি শ্যামদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একপত্রী। অর্থাৎ পণ্ডিত বলে এঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। অমায়িক ব্যক্তি, বয়সে প্রবীণ, বেঁটে-খাটো হাস্যমুখ মানুষটী। পরনে ছিল কালো সিল্কের ফানুম— গায়ে সাদা জামা আর ডানহাতে আস্তিনের উপর শোক-প্রকাশক কালো কাপড়ের ঘের। এঁর একটি মস্ত বড়ো শিল্পসংগ্রহ আছে। বিশেষ করে প্রাচীন, শিল্প-ছবি ইত্যাদি নিয়ে। এঁর কাছে জার্মানী ফেরত এক শ্যামী ডাক্তার এসেছিলেন, ইনি সতেরো বৎসর জার্মানীতে কাটিয়েছিলেন। দামরঙের তিন মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের সঙ্গে কবি প্রাচ্যদেশের মধ্যে যাতে একটী সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটতে পারে সেই কথা বললেন।

দামরঙের বিশেষ আগ্রহে কবির সঙ্গে তাঁর ছবি তোলা হ'ল। চা-যোগের প্রচুর আয়োজন ছিল, নানা শ্যামী পিঠা এবং মাংস মাছ ও চালের গুঁড়ার প্যাটি— চীনা চা, ইয়োরোপীয় চা, আইস্‌ক্রিম,

আইস-লেমনেড প্রভৃতি ; সঙ্গে সঙ্গে বেশ হালকাভাবে গভীর বিষয় আলোচনাও চ'ল্‌ল। কবি এই উচ্চশিক্ষিত এবং উদার রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুশি হলেন।

তার পরে ৬টা ১৫ মিনিটে আর একজন রাজা— চূড়ালংকারের আর একজন পুত্র— ভানুরংসীর সঙ্গে দে'খা ক'রতে গেলুম। ইনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু খুব দিলখোলা হাসকুটে' মানুষ, কবিকে পেয়ে যেন কি ক'রবেন ঠিক করতে পারছেন না। তিনি অন্য কথার মধ্যে কবিকে বললেন Heard your name, and admire your aim— যেন নিজের এই ইংরেজী কথায় মিল বা অন্ত্য-অনুপ্রাস দেখে নিজেই খুশি হ'য়ে হাসতে লাগলেন। এঁর এখানে এক পেয়ালা ক'রে চীনা চা খেতে হল।

কবি হোটেলে ফিরে এলেন। সুরেন-বাবু আর আমি— সঙ্গে রাজধর্মনিবেশও ছিলেন, তিনি আমাদের এক চীনা মণিহারীর দোকানে নিয়ে গেলেন— বড়ো পোষ্ট-আপিসের সামনে। এ তল্লাটে সমস্ত দোকান-পাট চীনাদের, দোকানদারটী সিঙাপুর থেকে এখানে এসে ব্যবসা খুলেছে। কথাবার্তায় মানুষটিকে বেশ ভালো লাগ্‌ল। এর স্ত্রী খাসা ইংরিজী জানে। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের জন্য সুরেন-বাবু শ্যামী মূর্তি কিছু কিনলেন। কবির সঙ্গের লোক ব'লে, এই চীনা দম্পতি আমাদের খুব খাতির ক'রলেন। দোকানের দারোয়ান একজন ভারতীয় ভোজপুরী— আমাদের ভারতীয় দেখে এরও বড়ো আনন্দ।

রাজধর্মনিবেশ রাত্রে হোটেলে আমাদের সঙ্গে খেলেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখলুম, একটী ভারতীয় ভদ্রলোক—সম্ভবত কোন ভোজপুরী দারোয়ানদের সর্দার, বা দুগ্ধ-ব্যবসায়ী হবেন— নিজের নাম লিখে দিয়ে গেছেন Siew Misir বা শিব মিশ্র, কবির জন্য এক-ঝুড়ি ফল আর দু ছড়া ফুলের মালা। এই অজানা অচেনা ভারতবাসীর এইভাবে শ্রদ্ধাপ্রকাশ আমাদের বেশ লাগ্‌ল।

ফিয়া-থাই হোটেলে ভীষণ মশা। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কবির ঘুম নেই। তাঁর ঘরে গিয়ে মশা তাড়াবার চীনা চাকার মতো জড়ানো ধূপ জ্বালিয়ে দিলুম।

এই রচনার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে বিশ্বভারতী পত্রিকার নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭) ও একাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯) প্রকাশিত হয়।

অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গান্ধীজী টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন মনীষীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিল যাহা দেখিতে পাই তাহা হইল তিন জনেরই গভীর অধ্যাত্মবিশ্বাসে। তিনের ক্ষেত্রেই এই অধ্যাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা কাঁহাকেও জগৎ-বিমুখ এবং মানব-বিমুখ করিয়া তোলে নাই, তিন জনকেই অসীম প্রেমে মানবমুখী করিয়া তুলিয়াছে। কথাটাকে উল্টা করিয়া বলিতে চাহিলেও আপত্তি করিব না; তিন জনের মনই সহজভাবে ছিল মানবমুখী; কিন্তু যে অসীম প্রেম তাঁহাদিগকে নিত্য মানবমুখী করিয়া রাখিয়াছিল সে প্রেম্ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সে প্রেম ছিল ঊর্ধ্বমূল এবং অধঃশাখ, অধ্যাত্মবিশ্বাসে তাহার প্রতিষ্ঠা। তিন জনের ক্ষেত্রেই আরও লক্ষ্য করিতে পারি, ধর্ম কাহারও নিকটে কোনও প্রথাবদ্ধ পদ্ধতিতে আসিয়া দেখা দেয় নাই, ধর্মবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে গভীর জীবনবোধের ভিতর দিয়া; এই কারণেই ধর্ম কাঁহারও নিকটেই জীবনবিরোধী হইয়া উঠিতে পারে নাই। গভীর জীবনবোধের ভিতর দিয়া যাহার উদ্‌বোধ সমগ্র জীবনকে ধারণ করিয়া রাখাই তো তাহার মুখ্য কর্ম। তিন জনের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস তাই জীবনকে সর্বতোভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্যই।

টলস্টয়ের জীবনের ভিতর বেশ স্পষ্ট দুইটা ভাগ দেখা যায়:

প্রথম ভাগে তিনি উচ্ছৃঙ্খল, তৎকালীন রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণীর সকল মহৎদোষে দুষ্ট, বিশ্বাসের বালাই তাঁহার ভিতরে এ যুগে প্রায় ছিলই না। কিন্তু এ যুগেও দুইটি মহৎ জিনিস তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিয়াছিল— তাহা পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে বিশ্বাসের পথে এবং ঋষিজীবনে টানিয়া লইয়াছিল। প্রথমাবধিই ছিল তাঁহার হৃদয়ে একটা গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। বিলাস-ব্যসনের অভিজাত জীবনে তিনি বেপরোয়াভাবে চলিতেছিলেন, কিন্তু সমস্তের মধ্যেই কি-একটা গভীর অশান্তি তাঁহাকে মাঝেমাঝে প্রায় উন্মাদ করিয়া তুলিত; ইহাই হইল মানুষের মধ্যে 'দিব্য অসন্তোষ', যে অসন্তোষ মানুষকে জীবনের পিছনে একটা মহত্তম মূল্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য নিরন্তর উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিতে থাকে। আমার বিশ্বাস, এই দিব্য অসন্তোষের আলোড়নে উদ্ভূত যে জিজ্ঞাসা তাহারই সমাধান রূপে আবির্ভাব ভগবদ্‌বিশ্বাসের। টলস্টয়ের মধ্যে অপর জিনিস লক্ষ্য করি, মানুষের সঙ্গে অসীম সমবেদনা। এই সমবেদনা দিন দিনই তাঁহার ভিতরে একটা যুদ্ধবিরোধী এবং হিংসাবিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিতে লাগিল। প্রথমজীবন হইতে নানাভাবে নিজে যুদ্ধের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, যুদ্ধের বিরাট ইতিহাসই রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার বিপুলায়তন উপন্যাস 'সংগ্রাম ও শান্তি'র ভিতরে; যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকারের নৃশংসতাই কি তাঁহার মনকে এতখানি হিংসাবিরোধী করিয়া প্রেমোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল?

জীবনের দ্বিতীয় ভাগে যখন বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল তখন টলস্টয়ের জীবনবেদের সহিত নিবিড় যোগ দেখা দিল বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেণ্টে'র; বাকি জীবন তখন চেষ্টা চলিল সাহিত্যকর্মে জীবনচর্যায় এই 'নিউ টেস্টামেণ্টে'র বাণীকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার। টলস্টয় তখন খাঁটি খ্রীষ্টান-

বিশ্বাসকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়া তুলিলেন, যিশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণীকে জীবনের প্রদীপ করিয়া তুলিলেন; কিন্তু প্রচলিত চার্চধর্মের তিনি একান্তভাবে পরিপন্থী হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, প্রার্থনা কখনো চার্চে বা কোনও বারোয়ারী স্থানে গিয়া করিতে হয় না, সর্বোত্তম প্রার্থনা হইল নিজের মনের মধ্যে। স্বর্গীয় পিতা, একমাত্র পুত্র যিশুখ্রীষ্ট ও 'হোলি গোস্ট' (Holy Ghost) এই ত্রিমূর্তিতে ভগবান আরাধ্য— এ কথা টলস্টয় অস্বীকার করিলেন। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি প্রেমস্বরূপ— প্রত্যেক মানুষ তাঁহার সেই প্রেমস্বরূপতার মধ্যে বিধৃত, এই প্রেমই জীবনের আসল বস্তু; চাই প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রেম, আর সেই প্রেমস্বরূপের সহিত যুক্ত সকল মানুষের প্রতি প্রেম। যিশুখ্রীষ্ট ভগবান নন, যিশুখ্রীষ্ট মানুষের মধ্যে আদর্শ পূর্ণমানব; কারণ তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রেমের বাণী পূর্ণপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেমে করুণায় সমস্ত মানুষকে 'সম' বলিয়া অনুভব করা, সেই 'সম'ত্বের অনুভূতিতে মানুষের ভিতরকার সর্বপ্রকারের ভেদভাব সর্বপ্রকারের হিংসাদ্বেষ দূরীভূত করিয়া দেওয়া. টলস্টয়ের মতে ইহাই হইল খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্মসাধনা, আর সব কিছু হইল ধর্মের নামে বাহ্য ভড়ং। চার্চের ধর্মাধিপতিগণ টলস্টয়ের উপরে অসম্ভবভাবে ক্ষেপিয়া গেলেন, দীর্ঘদিনের জন্য টলস্টয় ধর্মচ্যুত বলিয়া ঘোষিত রহিলেন; মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টানমতে ধর্মকৃত্য তাঁহার ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হইতে পারে নাই।

টলস্টয়ের এই যে চার্চবিরোধী খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে টলস্টয়ের উপরে প্রাচ্যদেশী ধর্মমতগুলির কিছু প্রভাব থাকিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাচ্য ভাষা সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে টলস্টয়ের একটা ঝোঁক বরাবরই ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই টলস্টয় প্রাচ্য ভাষাসমূহকে তাঁহার প্রথম বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি রূপকথার যে সংকলন করেন তাহার ভিতরে ভারতীয় রূপকথাও স্থান পাইয়াছিল। তিনি Sacred Books of the East প্রকাশনমালা হইতে চীন-দর্শন এবং ভারতীয় দর্শন পড়িয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়িয়া টলস্টয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমেরিকা-প্রবাসী বাবা প্রেমানন্দ ভারতী নামক জনৈক বাঙালী বৈষ্ণব লিখিত কৃষ্ণবিষয়ক বইখানি তাঁহার এত ভালো লাগিয়াছিল যে তিনি বইখানিকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এইসব মিলিয়া টলস্টয়ের মনের উপরে কিছু প্রাচ্য প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক মনে হয় না। এ বিষয়ে অ্যালেক্স আরন্‌সন্ (Alex Aronson) তাঁহার *Europe Looks at India* গ্রন্থখানিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধানযোগ্য। "প্রাচ্য যে টলস্টয়কে ধর্মবিচারের নূতন মানদণ্ড দান করিয়াছিল সেসম্বন্ধে সন্দেহ নাই; এই প্রাচ্যলব্ধ মানদণ্ডই টলস্টয়কে সাহায্য করিয়াছিল খ্রীষ্টধর্মের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টায়। আমরা যদি অবশ্য টলস্টয়ের ভারতবর্ষের প্রতি ঠিক ঠিক কি দৃষ্টি ছিল তাহার বিচার করিতে চাই তবে তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি প্রধান প্রধান ভারতীয়গণের নিকটে যেসব চিঠিপত্র লিখিয়াছেন সেগুলি ভালো করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার দার্শনিক লেখাগুলি অপেক্ষা এই চিঠিগুলির একদিক হইতে একটা অধিক মূল্য আছে; এগুলি একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে লিখিত বলিয়া তাহার নৈতিক জীবনের ও ধর্মজীবনের সকল আবেগই এগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।" বিরুকফ্ (Birukoff) প্রকাশিত *Tolstoy Und der Orient* বইখানির মধ্যে ভারতীয়গণের নিকটে লিখিত টলস্টয়ের এই চিঠিগুলি পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে দেখিতে পাই জীবনের শেষ দিকে ধর্মীয় জীবনে প্রাচ্যদেশের সহিত টলস্টয়ের একটা আত্মিক যোগই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আবার জন্মহিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্ম ইস্‌লাম প্রভৃতিকেও যেমন সশ্রদ্ধায় পড়িয়াছেন এবং জীবনে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তেমনই 'নিউ টেস্টামেন্টে'র খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিও আন্তরিক ভাবেই অনুরক্ত ছিলেন; ফলে মহাত্মা গান্ধীর ধর্মবিশ্বাসের উপরে কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রভাবও অবশ্যস্বীকার্য। টলস্টয় এবং গান্ধী উভয়ের ক্ষেত্রেই তাই দেখিতে পাই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতি সহজ মিলন হইয়াছিল।

খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে মনোভাবে গান্ধীজী ছিলেন টলস্টয়ের সহিত সম্পূর্ণ একমত। যিশুখ্রীষ্টের মহান প্রেমের আদর্শ ও ত্যাগের আদর্শ, তাঁহার সহজ সরল জীবনযাত্রার আদর্শ, তাঁহার বিনয় সেবা মৃদুতা অথচ মৃত্যুপণ সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা—ইহার সবই গান্ধীজীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। যিশুখ্রীষ্টের 'সারমন্ অন্ দি মাউন্ট' অর্থাৎ পাহাড়ের উপরে বসিয়া প্রদত্ত যে উপদেশাবলী তাহা মহাত্মা গান্ধীর নিকটে প্রায় নিত্যস্মরণীয় ছিল। কিন্তু গান্ধীজীও চার্চপ্রচারিত গোঁড়া খ্রীষ্টানমতের পরিপন্থী ছিলেন। টলস্টয়ের ন্যায় গান্ধীজীও হরিজন-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "আমি তাঁহাকে [যিশুখ্রীষ্টকে] একজন ঐতিহাসিক মানব বলিয়া মনে করি, মানবগুরুগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ গুরু।" যিশুখ্রীষ্টের সকল বাণীর সারমর্ম ছিল প্রেম; সেই প্রেমই আনে সমাজবোধ, আনে অহিংসা—আনে চরম আত্মত্যাগের দ্বারা মহামানবের সেবার অনিবার্য প্রবৃত্তি। যিশুখ্রীষ্টের জীবন এবং বাণীকে যে এই আলোকে বুঝিল না সে যিশুখ্রীষ্টকে কিছুই বুঝিল না, কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না। হরিজন-পত্রিকায় আর-এক বার তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ আমি গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কারণ আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ যে ইহা যিশুর বাণীকে সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দিয়াছে।"

গান্ধীজীর ধর্মজীবনও কোনও প্রথাবদ্ধভাবে গড়িয়া ওঠে নাই; তাঁহার ধর্মবোধ তাঁহার নিজের মনের মধ্যেই একটা বিশেষ রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার গভীর মানবতাবোধকে অবলম্বন করিয়া। যে গীতাকে মধ্যজীবন হইতে গান্ধীজী জীবনের প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন সেই গীতার সহিত আশৈশব গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠপরিচয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া শৈশব হইতে উপনিষদের ভাবধারার মধ্যেই মানুষ হইয়াছেন গান্ধীজীও অনুরূপভাবে আশৈশব গীতার ভাবধারার মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারি না। গান্ধীজীর আত্মজীবনের মধ্যে পিতার ধর্মজীবনের পরিচয় দিতে গিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, তিনি মাঝেমাঝে মন্দিরে যাইতেন এবং ধর্মোপদেশ শুনিতেন, তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার পিতার যেটুকু হোক ধর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পিতা জীবনের শেষভাগে অবশ্য একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপদেশে গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; পূজার সময়ে তিনি উচ্চে গীতার কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনে ইহার তেমন কোনো ব্যাপক প্রভাব ছিল মনে হয় না। গান্ধীজীর মাতা অবশ্য অতি নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। তিনি দৈনন্দিন পূজা-প্রার্থনা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না; নিত্য তিনি বৈষ্ণব-মন্দিরে যাইতেন, চাতুর্মাস্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত-উপবাসাদি তাঁহার লাগিয়াই ছিল। গান্ধীজী মাতার নিকট হইতে সম্ভবতঃ বৈষ্ণবপ্রবণতা লাভ করিয়াছিলেন, আর লাভ

রবীন্দ্রনাথ

গান্ধী
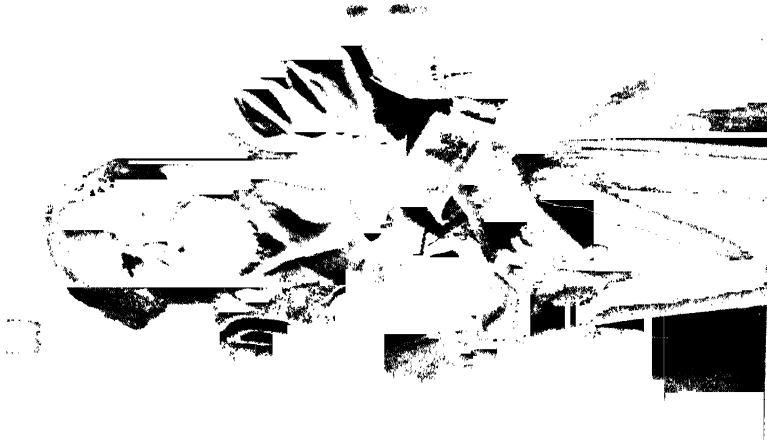
টলস্টয়

করিয়াছিলেন উপবাসের প্রবণতা। শুধু মায়ের নিকট হইতে নয়, গুজরাটি সমাজজীবন হইতেই সম্ভবতঃ তিনি অতখানি উপবাস-প্রবণতা একটা সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করিয়াছিলেন। ব্রত-উপবাস ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলের মহিলাগণের মধ্যেই কম নয়, উপলক্ষ্য একটা যেন কিছু পাইলেই হইল। কিন্তু গুজরাট-রাজস্থানের কিছু কিছু অঞ্চলে অল্পবয়সের মেয়েদের মধ্যেও (পুরুষের মধ্যেও) এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ উপবাসের কথা নিজে যেমন করিয়া জানিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে গান্ধীজীর জীবনের এত উপবাসের পিছনেও সামাজিক উত্তরাধিকারের খানিকটা উপাদানের প্রশ্ন হয়তো একেবারে অবান্তর নহে।

গান্ধীজী গীতা পড়েন প্রথমে লণ্ডনে বসিয়া দুইটি থিয়োসফিস্ট বন্ধুর প্রভাবে। মূল গীতা পূর্বে কোনও দিন পড়েন নাই, প্রথম পড়িলেন ইংরেজি অনুবাদ, সার্ এড্উইন আরনল্ডের *Song Celestial*, দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অনুবাদের ভিতর দিয়াই তাঁহার মনকে সচকিত করিয়া দিয়াছিল; সেই হইতেহ গীতা গান্ধীজীর উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। গভীর মানবতাবোধের ভিতর দিয়া এবং সহজাত সত্যনিষ্ঠার ভিতর দিয়া গান্ধীজী ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন সত্যস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ করিয়া। পরবর্তী কালে গুজরাট-মারাঠার বৈষ্ণব সাধককবিগণ এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের সন্ত কবিগণও গান্ধীজীর ধর্মবোধকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। গীতার পরে যে গ্রন্থখানি গান্ধীজীর ধর্মজীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হইল গোস্বামী তুলসীদাসের রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'রামচরিতমানস'। এ কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে গান্ধীজী যে শোষণহীন স্বায়ত্ত-শাসনে সুখী রাম-রাজত্বের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার চিত্রটি তিনি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর ধর্মচেতনা যেরূপ মুখ্যতঃ গীতাকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা তেমনই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়াছিল উপনিষদ্। সবগুলি উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানির মধ্যে আমরা উপনিষদ্ হইতে একটি সংকলন দেখিতে পাই; উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সংকলনের মধ্য দিয়াই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপনিষদের যত মন্ত্রের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে মন্ত্রগুলি সবই এই সংকলনের ভিতরে ধৃত। অল্পবয়স হইতেই এই মন্ত্রগুলি তিনি হাতের কাছে পাইয়াছিলেন, পিতার নিকট হইতেই উপনিষদের মর্মবাণীটিও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; আর শৈশব হইতে এই মন্ত্রগুলিকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতেন।

শৈশব হইতে উপনিষদের সহিত এইরূপে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া আমাদের মধ্যে একটা ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া উপনিষদের ধারাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের এ ধারণা ভুল। অনন্যসাধারণ মন ও জীবন লইয়া যাঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম তাঁহারা নিজেরা গড়িয়া তোলেন, অথবা বলা যায়, তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম নিজেদের ভিতরেই তাঁহাদের চিন্তা অনুভূতি ও জীবনযাত্রাকে লইয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। শাস্ত্র ও সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের বাণীকে তাঁহারা সেই ভাবেই

আহরণ ও গ্রহণ করেন যেভাবে করিলে তাঁহাদের ভিতরে ভিতরে গড়িয়া ওঠা ধর্মবোধ সমর্থন লাভ করিয়া বা অনুরূপ চিন্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার রসদ লাভ করিয়া উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বার বার এ কথা বলিয়াছেন যে তাঁহার ধর্ম বাহির হইতে আসে নাই, কোনও শাস্ত্র বা প্রথাকে অবলম্বন করিয়াও আসে নাই, তাঁহার জীবনানুভূতির পথ ধরিয়া আপনার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনার মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে কবি উপনিষদের সঙ্গে তাহাকে কেবলই মিলাইয়া লইয়াছেন। এই মিলাইয়া লইবার কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে শুধু উপনিষদকে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে, নিজের মনন ও অনুভূতিকে উপনিষদের ভিতরে খুঁজিয়া পাইবার উৎসাহে তিনি উপনিষদের বাণীকে নিজের মতন করিয়া ঢালিয়া লইয়াছেন। গান্ধীজীও যে তাহা করেন নাই তাহা নয়। তিনি নিজে ছিলেন কর্মযোগী; তাঁহার প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি কর্মের নিজস্ব কতকগুলি কৌশল গড়িয়া লইয়াছিলেন; তিনি যখন গীতাকে নিজে গ্রহণ করিয়াছেন বা অপরের কাছে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন সেইভাবেই গীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অধ্যাত্মবিশ্বাসী ছিলেন, জীবনের যাহা-কিছু সকলেরই চরমমূল্য দান করিয়াছেন অধ্যাত্মসত্যের আলোকে; এদিক হইতে উভয়ের মধ্যে গভীর মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা-সংগীতের ভিতর দিয়া এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনকে লইয়া যত কর্মপ্রচেষ্টা-সকলের ভিতর দিয়া মানুষকে যে অধ্যাত্ম-উন্মুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি গান্ধীজীর গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের ইহা একটি মুখ্য কারণ। আবার বিরাট কর্মযোগী গান্ধীজী যে তাঁহার সকল কর্মের ভিতর দিয়াই মানুষের ভিতরকার অধ্যাত্মসত্যকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বপ্রকার কর্মের মধ্য দিয়াই যে মানুষকে এই বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব ইহা সমগ্র জীবন ধরিয়াই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিবার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহাই বোধ হয় প্রধান কারণ ছিল। আরও একটি জিনিস পূর্বেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। টলস্টয় গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ কেহই ধর্মকে মানুষের সহিত অখণ্ডযোগ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারেন নাই। যাহা-কিছু ব্যক্তি-মানুষকে বৃহৎমানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে— পার্থিব স্বার্থের লোভেই হোক, আর অপার্থিব মুক্তির লোভেই হোক— তাহাকে তাঁহারা কেহই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। ভগবৎ-আশ্রয়ের তাৎপর্যই হইল মহাপ্রাণ ও মহাপ্রেমকে আশ্রয়, মানুষকে অস্বীকার করিয়া এই মহাপ্রাণ এবং মহাপ্রেমকে আশ্রয় করিতে যাওয়া যে একেবারেই একটা স্ববিরোধ। সুতরাং তিন জনের পক্ষেই ধর্ম-জীবনের মূল কথা ছিল নিঃস্বার্থ সেবার ভিতর দিয়া মহামানবের সহিত যুক্ত হওয়া : মানুষের সেবার মধ্য দিয়া ভগবৎ-সেবা, মহামানবের বিকাশের ভিতর দিয়া মহাদেবতাকেই জাগ্রত এবং তৃপ্ত করিয়া তোলা।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মের ক্ষেত্রে এই গভীর মিল সত্ত্বেও গান্ধীজীর ধর্মমতের সহিত রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের লক্ষণীয় অমিলও ছিল অনেক দিক দিয়া। একটা মুখ্য অমিল ছিল এই যে, গান্ধীজী প্রকৃতিতে মুখ্যতঃ কর্মযোগী ছিলেন; তিনি সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ ভগবানে আত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিঃশেষে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া কর্মযোগে মহামানবের সেবাকেই মুখ্য করিয়া দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিতে কবি ছিলেন বলিয়া সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ভিতর দিয়া মানুষের মুক্তির আদর্শকে অত্যন্ত বড় করিয়া

দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের একটি মূল বিশ্বাস ছিল, ভগবত্তা কোনও অপ্রাকৃত ধামে চিরকালের জন্য হইয়া বসিয়া নাই ; তিনি অনন্ত দেশে অনন্ত কালে অনন্তদেব হইয়া উঠিতেছেন। প্রত্যেক মানুষ যে তাঁহার অংশ এ কথার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের মধ্য দিয়া সৃষ্টিপ্রবাহে নিরন্তর জায়মান বিধাতা তাঁহার অনন্ত ধ্যানের এক-একটি কণা তরঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন ; সেই ধ্যান জড়সৃষ্টির সকল বিবর্তন অতিক্রম করিয়া জীবসৃষ্টির প্রাণলীলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চৈতন্যলীলার মধ্য দিয়া পূর্ণতার পথে বিকাশমান। চৈতন্যের অনন্তবিকাশে 'নিজ মর্তসীমা' লঙ্ঘন করিয়া মানুষ তাহার মধ্য দিয়া দেবত্বকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। মানুষের এই পরিপূর্ণ বিকাশ শুধু রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরের দ্বারা বা বিশোধনের দ্বারা সম্ভব হয় না, কোনওরূপ গঠনমূলক কার্যের দ্বারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের দ্বারাও হয় না ; জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যশিল্প সংগীতনৃত্য—ইহার সকলের দ্বারাই মানুষের চেতনার বিকাশ মনের মুক্তিকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। এই কারণে সংগীতই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুখ্য সাধনা, অপর পক্ষে গান্ধীজী বলিতেন, 'সাফাই' দিয়াই মানুষের অধ্যাত্মসাধনার আরম্ভ। সৌন্দর্যের সাধনা শিল্পের সাধনা বাদ দিয়া কোনওজাতীয় বিশুদ্ধ গঠনমূলক কাজে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই তেমন উৎসাহ বোধ করেন নাই ; এইজন্য তাঁহার কর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে লইয়া, যেখানে কোনও কর্মই সৌন্দর্যসাধনা সাহিত্যসাধনা শিল্পসাধনাকে বাদ দিয়া নয়। কৃষি-উন্নতির কোনও পরিকল্পনাকে তিনি সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিতে পারেন নাই। গান্ধীজী সাহিত্য শিল্প সংগীতকে যে প্লেটোর ন্যায় ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্র হইতে দূর করিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিপ্রকৃতি লইয়া মানুষের ধর্মের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেবত্বের পথে, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এগুলিকে যেভাবে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন গান্ধীজী তাহা করিতেন না। এইজন্যই শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর অনেক জিনিস গান্ধীজীর মনঃপূত ছিল না ; আবার বিশ্বভারতীর অনেক জিনিস ঢালিয়া সাজিয়া নূতন রূপ দিবার গান্ধীজীর যেসব উপদেশ-পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথের তাহার সবটা খুব মনঃপূত ছিল না।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কর্মজীবনের ভিতর দিয়া গান্ধীজীর ধর্মবোধ একটা বিশেষ রূপ লাভ করিল। মন্দির-দেবালয়ের বৈষ্ণব পরিবেশে গান্ধীজীর জন্ম ও পরিবর্ধন ; সুতরাং কর্মময় জীবনের এই ধর্মবোধের যে বিকাশ তাহা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেকখানি বৈষ্ণবপ্রবণতা লাভ করিয়াছিল। গান্ধীজীর যে ভগবদ্‌বিশ্বাস তাহা অনেকখানি ছিল দ্বৈতবাদী হিন্দু বা খ্রীষ্টানগণ বা মুসলমানগণের ন্যায় Personal God বা পুরুষ-ভগবত্তায় বিশ্বাস। এই পরমপুরুষ গীতার পুরুষোত্তম—তিনি ক্ষরও বটেন, অক্ষরও বটেন ; আবার ক্ষর ও অক্ষর উভয়কে অতিক্রম করিয়া তিনি পুরুষোত্তম। তিনি নিরাকারও বটেন, আবার যুগে যুগে সাকাররূপে রামরূপে কৃষ্ণরূপে তাঁহার অবতারত্বও সমভাবে সত্য। তাই গান্ধীজীর ভগবান গীতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, সন্ত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র রাম। তিনি শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণরূপে— জগৎপ্রপঞ্চের অচলপ্রতিষ্ঠারূপে— বিরাজমান নহেন ; তিনি গীতার

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

বহির্বিশ্ব এবং মানুষের অন্তর্লোক— এই দুইকে একই ছন্দে একই বিধানে তিনি নিত্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

সকল ঐশ্বর্যের ভিতরে প্রেমের ঐশ্বর্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য এবং শক্তি। গান্ধীজী যে উপনিষদ্ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে; তবে তিনি মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করিতেন যে সকল উপনিষদ্ হইল গাভী, দোগ্ধা হইলেন গোপালনন্দন; পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা— গীতা হইল এইরূপ মহৎ অমৃত-দুগ্ধ। উপনিষদের সারকে গান্ধীজী গীতামৃতের মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন; গীতাই ছিল তাই তাঁহার প্রধান আশ্রয়; এই গীতা হইতেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন শুধু জ্ঞান নয়— সকল বল ও অন্তঃপ্রেরণা।

অন্যদিকে দেখিতে পাই, গীতা রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিনই তেমন একটা প্রেরণা দান করিতে পারে নাই; বরং দু-এক স্থানে গীতার সম্বন্ধে সামান্য একটু বিরূপ উক্তিই করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অপর্যাপ্ত লেখা রহিয়াছে তাহার ভিতরে গীতা হইতে উদ্‌ধৃতি বা আলোচনা লক্ষণীয় ভাবেই স্বল্প, সব জুড়িয়া চারি-পাঁচটি শ্লোকের বেশি হইবে না। গীতার মহিমাসূচক উক্তি যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি কোথাওই করেন নাই, এমন নহে। 'পরিচয়' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"আতসকাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে তেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি— সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা।"

মাঝেমাঝে এ-জাতীয় উক্তি সত্ত্বে গীতা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে বেশ একটা কিন্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য অধ্যাত্ম সত্যের 'পুরুষ'ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু এ 'পুরুষ' গীতোক্ত পুরুষোত্তম নহেন, ইনি উপনিষদের—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতো হর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

তিনি সর্ব্যাপী জ্যোতির্ময় অকায় অব্রণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি কবি মনীষী সর্বোত্তম স্বয়ম্ভূ; শাশ্বত কালের জন্য যথাতথ্যত: কর্তব্যবিধান করিতেছেন। ইনি একদেবতা সর্বভূতে গূঢ়, সর্বব্যাপী— সর্বভূতে অন্তরাত্মা, তিনি কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী চেতা নির্গুণ। তাঁহার কাছে শুধু প্রার্থনা করা চলে, তিনি আমাদের ধী-সমূহকে চালিত করুন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত করুন। জগতের পতিতগণের জন্য কর্মযোগের দ্বারা সেবাব্রতে উৎসুক গান্ধীজীর নিকট ভগবানের বিগ্রহবান্ 'পতিতপাবন'-রূপটিই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছিলেন 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'; রবীন্দ্রনাথের নিকটে তাই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এবং তাহার পিছনকার যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' তাহাই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছিল।

আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, গান্ধীজীর বিশ্বাসটা একবার যখন পাকা হইয়া উঠিল তখন তাহার ভিতরে আর বিশেষ কোনও বিবর্তন দেখিতে পাই না। বিবর্তনের মধ্যে একই তানে এই বিশ্বাস দিন-দিন বাড়িয়াই গিয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বসাধারণকে লইয়াই যখন তাঁহাকে

সমস্ত জীবন কাজ করিতে হইয়াছে, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত সকলকেই সর্বদা নিজের সঙ্গে টানিয়া লইতে হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শী কাহাকেও বাদ দিলে চলে নাই— তখন ধর্মমতকে গান্ধীজী এই-সকল শ্রেণীর জনসমাজের যে একটা সরল বিশ্বাসের মত ও পথ আছে, সেই মত ও পথের যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন। এই ভাবেই 'রামধুন' গান তাঁহার সর্বপ্রিয় ভজন হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য কোনও তাত্ত্বিক কারণ হইতে এই ভজনে যে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের জনসাধারণ সহজে যোগ দিতে পারে ইহার পিছনে এই তত্ত্বটাই বড় ছিল বলিয়া বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বমানবতার সঙ্গে একটা অখণ্ডযোগের আকাঙ্ক্ষা সারাজীবন ভরিয়াই দেখিতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই যোগসাধনের পন্থা ছিল অনেকখানি পৃথক্। তাঁহার এই যোগসাধনের মুখ্য পন্থা ছিল নিরন্তর আনন্দসৃষ্টির আয়োজনের ভিতর দিয়া— তাঁহার সমস্ত জীবনের কবিকর্মের ভিতর দিয়া। অন্য কোনও পন্থা যে তিনি কোনও দিন গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে তিনি কাজ করিয়াছেন, উপাসনা-মন্দিরে আচার্য রূপে তিনি অনেক উপাসনা করিয়াছেন, ভাষণ দান করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনে ধর্মের প্রকাশ ইহার মধ্য দিয়া ততখানি সত্য হইয়া ওঠে নাই যতখানি সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবিকর্মের ভিতর দিয়া। নিখিলমানবের সঙ্গে এবং তাহার ভিতর দিয়া নিখিলমানবের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট যে মহান্ পুরুষ তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের অন্তর্নিবাসী পুরুষের যোগ সর্বাপেক্ষা সহজ এবং গভীর করিয়া অনুভব করিয়াছেন এই পন্থায়। বিশ্বমানবের জন্য শ্রমকে নিঃস্বার্থ সেবাকর্মে রূপান্তরিত করিবার তাগিদ লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই তাগিদের মধ্যে কোথাও কোনও খাদ ছিল না, মানুষের সঙ্গে নিজের যোগকে আরও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবারই সত্যকারের ব্যাকুলতা, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তিনি শুধুমাত্র কতকগুলি কর্মপ্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না ; সমস্ত কর্মকেই তিনি এমন পরিকল্পনায় রূপ দিলেন যে, সে কর্মও তাঁহার নিজস্ব সৃজনাত্মক কবিধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, শরণপ্রপত্তি প্রেমভক্তির প্রাধান্য লইয়া গান্ধীজীর মধ্যে দেখা দিয়াছে ভারতের বৈষ্ণব-প্রবণতার প্রাধান্য এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিয়াছে উপনিষদের অনির্দেশ্য পুরুষে বিশ্বাস— এ কথা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে স্মরণ করিয়া কিভাবে স্বীকার করা যায়। গীতাঞ্জলির গানগুলি যদি প্রেমভক্তির গান না হয়, আত্মনিবেদনের ভগবৎশরণের গান না হয়, তবে প্রেমভক্তি ও আত্মনিবেদনের গান বলিব কাহাকে। রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি ব্রহ্মসংগীত নামে প্রসিদ্ধ সেগুলির ভিতরেই বা প্রেমভক্তি এবং আত্মনিবেদনের অভাব কোথায়। রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় অনেকগুলি গান গান্ধীজীর নিজেরই তো অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এবং গীতাঞ্জলির যুগে রচিত গানগুলিই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের সমগ্রতার পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের অন্যান্য সব কবিসৃষ্টি হইতে এই গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিয়া আমাদের প্রচলিত ধর্মচেতনার আলোকে এগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া লইলে আমরা সমগ্র সত্যকে লাভ করিতে পারিব না। যে ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্মধর্ম যত সংস্কারপন্থীই হোক-না কেন তাহার ভিতরেই

দু-এক রকমের একটা প্রথাবদ্ধতা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যে এই প্রথাবদ্ধতা যে অনেকখানি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যুগের কতকগুলি গানকে আমরা প্রচলিত ভক্তি-প্রপত্তির পন্থায় যে ভাবে গ্রহণ করি তাহাও সর্বথা ঠিক নহে। এখানকার কবির ভগবৎ-চেতনার মধ্যেও বিশ্বপ্রবাহ এবং সেই বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন 'আমি'-প্রবাহের বিচিত্র কবি-অনুভূতির যে একটি দীর্ঘদিনের ইতিহাস রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এইসব সত্ত্বেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, গীতাঞ্জলির যুগে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহিত ভক্তি-প্রপত্তি-প্রধান বৈষ্ণবতার অনেক প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে এই একটি মৌলিক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথাপদ্ধতি শাস্ত্র-আপ্তবাণী বা বিশ্বাসের পথকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা কোনও একটানা স্রোতে প্রবাহিত হয় নাই। তাঁহার বিচিত্র কবি-অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ধর্মবোধ সমস্ত জীবন ধরিয়া বিচিত্রভাবে বিবর্তিত হইয়াছে। অল্পবয়সেই তাঁহার উপনয়ন হইয়াছিল এবং অল্পবয়স হইতেই গায়ত্রীমন্ত্র এবং উপনিষদের মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতেন; কিন্তু ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ধর্মবোধ গড়িয়া ওঠে নাই। এই বয়সে শুধু উপনিষদ্ হইতে সঞ্চয়, সেই সঞ্চয় কাজে লাগিয়াছে পরবর্তী কালে ধর্মচেতনার বিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে। তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়া যে ধর্মচেতনার বিবর্তন হইয়াছে তাহা যে তাঁহার মনের অজ্ঞাতে উপনিষদের ঋষিগণের ধর্মচেতনার অনুরূপভাবেই হইতেছিল ইহা কবির নিজের নিকটেই একদিন একটা আবিষ্কার রূপে দেখা দিয়াছিল; তাহার পর হইতে উপনিষদের সঞ্চয় হইতে সচেতনভাবেই কেবল নিজের ধর্মচেতনার সায় খুঁজিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার বিবর্তনের প্রথম যুগটা দেখি অনন্ত জিজ্ঞাসার যুগ; তাহার পরে দেখি এই অনন্ত জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজের কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া একটা 'জীবনদেবতা'র আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে।

'নৈবেদ্যে'র সময় হইতে এই 'জীবনদেবতা'র সহিত উপনিষদের মহানপুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ ও মিলন হইতে লাগিল। 'খেয়া' পার হইয়া গিয়া 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি 'জীবনদেবতা'কে অনন্ত লীলাময় 'তুমি' করিয়া লইলেন এবং কিছুদিন ধরিয়া সৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মাস্বাদনে চিরপিপাসিত অনন্ত লীলাময় 'তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র একটি নিত্যলীলার রহস্যে মাতিয়া উঠিলেন। 'আমি' হইলাম 'তুমি'র একটি ভাবকণা, একটি অখণ্ড জীবনপ্রবাহের ভিতর দিয়া ক্রমপ্রসার্যমান ব্যক্তিত্বে তাহার অনন্ত বিকাশ। এই 'আমা'র বিকাশ ও তাহার ভিতর দিয়া 'তোমা'র প্রকাশ— এই বিকাশ-প্রকাশের আনন্দলীলা লইয়া কাটিয়াছে 'গীতাঞ্জলি'র যুগ। 'বলাকা' হইতে আবার বাঁক ফেরা আরম্ভ হইল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে এবং তাঁহার সকল রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে ব্যাপক যোগের ফলে চিত্তে দেখা দিতে লাগিল নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা— সুরে ধরা পড়িল সংশয়ের রেশ। ভাবপ্রাধান্যের পরিবর্তে ঠিক যুক্তিপ্রাধান্য দেখা না দিলেও ভাবদৃষ্টিকে যুক্তি-দ্বারা কিছু-কিছু যাচাই করিয়া লইবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ঈশ্বরে অন্ধভক্তিহীন মানবতাবাদ কবির মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া না

রাখিলেও তাহা কবির চেতনার মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। মহানপুরুষকে—'বিশ্বকর্মা দেব'কে—সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিল, মানুষের সেবার মধ্য দিয়াই যে সেই 'মহান পুরুষ'কে অনুভব করিতে ও তাঁহার সেবা করিতে হইবে সকল অধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে—এই কথাটাই শেষজীবনে বড় হইয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মহামানবের সঙ্গে যোগসাধনের প্রধান পন্থাও শেষপর্যন্তই রহিয়া গিয়াছে তাঁহার কবিকর্মে। অন্য কর্মপন্থার আদর্শ তিনি দিয়াছেন, সে বিষয়ে চিন্তা জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, প্রেরণা দান করিয়াছেন, তাঁহার ভাব-ভাবনা চিন্তা-উপদেশ পরিকল্পনা-উৎসাহ দ্বারা কতকগুলি কাজ তিনি সহকর্মিগণের দ্বারা করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের পক্ষে যোগসাধনের শ্রেষ্ঠপন্থা রাখিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম।

ধর্মের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের মনের কাঠামোর যে কিভাবে মৌলিক পার্থক্য ছিল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে তাঁহাদের কিছু বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধী তখন দক্ষিণ-ভারতে। সেখান হইতে তিনি হরিজন-পত্রিকায় একটি বিবৃতিতে মত প্রকাশ করিলেন যে বিহারের বর্ণহিন্দুগণের অস্পৃশ্যতা-পাপই হইল বিহারের ধ্বংসলীলার মূল কারণ; রুদ্র বিধাতার নিকট হইতে পাপের শাস্তি রূপেই এই ধ্বংসের কঠোর দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে। বিবৃতি প্রকাশিত হইবার সঙ্গেসঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তানায়কগণের শ্রেষ্ঠপ্রতিনিধিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে তৎকালীন 'ইউনাইটেড প্রেসে'র মারফত একটি তীব্র প্রতিবাদ বাহির হইল, প্রতিবাদে প্রকাশ পাইল রবীন্দ্রনাথের বেদনামিশ্রিত বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথের মুখ্য বক্তব্য ছিল এই—

"প্রাকৃত জড়ঘটনাসমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হইল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনিবার্য এবং একমাত্র কারণ। বিশ্ববিধানসমূহ অলঙ্ঘ্য; এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিজেও কোনো দিন হস্তক্ষেপ করেন না। যদি করিতেন তবে তিনি নিজেই তাঁহার নিজের সৃষ্টির সামগ্রিক সততা নষ্ট করিয়া দিতেন। এই কথায় যদি আমরা বিশ্বাস না করিতাম তাহা হইলে বর্তমান যে ঘটনাটি ভয়াবহরূপে ব্যাপকভাবে আমাদের মর্মে তীব্র আঘাত করিয়াছে এই জাতীয় ঘটনাস্থলে বিধাতার কার্যকলাপের সমর্থন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত।

"আমরা যদি আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে বাহ্যসৃষ্টির ঘটনাসমূহের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে নৈতিক দিক দিয়া বিধাতা হইতে মানবপ্রকৃতি অনেক বড়; কারণ, দেখা যাইবে সৎচরিত্র-শিক্ষার প্রচারের জন্য তিনি এমন বিপর্যয় ঘটাইয়া বসেন যাহা সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক। আমরা মানুষের মধ্যে এমন কোনও সুসভ্য শাসকের কথা কল্পনা করিতে পারি না যিনি আকস্মিক নরহত্যার দ্বারা একটা বাছবিচারহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিবেন; এ নরহত্যার মধ্যে শিশু আছে, অস্পৃশ্য সমাজের লোকেরাও আছে; আর এই হত্যাসাধন করা হইবে সেইসকল লোকেরই মনে দাগ কাটিবার জন্য যাহারা নিরাপদে দূরে বাস করিতেছে—অথচ তাহারাই হইল তীব্র নিন্দার ও শাস্তির যোগ্য।"

বিবৃতির শেষদিকে কবি বলিয়াছেন—

"আমাদের দিক হইতে এই বিশ্বাসেই নিজদিগকে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছি যে আমাদের

পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক— তাহারা এত শক্তিশালী কখনোই নয় যাহাতে সৃষ্টির কাঠামোটিকেই নিম্নে টানিয়া লইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

"এই সৃষ্টির কাঠামোর উপরে আমরা পাপী এবং পুণ্যাত্মা, গোঁড়া এবং প্রথাভঙ্গকারীর দল— সকলেই নির্ভর করিতে পারি। মহাত্মাজী তাঁহার বিস্ময়কর প্রেরণা-দ্বারা দেশবাসীর মনে যে ভয় ও ভীরুতা সঞ্চিত ছিল তাহা হইতে সকলকে মুক্তির জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন; তাহার জন্য তাঁহার কাছে আমরা যাহারা অশেষভাবে কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করি তাহারাই আবার মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করি যখন দেখি যে মহাত্মাজীর মুখ হইতে এমন বাণী নিঃসৃত হইতেছে যাহা সেইসব দেশবাসীর মনে অযুক্তির উপাদানসমূহকে বড় করিয়া তুলিতে পারে— এই অযুক্তিই হইল সকল অন্ধশক্তির মূল আকর— যাহা আমাদিগকে জোরপূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে।"

দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও মহাত্মাজী তাঁহার পূর্বমত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরঞ্চ নিজের মতে দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি হরিজন-পত্রিকায় (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) কবির প্রতিবাদের উত্তরে আবার বিবৃতি দিয়া বলিলেন—

"শান্তিনিকেতনের কবি শুধু শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিগণেরই 'গুরুদেব' নন তাঁহার নিজেরও 'গুরুদেব'। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই গুরুদেব এবং আমি আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলি পার্থক্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। আমাদের নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দ্বারা আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, বিহারের বিপৎপাতের সহিত আমি অস্পৃশ্যতার যোগাযোগ স্থাপন করায় গুরুদেব সর্বশেষে যেসব কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারাও এই শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও লাঘব হইবে না।

"তিন্নোভেলিতে বসিয়া আমি প্রথমে যখন বিহারের বিপৎপাতকে অস্পৃশ্যতার সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম তখন আমি যতদূর সম্ভব ভাবিয়া-চিন্তিয়াই কথা বলিয়াছিলাম, এবং সে কথা আমার পরিপূর্ণ অন্তর হইতেই বাহির হইয়াছিল। আমি যেমন বিশ্বাস করি তেমনই বলিয়াছিলাম। আমি বহুদিন ধরিয়া এই কথা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ ফলই উৎপাদন করে। আমি ইহার উল্টাটাকেও সমভাবেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

"আমার কাছে ভূমিকম্প ভগবানের কোনও খেয়ালমাত্র নয়, নিছক কতকগুলি অন্ধশক্তির মিলনেও ইহা সংঘটিত হয় নাই। আমরা ভগবানের সব বিধানের কথা জানি না, সেগুলির কার্যবিধির কথাও জানি না। সর্বাপেক্ষা সমুন্নত বৈজ্ঞানিক অথবা সর্বাপেক্ষা বড় অধ্যাত্মবাদীর জ্ঞানও একটি ধূলিকণার মত। আমার কাছে আমার ভগবান আমার পিতার ন্যায় একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীব নন, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনন্তগুণে বেশি। আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিতেও তিনি আমাকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আমি আক্ষরিক ভাবেই এ কথা বিশ্বাস করি যে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতাও নড়ে না। তাঁহার করুণাময়ী ইচ্ছার উপরেই আমার প্রত্যেকটি শ্বাস নির্ভর করিতেছে।

"তিনি এবং তাঁহার বিধান এক। বিধানই ঈশ্বর। তাঁহার সম্পর্কে যেটাকে বিভূতি বলিয়া বলা হয় তাহা বিভূতি মাত্র নহে; তিনি নিজেই বিভূতি। তিনিই সত্য প্রেম বিধান— মানুষের

বুদ্ধিচাতুর্য আরও যত লক্ষ লক্ষ জিনিসের নাম করিতে পারে তিনি তাহার সবই। গুরুদেবের সহিত আমিও বিশ্ববিধানের অমোঘতায় বিশ্বাস করি, যাহার ভিতরে ভগবান নিজেও হস্তক্ষেপ করেন না। ইহার কারণ ঈশ্বর নিজেই বিধান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, আমরা বিধানসমূহের বিধান জানি না, এবং আমাদের নিকটে যাহা একটা সর্বনাশ বলিয়া মনে হয় তাহা ঐরূপ মনে হইবার কারণ এই যে, আমরা বিশ্ববিধানসমূহকে যথোপযুক্তভাবে জানি না।· ·

"গুরুদেবের সহিত আমি এ কথায় একমত নহি যে, 'আমাদের পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক— তাহারা এত শক্তিশালী কখনোই নয় যাহাতে সৃষ্টির কাঠামোটিকেই নিম্নে টানিয়া লইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।' অপর পক্ষে আমার বিশ্বাস, অন্য কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা আমাদের নিজেদের পাপ-সমূহ এই কাঠামোটিকে ধ্বংস করিয়া দিতে অধিক শক্তিশালী। জড়বস্তু ও আত্মার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন রহিয়াছে; আমরা এতদুভয়ের ফলগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অজ্ঞতাই অনেককে বাহ্য বিপৎপাতকে নিজেদের নৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাইতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছে।"

বিবৃতি দুইটির মধ্যে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে বড় দুইটি পার্থক্য দেখা দিয়াছে তাহা হইল এই: প্রথমতঃ গান্ধীজীর বিশ্বাস বাহ্যপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি এবং মানুষের অন্তর্জগতের নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক নয়, ভগবানের একই বিধানের দ্বারা জড়প্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি একইভাবে নিয়ন্ত্রিত; তাঁহার ইচ্ছাই বিধানরূপে কাজ করে, সুতরাং বিধান এবং বিধাতা একই। জড়জগতের কোনও ঘটনা তাই মানুষের অন্তর্জীবনের ঘটনা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইতে পারে না; ভূমিকম্পস্বরূপ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সহিত নিশ্চয়ই তাই মানুষের কর্মের যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবৃতিতে সেই কথাটি অস্বীকার করিতেছেন; তিনি বলিতেছেন যে প্রকৃতির কতকগুলি অলঙ্ঘ্য বিধানের দ্বারা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত, মানুষের নৈতিক বিধানের সহিত তাহার কোনও অচ্ছেদ্য যোগ নাই, মানুষের পাপভারে পৃথিবী কখনো রসাতলে যাইতে পারে না। গান্ধীজীর ধারণা, পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইবার ক্ষমতা মানুষের পাপেরই হইল সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্মের নামে এমন-কিছু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নন যাহা সরাসরি আমাদের যুক্তির বিরুদ্ধে যায়। গান্ধীজী সে ক্ষেত্রে বলিবেন, মানুষের বুদ্ধিবিচারের শক্তি একেবারেই সীমাবদ্ধ; তাই সেই বুদ্ধিবিচারের উপরে সর্বত্র নির্ভর করা সম্ভব নহে। ভগবান কোন্ ইচ্ছা লইয়া কোন্ কাজ করেন তাহা আমরা সবটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না বলিয়া ভগবানের সক্রিয় ইচ্ছাকে যদি আমরা অস্বীকার করি তবে তো আমরা ভগবানকেই অস্বীকার করিয়া বসিব।

এখানে কাঁহার বিবৃতি, ঠিক কাঁহার বিবৃতি, যে ঠিক ইহা নির্ধারণ করা আমি দুঃসাধ্যই মনে করি; কারণ যুক্তি দিয়া যদি বিচার করিতে যাই তবে উভয়ের সঙ্গেই তর্ক করা যাইতে পারে; আসলে এখানে লক্ষ করিবার জিনিস হইল বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত দুইটি মনে ধর্মবোধের স্বাভাবিক বিভিন্ন প্রকাশ। মানসিক সংগঠনের সঙ্গে এখানে মানসিক পরিবেশের পার্থক্যের প্রশ্নও অবজ্ঞেয় নহে। যে মানুষ এমন এক ইচ্ছাময় অনন্ত শক্তিমান ভগবানে বিশ্বাসী যিনি নিজের অনন্ত ইচ্ছাকেই অনন্ত শক্তিরূপে চালিত করিয়া সম-উদ্দেশ্যে সমচ্ছন্দে জড় ও চেতনাকে প্রতিমুহূর্তে পরিচালিত করিতেছেন

তাঁহার পক্ষে একটি বিরাট ভূমিকম্পকে ঈশ্বরের কোনও বিশেষ ইচ্ছার সঙ্গে যোগহীন চেতনমনুষ্যের জীবনযাত্রার সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগহীন একটি প্রাকৃতিক নিয়মে আকস্মিক ঘটনামাত্র বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব; এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা মানুষই বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হইতেছে অথচ মানুষের জীবনযাত্রার দোষগুণ বা পাপপুণ্যের সঙ্গে ইহার কোনই যোগ নাই এ কথাই বা কি করিয়া বলা চলে; হাজার হাজার মানুষ চরম দুর্গতি এবং যন্ত্রণা লাভ করিতেছে জড়প্রকৃতির কাছ হইতে— অথচ এই চরম দুর্গতির এবং যন্ত্রণার কারণ তাহার নিজের মধ্যে কোথাও এতটুকুও নাই— আবার সঙ্গে সঙ্গে বলিব যে এমন এক প্রেমময় মঙ্গলময় বিশ্বদেবতা রহিয়াছেন যাঁহার ইচ্ছা-সঙ্কল্প ব্যতীত গাছের পাতাটিও নড়ে না— ইহা যে স্ববিরোধী কথাই হইয়া দাঁড়ায়। একজন চরম ভগবদ্-বিশ্বাসীরূপে এ পর্যন্ত গান্ধীজীর কথা একরকম বুঝিতে পারি; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রয়োগ করিতে মনুষ্যবুদ্ধির উপরে সত্যসত্যই অত্যাচার করিতে হয়, এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। যুদ্ধ মহামারী ভূমিকম্প প্রভৃতি জাতীয় আপৎপাত-কালে যখন এক সঙ্গে সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ লোক সমভাবে চরম নিগ্রহ লাভ করে তখন এ কথা ভাবিতে সত্যই বাধা পাই যে কোনও পাপের সমকর্মফলেই ইহারা এই সমনিগ্রহ লাভ করিল। তাহা ছাড়া যেই বিশেষ ক্ষেত্র লইয়া এই বিতর্ক সেখানে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহাতে অস্পৃশ্যতার পাপের ফলে বিধাতার রুদ্ররোষ ভূমিকম্পরূপে দেখা দিলে বিহারের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের বহু ভূমিখণ্ড ফাটিয়া ধসিয়া বসিয়া যাওয়া উচিত ছিল; তাহা তো কোনো দিনও আমরা দেখিলাম না। এইখানেই উত্তর আসিবে ভগবৎ-ইচ্ছা কোথায় কিভাবে কাজ করে তাহা একান্তভাবেই মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। ইহা চরম বিশ্বাসীর কথা; গান্ধীজীরও এই কথা। রবীন্দ্রনাথ আসলে ঠিক এই ধরণের ব্যক্তি-ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন না, ধর্মের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ধরণের বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না। যে বিশ্বাস যুক্তিদ্বারা সমর্থিত নয় তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'অযুক্তি' (unreason); তাঁহার মতে যাহা অযৌক্তিক তাহাই কুসংস্কার। গান্ধীজী বলিবেন, ইহা অযৌক্তিক নহে; যুক্তির অগোচর; যুক্তির অগোচর হইয়াও ইহা আমার চৈতন্যের ঘনীভবনের দ্বারাই নিজের ভিতরে লব্ধ, অতএব ইহা সত্য।

আমি একটু পূর্বেই মানসিক ধাতুগত পার্থক্যের সহিত মানসিক পরিবেশ পার্থক্যের কথা বলিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে মনে হয়, এই যুগে গান্ধীজীর দেহমন অস্পৃশ্যতা-রূপ মানবিক অবিচারের দ্বারা এমনভাবে অধিকৃত এবং উদ্বেজিত ছিল, অস্পৃশ্যতাকে ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে তিনি এমন একটা মর্মন্তুদ অন্যায় বলিয়া প্রতি পলে উপলব্ধি করিতেছিলেন যে তাঁহার অন্তর্নিহিত সহজাত ন্যায়বোধই নানা দিক হইতে ইহার একটা প্রতিফলের আশঙ্কা করিতেছিল। ইহার ফলেই তিনি বিহারের ভূমিকম্পকে বিহারবাসীগণের অস্পৃশ্যতা-পাপের ফল বলিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, ইহারই কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হিবার্ট লেকচারস্-এ '*The Religion of Man*' ও কমলা লেকচারস্-এ 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচিন্তা মানবতাবাদের ধারার সহিত উপনিষদ্‌কে মিলাইয়া মিশাইয়া একটা নূতন রূপ গ্রহণ করিতেছিল। মানবতাবাদের দিকে ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে যুক্তিবাদ ও

বিজ্ঞাননিষ্ঠার প্রাধান্যও লক্ষণীয়। পূর্বেও এই ঝোঁক তাঁহার মধ্যে যদি সমভাবে বর্তমান দেখিতে পাইতাম, পূর্বেও তিনি যদি এত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে পারিতেন যে জড়জগতের প্রাকৃতিক বিধানের সহিত মনুষ্যজগতের নৈতিক বিধানের কোনওরূপ কোনও যোগ নাই তবে তাঁহার ভিতরকার নিত্যপরিবর্ধমান আমি-পুরুষটি যে বহুযুগ এক সঙ্গে একই ছন্দে ধূলি তৃণের সঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে সেই কবি-অনুভূতিটি এত সহজ ও সুন্দর হইয়া দেখা দিতে পারিত না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে হইয়াছে। জীবনপথে গান্ধীজী আজীবনই কর্মযোগী; রবীন্দ্রনাথেরও কর্মজীবন রহিয়াছে, তথাপি সেই কর্মজীবনের মধ্যেও মুখ্যতঃ তিনি কবি। আজীবন কর্মী বলিয়া গান্ধীজী তাঁহার সকল ধর্মানুভূতি এবং ধর্মবিশ্বাসকে সর্বদাই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেন। সকল রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন— ভাবনাকে ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা যেখানে রূঢ়তম রূপ ধারণ করিয়াছে গান্ধীজী সেইখানেই তাঁহার ধর্মের বিশ্বাস এবং ভাবনাকে সমস্ত দেহমন দিয়া বার বার করিয়া প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মবোধকে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নাই এমন কথা প্রকাণ্ড ভুল কথা হইবে, কিন্তু গান্ধীজীকে জীবনের প্রতি পদে পদে যেরূপ বাস্তব রূঢ়তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে রবীন্দ্রনাথকে তাহা হইতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির ক্ষেত্র তাই মুখ্যভাবে কাব্যানুভূতির ক্ষেত্র। সেই কাব্যানুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার ধর্মবিশ্বাস জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যানুভূতির ভিতর দিয়া লব্ধ রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের মুখ্য কথা হইল সৃষ্টির উপরিতলায় 'যদ্ বিভাতি' তাহা সবকিছুই 'আনন্দরূপমমৃতম্' আর ইহার নীচের তলায় নিত্যকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া আছেন 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'। কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া এই ধর্ম-অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে একান্তভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল; শুধু তাঁহার নিজের জীবনে নয়, তাঁহার গান ও কবিতার মধ্য দিয়া এই সত্যকে তিনি নিখিল মানবের জীবনে অনেকখানি সত্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গান্ধীজীর অবিচলিত শ্রদ্ধার ইহার একটি মূল কারণ। টলস্টয় বার বার করিয়া এই কথাটি বলিয়াছেন যে, কবিরা হৃদয়ের কাছে প্রত্যক্ষে আবেদন জানাইয়া সত্যকে বৃহত্তর জনসমাজে যেভাবে গ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারেন অপর কেহই তেমন করিয়া পারেন না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই কথাটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়াতেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি আন্তরিকতার সহিতই 'গুরুদেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর ন্যায় প্রত্যেক রূঢ় বাস্তবতার খুঁটিনাটির ভিতরে ধর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়াই হয়তো ঐ জাতীয় প্রসঙ্গে সর্বত্র ধর্মকে টানিয়া আনাটা রবীন্দ্রনাথের তেমন ভালো লাগত না। এই জন্যই কি গীতার উপস্থাপনাটি তাঁহার তেমন ভালো লাগে নাই? অতবড় একটা যুদ্ধের প্রয়োজনের সঙ্গে গীতার অধ্যাত্ম উপদেশের মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না। রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত ১৩১৫, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে (পত্রখানি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে) দেখিতে পাই—

"গীতার মধ্যে কোনো-একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে। কোনো একজন

মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতায় সে রকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসাধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারে নি।"

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অত অধ্যাত্মিক উপদেশের ছড়াছড়ি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নাই। গান্ধীজীর কিন্তু *এইটিই* আবার সর্বাপেক্ষা বেশি ভালো লাগিয়াছে। তিনি বলিতেন, ধর্মোপদেশের প্রকৃষ্ট স্থান কোথায়? যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে ভাইয়ে ভাইয়ে সর্বধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তো মানুষকে মানুষের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপরের তলায় সবই যদি 'আনন্দরূপমমৃতম্' হয়, আর নীচের তলায় শুধু 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' হয় তবে বিহারের ভূমিকম্পের সত্যকে কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে এ কথাটা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রবল হইয়া জাগিয়া ওঠে নাই; তাই তিনি এ প্রসঙ্গে কোনও 'অযুক্তি'র কথা না বলিয়া পারিয়াছেন, গান্ধীজী অগ্রবর্তী হইয়া এখানেও ধর্মবোধকে যেভাবে প্রয়োগ করিতে গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকেও সেইভাবে কথা বলিতে হইলে তিনিও কিছু 'অযুক্তি'র কথা বলিয়া ফেলিতেন আশঙ্কা করি। 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', বিহারের ভূমিকম্পের বজ্রও সহস্র সহস্র মানুষের উপরেই পতিত হইয়াছিল। সেই বজ্রে কি কোনো বাঁশিই বাজে নাই? সাধারণভাবে বজ্রে বাঁশি বাজে এ কথায় তেমন কোনও আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বজ্রপাতে কি বাঁশি বাজিল সেইখানেই তো সকল সমস্যা।

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে পথে ধর্মবোধের জাগরণ ও ধীরে ধীরে ঘনীভবন ঘটিয়াছে গান্ধীজীর জীবনে সে পথে ধর্মবোধের জাগরণ ও ঘনীভবন হয় নাই। শুধু শাস্ত্র পারিবারিক প্রভাব বা সামাজিক পরিবেশের ভিতর দিয়া ইঁহাদের ধর্মবোধের জাগরণ নয়। মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে দেখিয়াছি প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকায় লাঞ্ছিত মানবের জন্য সত্যাগ্রহের সংগ্রামের ভিতর দিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাঁহার কর্মজীবন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলিয়াছে এই সংগ্রামময় কর্মজীবন। এই কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গান্ধীজী সর্বদার জন্য অফুরন্ত আত্মিক শক্তির প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, ভিতর হইতেই তীব্র আবেগ বোধ করিয়াছেন আত্মিক শক্তির কোথাও একটি অফুরন্ত আকর আবিষ্কার করিয়া লইতে; ভগবৎ-বোধ তাঁহার ভিতরে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল এই আত্মিক শক্তির অনন্ত আকররূপে; দেহমন শিথিল হইতে চাহিলে তিনি আত্মস্থ হইয়া ভগবানের সহিত তাঁহার সমগ্র জীবনের এবং তৎসহ সমগ্র বিশ্বজীবনের একান্তযোগকে অনুভব করিতে চাহিতেন, ভগবানের নিকট হইতে নব নব শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন, জীবন শুকাইয়া আসিতে চাহিলে ভগবৎ-প্রেমের অমৃতরসে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। গান্ধীজীর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে লাঞ্ছিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ এবং মেহনতী মানুষের

মধ্যে। মেহনতী মানুষের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে গান্ধীজীর মধ্যে এই ভাবটি পরিপুষ্ট এবং দৃঢ়মূল হইয়া উঠিল যে কায়িক শ্রম অধ্যাত্মচিন্তা ও অনুভূতির ভিত্তিভূমি, দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির ইহাই প্রাথমিক সোপান। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, সহজাত প্রবণতা হইতেই তিনি জীবনের প্রথমাবধি বিশ্বসৃষ্টিকে অসম্ভব রকমে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন তাঁহার রূপমুগ্ধতা, তেমন তাঁহার প্রেমমুগ্ধতা। সৌন্দর্যের অনুভূতি অজস্রভাবে লাভ করিয়াছেন বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে; সেই সৌন্দর্যকে আবার মানুষের অনন্তরহস্যময় চেতনার স্পর্শে পরিপূর্ণ করিয়া পাইয়াছেন মানুষের প্রেমে। তাই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুকেও ভালোবাসিয়াছেন, মানুষকেও ভলোবাসিয়াছেন। এই গভীর ভালোবাসায় বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুর মধ্যেও নামিয়া আসিয়াছে অনন্তের স্পর্শ, মানুষের সব-কিছুর মধ্যেও নামিয়া আসিয়াছে অনন্তের স্পর্শ। সকল সীমা কবিহৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল অসীমের আভাস। কবির গভীর হৃদয়ানুভূতির মধ্যে সে অসীম নিছক একটা তথ্যগত বা রূপরসহীন তত্ত্বমাত্র হইয়া প্রকাশ পায় নাই—প্রকাশ পাইয়াছে জীবনের সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের আকররূপে। সেই অসীমই রবীন্দ্রনাথের সকল অধ্যাত্মচেতনার মূলে।

এই যে দুইটি পথ ইহা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দুইটি পথ নয়, জীবনে ইহারা দেখা দেয় পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হইয়া। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের গান, গান্ধীজীর মনকে সরস করিয়া তুলিয়াছে; আবার জীবন-সংগ্রামের সর্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মবোধে অচল প্রতিষ্ঠা গান্ধীজীর জীবনে যে বার বার সত্যমূল্য লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সর্বত্রই অনুভব করিয়াছেন চিত্তবিস্তার। এ-ভাবে উভয়ের ধর্মবোধ উভয়ের অনুপূরক; পরিণাম দুইয়ের মধ্যে গভীর মিল এবং ঐক্য। গান্ধীজীর সকল ধর্মচিন্তা ও অনুভূতি চরম পরিণতি লাভ করিল জীবনের এই ধ্রুবপদে যে জীবনের যাহা-কিছু সকলের মূল্য অধ্যাত্মসত্যের স্পর্শে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেরও এইটিই ধ্রুবপদ। একদিকে উভয়ই যেমন জীবনের চরমমূল্য লাভ করিতে চাহিয়াছেন অধ্যাত্মবিশ্বাসের মধ্যে, অপর দিকে উভয়ই আবার এই অধ্যাত্মবোধের চরমসার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছেন মহামানবের কল্যাণের মধ্যে।

গান্ধীজীর ক্ষেত্রে দেখিলাম, লাঞ্ছিত অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষ এবং শ্রমনির্ভর মেহনতী মানুষের সংস্পর্শেই অধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধন ও পরিপুষ্টি। এই দিক হইতে টলস্টয়ের সহিত গান্ধীজীর একটা গভীর মিল এবং যোগ ছিল। টলস্টয়ও ছেলেবেলা হইতে পারিবারিক চার্চধর্মের প্রথাবদ্ধ প্রার্থনা-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু যত বয়স বাড়িতে লাগিল এবং বুদ্ধি বাড়িতে লাগিল টলস্টয় তত তীব্রভাবে নাস্তিক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার 'আমার স্বীকৃতি' *(My Confession)* নামক গ্রন্থে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"মানুষের জীবন ও বিবর্ধনের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি অধ্যাত্মিক কারণ, সেই আধ্যাত্মিক কারণগুলিই ভাবাদর্শরূপে মানুষের জীবন পরিচালন করে। এই ভাবাদর্শগুলি প্রকাশ লাভ করে মানুষের ধর্মে, বিজ্ঞানে, শিল্প-কলা-সাহিত্যে, মানুষের বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রব্যবস্থায়। এই ভাবাদর্শগুলি ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া উর্ধ্বগামী হইতে থাকে, শেষে গিয়া পরম শ্রেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি

নিজে একজন মানুষ, মানুষের এই ভাবাদর্শকে প্রচার করা এবং তাহাদিগকে সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তোলায় সাহায্য করাই আমার একান্ত কর্তব্য।"

কিন্তু টলস্টয় অসাধারণ সারল্যের সঙ্গে তাঁহার স্বীকৃতিতে বলিয়াছেন, তাঁহার তৎকালীন ভোগলিপ্সু বিলাস-ব্যসনে মগ্ন উচ্ছৃঙ্খল অভিজাত জীবনে এ কথাগুলি যথার্থ কোনো সত্য বহন করিত না, এগুলি দেখা দিত জীবনের দুর্বল মুহূর্তগুলিতে কতকগুলি অলীক সান্ত্বনা বা বঞ্চনার মত। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি নিজের দিকে কেবল তাকাইতেন এবং পরশ্রমনির্ভর অত্যাচারী ভোগলিপ্সু তাঁহার সমশ্রেণীর অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকদিগের দিকে তাকাইতেন; তাকাইয়া তাকাইয়া তাঁহার মনে হইত চারিটি উপায়ে এই সম্প্রদায়ের লোক জীবনের ভীষণতাকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। পলায়ন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা হইল অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া; জীবন জিনিসটাই যে খারাপ, ইহার সবটার মধ্যেই রহিয়াছে যে অসংগতি— এইটাকে অনুভব না করিবার এবং না বুঝিবার চেষ্টা করিয়া। দ্বিতীয় উপায় হইল এপিকিউরীয়— আমরা যাহাকে বলিতে পারি চার্বাকীয়; জীবনের সকল নৈরাশ্যের মধ্যেই যেখানে যেটুকু সুবিধাজনক আছে তাহাকে কাজে লাগাইয়াই যতটুকু সুখে থাকা যায়। তৃতীয় উপায় হইল চরিত্রের দৃঢ়তা ও সরলতা অবলম্বনে জীবনের ভীষণতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা; জীবনকে হত্যা করিয়াই এখানে আমরা জীবন হইতে রক্ষা পাইতে চাই। চতুর্থ উপায় হইল চরম দুর্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই দুর্বলতা হইতেই উদ্ভব আমাদের তথাকথিত ধর্মের। এই-জাতীয় আত্মাবলোকন বহুদিন পর্যন্ত টলস্টয়কে জীবনের চরম অর্থহীনতাবোধের এমন-একটা অসহ্যজ্বালার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল যে তিনি মনে করিতেছিলেন আত্মহত্যা ব্যতীত এই যন্ত্রণা হইতে আর মুক্তি নাই।

কিন্তু এইভাবে দীর্ঘদিন মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তির পরে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের কালে টলস্টয় মানুষের জীবনের মধ্যেই তাঁহার প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সংশয়-নৈরাশ্যের আত্মঘাতী বিষযন্ত্রণা পরশ্রমোপজীবী বিলাসী অভিজাত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরই সৃষ্টি। সহজ সরল যে কোটি কোটি মানুষ খাটিয়া খাইয়া দরিদ্রজীবন যাপন করিতেছে তাহারা উপরিউক্ত চারি-উপায়ের কোনও উপায়েই জীবনকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে না; শত দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যেও তাহারা কি গভীর বিশ্বাসে জীবনকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য নাগরিক-মনের বুদ্ধিবৃত্তি জীবনের সত্যকে বুঝিতে গিয়া নিরন্তর ব্যর্থতায় কেবল মৃত্যু কামনা করিতেছে; আর এই চাষী-মজুর শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ যুক্তিতর্ক ব্যতীত তাহাদের নির্মল চেতনার মধ্যে একান্ত সহজাতভাবেই জীবনের একটা গভীর অর্থ আবিষ্কার করিয়া জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মানুষের স্বার্থান্ধ ভোগলিপ্সু শোষকের বিকৃত বুদ্ধির কাছেই সত্যকার জীবন-জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নাই; শ্রমপূত সুস্থ সবল মানুষের তর্ককুজ্ঝটিকাহীন চেতনায় জাগিয়া ওঠে জীবনের যে গভীর প্রত্যয় তাহাই বুঝাইয়া দেয় জীবনের সত্যকার অর্থ। এই গভীর জীবন-প্রত্যয়ই তাহাদের জীবনে দেখা দেয় বিশ্বাস রূপে; এই বিশ্বাসই জীবন-শক্তি, এই বিশ্বাস কখনও মরিতে প্ররোচিত করে না— বাঁচিয়া থাকিতে আনন্দ ও প্রেরণা দান করে। নিজের জীবনেও তখন টলস্টয় বিশ্বাস লাভ করিলেন; সেই বিশ্বাস তাঁহাকে ইহাই শিক্ষা দিল—

"কোনও এক পুরুষের ইচ্ছাতেই এই জগতের জীবন প্রবাহিত হইতেছে। এমন একজন কেহ

আছেন যিনি আমাদের নিজেদের জীবন এবং এই বিশ্বজীবনকে তাঁহার দুর্জ্ঞেয় যন্ত্র-বিধানের দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। সেই ইচ্ছা আমাদের জীবনের ভিতর দিয়া কি চায় তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইবার আশা করিলে প্রথমে আমাদের সেই ইচ্ছাকে পালন করিতে হইবে, আমাদের জীবনে যাহা করণীয় তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমার যাহা করণীয় তাহা যে পর্যন্ত আমি না করি সে পর্যন্ত আমার দ্বারা তিনি কি করাইতে চান তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিব না, বিশ্বসৃষ্টির পিছনে তাঁহার কি উদ্দেশ্য তাহা আরও কম বুঝিতে পারিব।" এখানে টলস্টয়ের মুখ্য বক্তব্য এই, জীবনের সুষ্ঠু যাপনের ভিতর দিয়াই জীবনের পশ্চাতে নিহিত ভগবৎ-ইচ্ছাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়, জীবনকে ঠিকভাবে যাপন না করিয়া তাহাকে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া শুধু ভোগ করিতে চাহিলে জীবনের মহিমা বা তাহার অন্তর্নিহিত ভগবৎ-ইচ্ছা কিছুই বোঝা যাইবে না। সুষ্ঠুভাবে শ্রমপূত নির্লোভ জীবন যাপন করিলে আমরা জীবনের যে অর্থ বুঝিতে পারিব, টলস্টয়ের ভাষায় তাহা হইল এই—

"আমরা সকলেই পৃথিবীতে আসিয়াছি ভগবৎ-ইচ্ছায়; ভগবান মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে মানুষ নিজের আত্মাকে ধ্বংসও করিতে পারে রক্ষাও করিতে পারে। নিজের আত্মাকেই রক্ষা করাই যখন মানুষের জীবনের সমস্যা তখন মানুষকে ভগবৎ-বিধান অনুসারে জীবন যাপন করিতে হইবে। ভগবৎ-বাণী ও ভগবৎ-বিধান অনুসারে জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষকে জীবনের সকল ভোগ-আরাম ত্যাগ করিতে হইবে, কায়িক শ্রম করিতে হইবে, বিনীত হইতে হইবে, ধৈর্যশীল হইতে হইবে— প্রত্যেক মানুষের প্রতি করুণায় জাগ্রত হইতে হইবে।"

এই যে মহাকরুণায় সদা চিত্তকে জাগ্রত রাখিয়া নিখিলমানবের সহিত একান্তযোগের কথা ধর্মের ক্ষেত্রে এ কথা টলস্টয় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ— এই তিনেরই চরম কথা। কিন্তু টলস্টয় এবং গান্ধীজীর জীবনে দেখিতে পাই, তাঁহারা তাঁহাদের সহজাত প্রবণতা বশে পৃথিবীর শোষিত মানুষের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; সেই যোগের মধ্য দিয়া তাঁহারা অধ্যাত্ম একের সহিত যোগ জীবনের প্রতি স্তরে অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিজীবনের প্রথম হইতেই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি এবং মহামানবকে নিজের জীবনের সহিত অখণ্ডভাবে যুক্ত করিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমজীবনে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ যত প্রত্যক্ষ ও সত্য ছিল বিশ্বমানবের সহিত যোগ সেভাবে প্রত্যক্ষ ছিল না; বিশ্বমানবের সহিত যোগ প্রকাশ পাইয়াছে একটা সহজাত প্রবল কবি-আকাঙ্ক্ষা-রূপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা লক্ষ করিতে পারি, বিশ্বসৃষ্টির পিছনকার একটি এক সত্যের চেতনা তাঁহার ভিতরে যতই স্থির এবং ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাঁহার ভিতরে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জন্মিতে লাগিল— যে এককে পায় সে সকলেই পায়; যে একের ভিতর দিয়া সকলকে না পাইল তাহার জীবনে একের উপলব্ধি কখনও সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। অধ্যাত্মপ্রেম যদি নিখিলমানবের প্রতি সক্রিয় প্রেমে বিষয়ীকৃত হইয়া না উঠিল তবে অধ্যাত্মপ্রেম একটা শূন্য পদার্থ হইয়া রহিল। যিনি এক তিনি শূন্য এক নন, তিনি পূর্ণ এক; নিখিল-মানবকে এড়াইয়া গিয়া আমরা পূর্ণ একের কোথায় সন্ধান পাইব; রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাই এই আশ্চর্য জিনিসটি লক্ষ করি, তিনি জীবনে অধ্যাত্মসত্যে যত বেশি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা

করিতে লাগিলেন ততই বেশি করিয়া নিজেকে মানবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহামানবের পরিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়াই যে মর্ত্যের মধ্যেই দেবত্বের পূর্ণাবতরণের সম্ভাবনা এই কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিণত বয়সের কবিতা গান ও গদ্য প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্য দিয়া সমস্ত জগতের মধ্যে এত তারস্বরে এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে সে বাণী দেশকালের সীমানা অতিক্রম করিয়া নিখিল-মানবের নিকটে একটি নিত্যকালের আহ্বান হইয়া রহিয়াছে।

কবি-গুরুদেব

সুনীলচন্দ্র সরকার

শিক্ষাচিন্তার প্রাচীনতম নিদর্শন খুঁজতে হলে অবশ্য চলে যেতে হয় উপনিষদে গীতায়। কণফ্যুসিয়স্ ও লাওৎসে বা প্লেটো ও এরিস্টট্‌লের রচনায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে রীতিমত ধারাবাহিক চিন্তা একটা আধুনিক ঘটনা ; আর শিক্ষাসমস্যাগুলিকে মানুষের জীবন ও সভ্যতার পশ্চাৎপটে রেখে দেখবার চেষ্টা বা শিক্ষার পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগুলিকে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিত করার চেষ্টা তো আরো সাম্প্রতিক। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে তাঁদের যাঁরা আজ পৃথিবীর সব দেশেই great educators বা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু হিসাবে স্বীকৃত : জঁ জাক্ রুশো (১৭১২-৭৮), পেস্টালৎজি (১৭৪৬-১৮২৭), ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২), আর জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)।

এঁরা প্রত্যেকে যে কাজের দায়িত্ব বেছে নিয়েছিলেন তাতে সফল হবার জন্যে আবশ্যক ছিল শুধু অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিই নয়, তা ছাড়া বহুলপরিমাণ কল্পনাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি এবং বিচিত্র ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও মূল্যবোধ। আদর্শ শিক্ষাগুরুর মধ্যে একত্র হওয়া চাই দার্শনিক, কবি, মরমী সন্ত, সমাজসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক ও কর্মবীরের প্রতিভা ; কারণ তাঁকে সকল ধরণের লোক ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝতে হবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিক, তার অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর, চেষ্টা ও সিদ্ধির বিভিন্ন ক্ষেত্র—এর সব-কিছুই তাঁকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। যে চারজন শিক্ষাগুরুর নাম করা হয়েছে তাঁদের কেউই এইসমস্ত গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই অন্তত স্বনির্বাচিত কাজের উপযুক্ত গুণ ও ক্ষমতাগুলি লাভ করেছিলেন।

রুশো চেয়েছিলেন দোষসংস্পর্শমুক্ত শুদ্ধ মানবপ্রকৃতি নিয়ে তাঁর শিক্ষাসৌধ রচনা করতে ; রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চিন্তায় ছিল তাঁর মৌলিকদানের দাবি, আর মানুষ ও প্রকৃতিকে একটি গভীর তাৎপর্যময় দৃষ্টিতে দেখবার ক্ষমতা ছিল তাঁর যা কবিদের পক্ষেই সম্ভব।

পেস্তালৎজি ছিলেন চার্চের একনিষ্ঠ কর্মী ও একাগ্র সমাজসংস্কারক। একটি ধর্মানুগত পরিবারের জীবনে যে সুন্দর ও মূল্যবান উপাদানগুলি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তারই সাহায্যে তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ও সমাজ দু'এরই সংস্কার করতে। সেই উপাদানগুলি হচ্ছে : বাপমায়ের স্নেহ, সন্তানের শ্রদ্ধা ও কর্তব্যপরায়ণতা, সেবার আদর্শ, ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে করা হাতের কাজ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, কুটীরশিল্প। গান্ধীজীর সঙ্গে এই মহানুভব ব্যক্তির সাদৃশ্য স্বীকার করতেই হয়। এই পূর্বগামী শিক্ষা নিয়ে যে ধরণের পরীক্ষা করেছিলেন তার সঙ্গে গান্ধীজীর নয়া তলিমের যথেষ্ট মিল আছে।

ফ্রোয়েবেলও ছিলেন এক ধর্মযাজকের ছেলে। গভীর গণিতচিন্তার সঙ্গে একটি মরমী বা আধ্যাত্মিক মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির মিলন হয়েছিল তাঁর প্রকৃতিতে। তিনিও ছিলেন প্রকৃতির অনুরাগী ; আর বনবিভাগের এক পদস্থ কর্মী হিসাবে কাজ করবার সময় প্রকৃতির খুব ঘনিষ্ঠ ও গভীর সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগও হয়েছিল তাঁর। তিনিই প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে আনলেন খেলা ও আনন্দময় অভিজ্ঞতার নীতি, শিশুর আন্তর পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাইলেন একটি সার্বিক মনের ক্রিয়া

সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা তার। স্কুলকে তিনি রূপান্তরিত করে তুলতে চাইলেন একটি সুন্দর ছোট বাগান, একটি কিণ্ডারগার্টেন, যেন তার উপর অবাধে ঝরে পড়তে পারে এই বিশ্বের সমস্ত মঙ্গলময়শক্তি ও প্রভাবগুলি। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই পূর্বগামীর মিল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

পাশ্চাত্য জগতের আধুনিকতম শিক্ষাগুরু জন ডিউই ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি বিশ্লেষণ ও কল্পনার নিপুণ ও ব্যাপক প্রয়োগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তাঁর সমসাময়িক চিন্তানায়কদের মধ্যে তাঁর স্থান অতি সহজেই ছিল সকলের উপরে। ডিমোক্রেসি ও শিক্ষা— যে শিক্ষার সাহায্য ছাড়া ডিউইর মতে ডিমোক্রেসির ভিত পাকা করবার অন্য কোনো উপায় নেই— এই দুটির উপরই ছিল তাঁর দৃঢ় আস্থা। প্রাণতাত্ত্বিক প্রকৃতিবাদের (biological naturalism) গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী তিনি— তাই বিবর্তন ও শিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই জীবন-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা একরকমের সংহত সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি যা নির্ভর করে মানুষের এই জীবন-অভিজ্ঞতা ও তার বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী চিন্তার ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। রুশোর আবদেনগুলির মধ্যে সযত্নে বাছাই করে যা-কিছু মূল্যবান বলে মনে হয়েছে ডিউই অবাধে তা গ্রহণ করেছেন। নিজে সমাজ-অভিজ্ঞতা ও শিশুর সমাজীকরণের সমর্থক হওয়ায় পেস্টালৎজির পদ্ধতি থেকে তিনি নিয়েছেন অন্তরঙ্গতা ও পারস্পরিক প্রীতির ঘরোয়া মনোরম পরিবেশ, শুভ চিন্তা ও অনুভূতি আর স্বাধীন ও সফল সম্বন্ধ-স্থাপনের উপর একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। ফ্রোয়েবেলের কাছে তিনি শিখেছেন খেলার রীতি (play-way) আর জগতের সমস্ত ব্যাপার ও ঘটনার প্রতি এক্স্পেরিমেণ্টসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। এইসমস্ত উপাদানগুলি অনন্যসাধারণ চিন্তাসংহতির আশ্চর্য কৃতিত্বে তিনি সমন্বিত করেছেন। দর্শনের প্রয়োগবাদী দলের (pragmatist school) একজন নেতা হিসাবে সেই ধরণের চিন্তাকেই ডিউই প্রাধান্য দিয়েছেন যা ব্যাবহারিক জগতে কোনো ফল দর্শাতে পারে। তাঁর দুই পূর্বগামী পেস্টালৎজির ও ফ্রোয়েবেলের মত ডিউইও নিজেই শিক্ষা সম্বন্ধে এক্স্পেরিমেণ্ট্ চালিয়েছেন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ল্যাবরেটরি স্কুলে— এইটে দেখবার জন্যে যে তাঁর ধারণা ও পরিকল্পনাগুলির সত্যই কোনো ব্যাবহারিক সার্থকতা আছে কিনা। কিন্তু অপরপক্ষে ডিউইর মধ্যে যার অভাব দেখা যায় এমন কতকগুলি গুণ অপর শিক্ষাগুরুদের ছিল। যথা : ফ্রোয়েবেলের মরমী তত্ত্বজ্ঞতা, পেস্টালৎজির ধর্মানুরাগও ও আত্মদান, কিম্বা রুশোর কবিসুলভ সংবেদনশীলতা ও বোধের সূক্ষ্মতা। কিংবা যদি বা মনের গভীরে এইসব ব্যাপারে কিছুটা প্রতিবেদনক্ষমতা তাঁর থেকেই থাকে, তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যে সেগুলিকে তিনি এত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত বেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন যে প্রকৃতিবাদসম্মত নীতি ও বৃত্তান্তগুলির থেকে তাদের আলাদা করে চিনে নেওয়াই শক্ত হয়ে পড়েছে। ডেমোক্রেটিক জীবনরীতি আর বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতিই হচ্ছে দু'টি প্রহরী যারা ডিউইর শিক্ষাজগৎকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আয়ত্তাধীন করে রেখেছে।

তাঁর নিজের একটি বিদ্যালয় খোলবার আগেই রুশোর মতবাদ ও ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় কিছুটা পরিচয় ছিল। আর তাঁর নবতর এক্স্পেরিমেণ্ট শিক্ষাসত্রের সূচনার আগে ডিউইর চিন্তাধারা ও এক্স্পেরিমেণ্ট পদ্ধতির বিষয়েও তিনি অনেক কথা জানতে

পেরেছিলেন। শ্রীএল্‌ম্‌হার্স্ট—যিনি শ্রীনিকেতন পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্রের কাজে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী বন্ধু ও সহকর্মী হিসাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন এবং শিক্ষাসত্র এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বহন করেছিলেন, তিনি—ছিলেন ডিউইর মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতর আবেদনও এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের মনে সাড়া জাগিয়েছিল।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে শিক্ষাগুরু হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাঁর ব্যক্তিগত পরিণতির অন্তর্গত একটি ব্যাপার, তাঁর আজন্ম জীবন ও অভিজ্ঞতাধারার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল কে জানে কেমন করে সেই পরিবার নিজের বাসস্থানটিকে করে তুলেছিল সব রকমের নূতন অভিসারী ভাব চিন্তা কাজের একটি নীড়, অসংখ্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অভিগতির (Movement) একটি কেন্দ্র বিশেষ। আর সেই পরিবারের বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি কেউ-না-কেউ মানুষের প্রায় প্রতিটি অভীপ্সা ও কীর্তির প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যথা: আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুরকমেরই, কাব্য ও শিল্পকলা, সংগীত ও নাটক, জাতিগঠন ও সমাজসংস্কার, এমনকি ব্যবসাবাণিজ্যও বাদ নয়। আর, রবীন্দ্রনাথের ছিল এমন সূক্ষ্ম ও বহুমুখী গ্রহণক্ষমতা, এমন অসীমিত শিক্ষানম্রতা (educability) যার তুলনা বোধ হয় মানুষের ইতিহাসে নেই, কিম্বা অতি অল্পই আছে। এই প্রসঙ্গে হয়তো কারো কারো মনে আসতে পারে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ও গ্যেঠের নাম। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর আত্মীয়দের বিচিত্রজীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যে ধারাগুলি রূপলাভ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তা সমস্তই একান্ত আগ্রহে গ্রহণ করে স্বাঙ্গীকৃত করেছিলেন।

এই অনতিপ্রকাশ্য কিন্তু অমোঘক্রিয়াশীল আত্মশিক্ষণের পালা—যা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে রূপায়িত ক'রে যথাযথ পথে চালিত করেছিল—তার ফলেই সাবেকি স্কুলে-পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে শুধু একটা যন্ত্রণাদায়ক সময়ের অপচয় বলে মনে হয়েছিল। পূর্ণ ও বিচিত্রতম শিক্ষা-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে তিনি শিক্ষারহস্য সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যেসব শিক্ষানীতি তিনি বিবৃত করেছেন ও তাঁর শান্তিনিকেতনের সাধনায় প্রয়োগ করেছেন তার সবই তিনি আত্মশিক্ষার দিনে স্বাধীনভাবে শুধু আবিষ্কারই করেন নি, নিজের জীবনে পোহন (experience) করেছেন। অনেক পরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগুরুদের রচনায় ও ক্রিয়াকলাপে তিনি তাঁর নিজের এইসব আবিষ্কারেরই সমর্থন পান।

সহজেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সহজাত গুণের বিচিত্রতা তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার যে সামর্থ্য দিয়েছিল তেমন আর কারো ভাগ্যে কখনো ঘটে নি। তাঁর মন ও বুদ্ধি ছিল সর্বদা সজাগ, উৎসাহে উদ্দীপিত, সহজবিজয়শীল, তা সে মনক্রিয়ার যে-কোনো ব্যাপার বা জ্ঞানবিজ্ঞানের যে-কোনো শাখাতেই তা ব্যবহার হোক-না-কেন। মানবিক বিষয়গুলিতে (humanities) যেমন বিজ্ঞানবিষয়গুলিতেও তাঁর ঠিক তেমনই অন্তরঙ্গ ও সহজ বিচরণক্ষমতা ছিল। ডিউইর জ্ঞানরুচির সীমা ছিল অতি বিস্তীর্ণ এ কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু উচ্চ কল্পনামূলক যে বিষয় ও শিল্পগুলির কোনো বিশেষ বোধ ডিউইর মধ্যে তেমন দেখা যায় না সেগুলি হচ্ছে এই: কাব্য, দর্শনের উচ্চতর ও

সূক্ষ্মতর স্তরগুলি, সংগীত ও চারুশিল্পকলার গভীরতর ও অন্তরতর দিকগুলি। রবীন্দ্রনাথ রুশো ও ফ্রোয়েবেলের মত গভীরভাবে প্রকৃতির অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাদের তিনি অতি সহজেই অতিক্রম করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তর্মিলনের গভীরতায়, শিক্ষায় এই মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতনতায়। এই উপলব্ধিই প্রত্যক্ষ মূর্ত হ'য়েছিল তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে।

রুশো সমাজকে সহ্য করতে পারেন নি। এ বিষয়ে রুশোর মত নয়, অপর তিনজন শিক্ষাগুরুর মত রবীন্দ্রনাথের চেতনা অতি সুপরিণত ছিল। তাঁর মন অবশ্য কল্পনা ও অধ্যাত্মদর্শনের উচ্চতম লোকে বিহার করতে পারত, কিন্তু তা হলেও একটি অন্তরঙ্গ মানবসমাজের মধ্যে ও তাদেরই জন্যে ছাড়া তাঁর পক্ষে জীবনধারণ ও কর্মসাধন অসম্ভব ছিল। 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'— তাঁর কাব্যজীবনের সূত্রপাতই হয় এই সুর দিয়ে, এ কথা বললে অন্যায় হয় না। এই ক্ষেত্রে তাঁর দান শুধু পেস্টালৎজিও ফ্রোয়েবেলের সমস্ত অবদানের সমানই নয়, তার পরিপূরক। ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনের আধ্যাত্মিক উপাদানটুকু, সেই খেলানাচ সৃজনমূলক কাজের প্রতীকী আবর্তনচক্র, শুধু কঠোর সাংসারিক জীবনের নোঙরমুক্ত রূপলোকের পরিবেশেই সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হতে পেরেছিল। শিশুদের সামনে অস্তিত্বের কতকগুলি সুন্দর ও সার্বিক দিক নিশ্চয় এই কার্যসূচি মুক্ত করে দিতে পেরেছিল, কিন্তু যে জগৎ শিশুরা উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তার পূর্ণ সত্যটিকে তা উন্মোচিত ক'রে দিতে পেরেছিল এমন কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক উপাদানের ক্রিয়া শুধু শৈশবকাল বা অভিজ্ঞতার কোনো বিশেষ পর্যায় বা স্তরের মধ্যে সীমিত করেন নি। যে অধ্যাত্ম-সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন— প্রধানত তাঁর মহর্ষি পিতার কাছ থেকে, এবং অন্যান্য উৎস থেকেও বটে, এবং যা তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সাহায্যে নিজের প্রয়োজনমত বিস্তৃত ও বিন্যস্ত করে নিয়েছিলেন, তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সকল বয়স ও স্তরের শিক্ষ-অভিজ্ঞতা ও চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগুরুরা যা আবিষ্কার ও পরীক্ষা করে দেখলেন তার প্রভাব পশ্চিমের দেশগুলিতে আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত শিক্ষাচিন্তা ও কর্মকে নিত্য প্রেরণার যোগান দিয়েছিল। আর ডিউইর শিক্ষাগত কর্মসূচি— যা ইয়োরোপীয় শিক্ষাগুরুদের দানের মধ্যে যা কিছু বিশিষ্ট ও স্থায়ী তার সমন্বয়ে রচিত হয়েছিল— তাকেই একসময় মনে হয়েছিল পৃথিবীর সর্বরোগনিবারক। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রাথমিক সাফল্যে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণ হয় নি। এক তো এই দুরূহ নূতন ক্রিয়াভঙ্গির পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ যারা একে নিয়েছিল তাদের পক্ষেও সহজ ছিল না, তা ছাড়া সুশাসিত পরিবেশে অল্পসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে যে প্রক্রিয়া ও উপায়গুলি সফল হয়েছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় স্বভাবতই তাদের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছিল।

কিন্তু এ ছাড়া অন্য কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। এই শিক্ষাসূচির আপাতপূর্ণতা সত্ত্বেও হয়তো এর মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর অভাব বা অপূর্ণতা ছিল। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ও মানবপ্রকৃতির যেসব সত্যের উপরে এর ভিত্তি তা হয়তো শেষ কথা নয়। তারও পিছনে হয়তো গভীরতর নিত্যতর সত্য আত্মগোপন করেছিল। লোকব্যবহার ও সংস্কৃতিসচেতনতার একটি স্বাভাবিক মানরক্ষার জন্য ডিউই নির্ভর করেছিলেন তাঁরই প্রস্তাবিত একটি ব্যবস্থার উপরে: সে হচ্ছে

গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত শিক্ষাসমাজের মধ্যে বিভিন্ন দলগুলির অবাধ ও অন্তরঙ্গ মেশামেশি ও তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ করে দেওয়া। ডিউইর আশা ছিল এই: যদি মানুষের বিভিন্ন স্তর, সম্প্রদায়, স্বার্থানুসারী দল ও মতবাদের মধ্যকার প্রাচীরগুলিকে দূর করে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও বন্ধুতার আবহাওয়ায় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অবাধ প্রবহণকে অব্যাহত রাখা যায়, তা হলে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নিত্য নূতন হয়ে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মনের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে সমাজকে স্বনির্ভর করে তুলবে, আর সর্বরকমের অবস্থার সম্মুখীন হতে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে তাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু উনিশ শতক শেষ হবার আগেই ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় ডিউইর আশা অলীক প্রতিপন্ন হল— পরে যা ঘটল তার তো কথাই নেই। দেখা গেল সঙ্কটমুহূর্তে কি ব্যক্তির কি সমষ্টির ব্যবহার বর্বর, এমনকি অমানুষিক স্তরে নেমে যেতে চায়, ভাব ও চিন্তার স্বাধীন আদান-প্রদানের সুযোগ সমাজ-প্রতিক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ দিকগুলি সকলের কাছে সুলভ করে দেওয়া দূরে থাকুক বরং অসহায় সমাজকে নিক্ষেপ করে অভিসন্ধিপ্রবণ দল বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বা শক্তিগোষ্ঠীর হাতে, তাদের নিষ্করুণ প্রচারযন্ত্রের কবলে। ইতিহাসযাত্রা জনসমাজ ও জাতিগুলিকে এমন কতকগুলি সঙ্কটের সম্মুখীন করে দিল যাতে তারা বাধ্য হল ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে আরো দোষসম্ভাবনামুক্ত স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য নীতি বা তত্ত্বের সন্ধান করতে।

প্রাণতাত্ত্বিক প্রকৃতিবাদ (biological naturalism) যে সাধারণ প্রয়োজন, তাগিদ ও প্রেষণাগুলিকে স্বীকার করেন তাই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা গেল না, সযত্নমার্জিত গণতান্ত্রিক যন্ত্রে যে সামাজিক শক্তি ও ক্রিয়াকৌশলের উৎপাদন ও রক্ষণ সম্ভব হতে পারে তাও নয়। পুরানো আদর্শবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা যেসমস্ত তত্ত্ব ও শক্তির কথা বিশ্বাস ও প্রচার করতেন— তাতে তাঁদের বুদ্ধিমত্তা বা নির্বুদ্ধিতা যাই প্রকাশ পেয়ে থাক্— তারই মত কোনো কিছু নতুন করে আবিষ্কার করার মধ্যেই আছে একমাত্র নিষ্কৃতির উপায় এই কথা আপনা থেকেই লোকের মনে হল। প্রাণতত্ত্ব ও গণতন্ত্রের উপর ডিউই যে জোর দিয়েছেন তার ফলে তাঁর পরিকল্পনা থেকে এইসব উপাদান আপনি বাদ পড়ে গেছে। জগৎ কিন্তু এখন এমন-এক শিক্ষাগুরুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রইল যিনি পূর্বতন শিক্ষাগুরুদের দান স্বীকার করেও আরো গভীরক্রিয়াশীল চিরন্তন কতকগুলি তত্ত্বকেও স্থান করে দিতে পারবেন, যিনি প্রাচীন জ্ঞানের সম্পদ্ নূতন করে জেনে বর্তমান দিনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত করতে পারবেন, যিনি এইসব সত্যের শুধু বুদ্ধিগত ব্যাখ্যাই করবেন না— নিজের উপলব্ধির সাহায্যে স্বাধীনভাবে তাদের মর্ম উদ্ঘাটন করবেন, যিনি শুধু এই তত্ত্বগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হবেন না— মানুষের জীবনে কেমন করে সেগুলি কাজ করে তা দেখিয়ে দিতে পারবেন। লোকচিত্তের এই দাবির উত্তর এল পশ্চিম থেকে নয়, পূর্বদেশ থেকে। ভারতবর্ষ থেকে। ঐসব প্রত্যাশা পূরণ করবার জন্যে প্রেরিত হয়েই যেন বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন দৃশ্যমঞ্চে কবি-গুরুদেবের ভূমিকায়।

আরো একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিল এ কথা বলা দরকার। সে হল তাঁর ভারতীয়ত্ব —শুধু ঐ বাহ্য ব্যাপারটাই নয়, ভারতীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম তার সঙ্গে একাত্ম

হবার ক্ষমতার দ্বারা যে ভারতীয়ত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন তারই কথা বলা হচ্ছে। বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাব ও আদর্শকে সংশ্লেষিত করা— শুধু বুদ্ধিপ্রয়োগ বা ভাবমণ্ডল (system) বা রচনার কৌশলে নয়, সমস্ত উপাদানগুলিকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার পাত্রে গলিয়ে— ভারতের অনেক অনন্য চারিত্রিক বিশেষত্বের মধ্যে এই হল একটি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা উপলক্ষে এ কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার বলেই রবীন্দ্রনাথ ডিউইর অত্যাশ্চর্য সংশ্লেষণী প্রতিভাকে অতিক্রম করে তাঁর কীর্তির যেটুকু অপূর্ণতা ছিল তা পূরণ করতে পেরেছেন।

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, পূর্ণ মানবতার শিক্ষা, integral education, education of the whole man— এই দাবি প্রায় এক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্রতীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের 'পূর্ণ মানবে'র ধারণা ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ reason বা বুদ্ধি-যুক্তিবাদকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে গিয়ে তাঁরা উপেক্ষা করেছিলেন অনেককিছু মূল্যবান্ উপাদানকে, যথা : গ্রীকদের কাম্য চারিত্রিক গুণ-গুলি (virtues), রোম্যানদের প্রশংসিত মানবিক অভীপ্সা ও সাংস্কৃতিক কীর্তির আদর্শ, রিনায়সাঁস্ ইয়োরোপে বা ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের মনোহর স্বপ্নাভিযান ও আদর্শপ্রয়াণগুলি, কিম্বা প্রাচীন বা মধ্যযুগের চার্চের অভীষ্ট অধ্যাত্মসম্পদ্। এইসব উপাদানে— এমনকি যেখানে সেগুলি অমার্জিত, প্রমাদ ও কুসংস্কার -মিশ্রিত ও তার দ্বারা কঠিন আচ্ছন্ন সেখানেও— মানুষের প্রকৃতির কতকগুলি পরিণতির মূল প্রবেগ যে লুকানো আছে এটা তাঁদের কাছে ধরা পড়ে নি। এইসব উপেক্ষিত উপাদানকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে তাদের অস্পষ্টতা ও অশুদ্ধি -ক্ষালন করলেন ও তাদেরই অনাবৃত রশ্মিতে মানবপ্রকৃতির সমস্ত দিকগুলিকে উদ্ভাসিত করলেন। তার ফলে তিনি দেখাতে পারলেন কেমন করে সমগ্রের কাঠামোর মধ্যে সবরকমের অভিজ্ঞতাকেই যথাযথ স্থানে স্থাপিত করা যায়। কেমন করে সাধারণ মানুষের প্রকৃতির দাবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় উচ্চতর প্রকৃতি বা পরা প্রকৃতির দাবি, reason বা বুদ্ধিবাদের প্রতিপত্তিকে কেমন করে, শুধু খাপ খাইয়ে নয়, পূর্ণায়ত করে নেওয়া যায় আত্মার চিরন্তন সত্যগুলির সঙ্গে।

ব্যক্তিত্বের কতকগুলি দিকের অর্থ ও ক্রিয়াশীলতার মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে বিস্তৃততর করেছেন যা তাঁর আগে আর কেউ করে নি। কল্পনা, নন্দনবোধ ও উচ্চতর হৃদয়াবেগগুলিকে তিনি ঐ বুদ্ধির প্রায় সমপর্যায়ে স্থাপন করেছেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধির মত কাব্য-সংগীত-শিল্পের ক্ষেত্রে এরাও জগৎসত্য আবিষ্কারের উপায়। আর যদি রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হয় যে মানুষের জীবনের আসল তাৎপর্য আর অভিপ্রায়ই হচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্বকে বার বার পুনর্জন্ম দিয়ে তাকে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিলীলার অংশীদার করে তোলা, তা হলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে সৃষ্টির সহায়তা করে যে গুণ ও ক্ষমতাগুলি তারা বুদ্ধির চেয়ে অন্ততঃ হেয় নয়। ডিউই ও হোয়াইট্ হেড্ বৈজ্ঞানিক কল্পনার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আর আধুনিক কালে হার্বার্ট রীডের মত চিন্তশীলরা আর্টেরও বিশেষ মূল্য আবিষ্কার করেছেন— যদিও তা অন্য কারণে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এই গুণ বা শক্তিগুলিকে তাঁর পরিকল্পনার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন তা শুধু অবচেতন ঝোঁক ও তাগিদগুলির মুক্তির আশাতেই নয়, সাধারণভাবে প্রকৃতির একটা নম্রতা ও সৌষ্ঠব সাধনের জন্যও নয়, এমনকি

কতকগুলি বিশিষ্ট সম্ভাবনা ও ক্ষমতার স্ফুরণের জন্যেও নয়। শিক্ষার সমস্ত পরিবেশটিই এইগুলির ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে এই তাঁর প্রত্যাশা।

এই নূতন কতকগুলি দিকের মূল্যায়ন ছাড়াও আরও একদিকে রবীন্দ্রনাথ ডিউইর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছেন। বুদ্ধিকেও তিনি বাধাহীন বিচরণভূমি দিয়েছেন যা প্রয়োগবাদ (pragmatism) ও সমাজহিতকর চিন্তনের সমর্থক ডিউই দিতে রাজী ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বরং শুদ্ধবুদ্ধি ও তার উচ্চবিহার-অধিকারের বিখ্যাত সমর্থক কার্ডিন্যাল নিউম্যানের সঙ্গী।

যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বের অর্থকে বিস্তৃততর করেছেন, সমস্ত চিন্তাপ্রমাদ কুসংস্কার ও ভুলমাত্রার আরোপ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশগুলিকে সৌষম্যে মিলিত করেছেন তা একটা অলৌকিক কীর্তির মতই আশ্চর্য। এ যে তিনি পেরেছিলেন তার কারণ শিক্ষাগুরু হতে গিয়ে তিনি তাঁর ঋষিকবির ভূমিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। এই দুই ভূমিকাই তাঁর মধ্যে এক হয়ে গেছে। এরই ফলে তিনি পশ্চিমের যুক্তিবাদী চিন্তার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি খণ্ডন করতে পেরেছেন, যুক্তির অতীত তত্ত্বকে সংগতভাবেই তার যোগ্যস্থান দিতে পেরেছেন।

একটি আপত্তি হল এই যে আত্মা বা অন্তরপুরুষ যদি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তাই হয়, যাকে অনাবৃত করা ছাড়া শিক্ষার আর কোনো কাজ নেই, তা হলে শিক্ষা তার অর্থগৌরব ও নিজস্ব অধিকার অনেক পরিমাণেই হারাতে বাধ্য। কারণ ঐ একই কাজ আরো সোজাসুজি ও অবিক্ষিপ্তভাবে করতে পারার গর্ব করে যে সাবেকী ধর্মীয় চর্যাগুলি তাদেরই হাতে তা হলে শিক্ষার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দেওয়াই হবে সংগত কাজ। তা ছাড়া আপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনশীলতার ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত আধুনিক মনের কাছে যে-কোনো রকমের নিরপেক্ষ পরমতা, অপরিবর্তন অবিচিত্র যে-কোনো অস্তিত্বসত্যের ভাবনা অরুচিকর ও গ্রহণের অযোগ্য মনে হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই যে আত্মা পূর্ণ হলেও পরিবর্তনহীন অবিচল নয়। বরং চির-ক্ষর ও আত্মসৃষ্টিপরায়ণ। তার সমগ্রতার মধ্যে একটা আয়তন আছে যেখানে তা অপরসকল আত্মা, সার্বিক আত্মা বা পুরুষের সঙ্গে একেবারে একীভূত। কিন্তু তা হলেও প্রত্যেকটি ব্যক্তির আর-এক আয়তন আছে যেখানে সে অনন্য ও বিশিষ্ট ও নিজস্ব একটা বিবর্তন বা আত্মসৃষ্টির পথ ধরে এগিয়ে চলে। সার্বিকপুরুষ এই অসংখ্য ব্যক্তিক অভিগতির পোষক এবং এইগুলিকে নিজের সত্তার মধ্যে ধারণ করে রূপ ও ভাবকল্পের অনন্ত বিচিত্র পরম্পরার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিবর্তিত করে চলেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিবর্তন ও আপেক্ষিকতার সমর্থকদের সমস্ত আপত্তিই আপনিই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এই মত অনুসারে শিক্ষা একটি দ্বিমুখী ক্রিয়া—তা আবরণমোচনও (unfoldment) বটে আবার আত্মলাভ (self-realisation) বা আত্মসৃষ্টিও বটে।

দ্বিতীয় আপত্তি হল এই যে, একই সার্বিক তত্ত্ব কেমন করে বিচিত্রের জন্ম দিতে পারে, একই সার্বিকপুরুষ কেমন করে বহুর মধ্যে বহুরূপ ধারণ করতে পারে? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত নয়। এমনকি পাশ্চাত্ত্য চিন্তকদের কাছেও বুদ্ধিকে একটি সার্বিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতিদান শক্ত বলে মনে হয় না। যদিও এই universal reason-এর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তবু তার প্রকৃতি ও ক্রিয়া তার সমর্থকদের কাছে অবাস্তব অনিশ্চিত বা অবোধ্য বলে মনে হয়

না। কিন্তু এই একই শক্তি নানা ধরণের মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রকাশ ও ক্রিয়ার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু যুক্তিপ্রয়োগ ও তর্কের সমস্ত বিসম্বাদী প্রক্রিয়া, এই শক্তির নানা রকমের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার, অবান্তর আবেগ-অনুরাগের কাছে এর অবনমন ইত্যাদি সত্ত্বেও যারা একে জানে তাদের পক্ষে এই reason-এর শুদ্ধাবস্থায় এর অব্যর্থ কার্যকারিতায় বিশ্বাস অক্ষত রাখা অসম্ভব নয়। আর সার্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা খাটে, সার্বিক মানস এমনকি পূর্ণায়ত সার্বিক পুরুষ সম্বন্ধেই বা তা খাটবে না কেন? এই দর্শনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *The Religion of Man* গ্রন্থে সযত্নে ও সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছেন।

গণতান্ত্রিক দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের একটা অসুবিধা হল এই যে, তা দৃশ্যপট থেকে সমস্ত বাইরের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে দেয় এবং ছাত্রদের নিজেদের খেয়ালখুশি ঝোঁক, বা তার চেয়েও অবাঞ্ছিত দলগত ঝোঁক বা মেজাজ— যা ডিউই শিক্ষাপরিস্থিতির একটি আবশ্যিক উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন—তারই হাতে ছেড়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ছাত্রের স্বাধীনতায় ঐ একই পরিমাণ বা আরো বেশি আস্থা রেখেও গুরুর জন্যেও একটি স্থান রেখেছেন। এই গুরু শিষ্যকে শেখান কেমন করে নিজেকে, নিজের অন্তরপুরুষকে জানতে হয় এবং সেই জ্ঞানকে সহায় করে কেমন করে চিরন্তন স্বাধীনতা লাভ করা যায় আত্মসত্য নিয়ে পরীক্ষা করবার।

আর এই বিশেষ ভাবস্থিতির ফলে আরো একটি বিরোধের সমাধান হয়েছে। সে হল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্বন্ধগ্রন্থনসমস্যা। ব্যক্তি সমাজের দাবিতে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের নির্বাচিত যে-কোনো দিকে ক্ষমতা অনুযায়ী নিজেকে গঠিত করে তুলতে পারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, যদি-না অবশ্য সে নিজের ভিতরকার সত্য থেকে স্খলিত হয় বা তাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে। ব্যক্তি ও সমষ্টির পিছনে শেষ পর্যন্ত একই সত্য থাকায় এর একটির সেবা অপরটিরও আনুকূল্য করতে বাধ্য অন্ততপক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে প্রভাবিত করে, আর শীঘ্রই হোক বা কিছু পরেই হোক প্রত্যক্ষ একটা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ না হয়ে উপায় নেই। এমন সময় আসবেই যখন অন্তরপুরুষকে অনুসরণ করতে করতে ব্যক্তি সম্মুখীন হবে সার্বিকপুরুষের এবং আবিষ্কার করবে যে ও দুই-ই এক। তখন আর সমাজের কাজ করবার জন্যে তার গণতান্ত্রিক সদিচ্ছা ও মৈত্রীর সাধনা করতে হবে না। তখন নিজের জন্যে বাঁচা আর সমাজের জন্যে বাঁচা তার কাছে হবে এক অদ্বিতীয় অন্তহীন রোমাঞ্চকর এক্‌স্‌পেরিমেন্ট্‌। সে জানবে আত্মদান ও আত্ম-আবিষ্কার একই বৃত্তান্তের দুদিকের দুটি মুখ। দেখবে, একই সত্তাকে সম্বোধন করে বলা যায়: 'অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তরবাসিনী' আর 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে তুমি বিচিত্ররূপিণী'।

এই হল সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবাণী। 'সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ অন্তঃসত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নয়'—এই পাশ্চাত্যমানসসুলভ আপত্তির উত্তর দেবেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সত্যকার গুরুর নেতৃত্বে ঐ আবিষ্কার শুধু কয়েকজনের পক্ষে সম্ভবই নয়, অধিকাংশ শিষ্যের পক্ষেই সহজ ও অবশ্যম্ভাবী। রুশো প্রকৃতি বলতে যা বুঝেছেন তার চেয়ে গভীরতর অর্থে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলদের সহজিয়া সাধনার আপ্তবাক্য উল্লেখ করে দেখাবেন যে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে সোজা কাজ হচ্ছে নিজেরই চিরন্তন প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাই হয়ে ওঠা। এর

জন্যে একমাত্র কৌশল যা দরকার তা হচ্ছে, যা কৃত্রিম অবান্তর, যা অপ্রয়োজনীয় ও গৌণ অথচ যা সত্যবস্তুকে গোপন করে, কঠিন আচ্ছাদনে ঢাকা দিয়ে দেয়, তাকে বর্জন করতে পারা।

রবীন্দ্রনাথ নিজে শান্তিনিকতনকে নাম দিয়েছিলেন; 'একটি প্রত্যক্ষ কবিতা,' 'একটি নৌকা যা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বহন করছে।' সন্দেহ নেই কবি ও লেখক হিসাবে তাঁর অনন্ত কীর্তি যুগের পরে যুগ আরো বেশি করে স্বীকৃত হবে। কিন্তু তাঁর নিজের সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় যে তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান যে তিনটি ক্ষেত্র, যথা: আত্মজীবন রূপায়ণ, সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা, আর তৃতীয়ত: শান্তিনিকেতন-সাধনার মধ্য দিয়ে লোকজীবনকে প্রভাবিত করা— তার মধ্যে তাঁর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশই সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয়টিকেই। অপর দুই ক্ষেত্রে যা তাঁর প্রাপ্তি তা তিনি অসংকোচে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ঐ শিক্ষাভিসারের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে। শান্তিনিকেতনে যাঁরা একবারমাত্র এসেছেন, তাঁদের প্রাথমিক রবীন্দ্রপ্রীতির কারণ সম্পূর্ণ আলাদা হলেও, পরে তাঁদের সকলেরই মুখে ঐ নাম উচ্চারণের সময় 'রবীন্দ্রনাথ' যেন অজান্তেই 'গুরুদেবে' রূপান্তরিত হয়েছে। এটাই হয়তো একটা পূর্বলক্ষণ যার থেকে বোঝা যেতে পারে যে এমন একদিন অনতিদূর ভবিষ্যতে আসবে যখন শুধু কবি হিসাবে নয়, সমস্ত জগৎ তাঁকে জানবে ও তার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করবে 'কবি-গুরুদেব' হিসাবে।

'ছিন্নপত্র' ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সঙ্কেতে।[১]

—রবীন্দ্রনাথ

১

'ছিন্নপত্রে' সংগৃহীত পত্রখণ্ডগুলির রচনাকাল ৩০ অক্টোবর ১৮৮৫ হইতে ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক চব্বিশ বৎসর হইতে কিঞ্চিদধিক চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে। কবির যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যৌবনমধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত খণ্ডজীবনের যে আলেখ্য এই পত্রাংশগুলিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা নানা দিক্ দিয়া বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে কবি তাঁহার তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"'বহুদিন চিঠিপত্র লিখি নি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে, কেবল বয়স বাড়ছে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম, এইবার সাতাশে পড়েছি— এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ছে; আর কোনো ঘটনা তো দেখছি নে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ, অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই? এখনো মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে— কই, তত্ত্বজ্ঞান কই? লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই? এতদিন আশায় আশায় ছিলুম। তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত। কিন্তু তাই ব'লে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই— চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানিসংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হতে পারে এবার তার একটা হিসেব চাই।' আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু! যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে।··হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই-সকল কথার উদয় হল। আসল কথা— যতদিন আপনি কোনো লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিয়ে তার প্রতি এক প্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না— তার যে কী হবে, কী হতে পারে

১ পুত্র রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে কবির আশীর্বাণী হইতে উদ্ধৃত।

কিছুই বলা যায় না; তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে তার চার দিক থেকে কতকগুলো লোক ঝরে যায়, কতকগুলো লোক স্থায়ী হয়— এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না। নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।"[২]

কবির এই উক্তি লঘু পরিহাসচ্ছলে করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে সবটাই যে পরিহাস নহে, কতকাংশে সত্যতাও যে আছে তাহা কবিজীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলির সহিত যাঁহারই পরিচয় আছে তিনিই স্বীকার করিবেন। 'ছিন্নপত্রে'র পর্ব কবিজীবনের এক প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতির পর্ব, লোকলোচনের অন্তরালে নির্জনবাসের মধ্যে নিরন্তর সাধনার পর্ব; স্নিগ্ধ প্রসন্ন পল্লীপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কবির অন্তঃপ্রকৃতি তখন আত্মসমাহিত ও প্রশান্ত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্যসৃষ্টিতে যেসকল চিন্তা ও ভাবনা পুষ্পিত পল্লবিত ও ফলিত হইয়া উঠিয়াছে, 'ছিন্নপত্রে' তাহাদেরই বীজাকারে প্রথম নিঃসংশয় আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। "সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না।" এক দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আর-একদিক দিয়া ইহার সত্যতাও তুল্যরূপে অবিসংবাদিত। কেননা, প্রাক্-'ছিন্নপত্র' পর্বের সাহিত্যকৃতি যেমন কবির পরবর্তী দীর্ঘজীবনের বিচিত্র সৃষ্টির রূপকল্প ও শিল্পসৌন্দর্যের অজস্র বৈভবের নেত্রপ্রতিঘাতী ঔজ্জ্বল্যের নিকট হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে, তেমনই ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'ছিন্নপত্রে'র খণ্ডিত পত্রাংশগুলিতে কবির অন্তর্জীবনের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার পরবর্তী সর্ববিধ শিল্পকর্মের ও অভীপ্সার সারসংগ্রহ। কবিমানসের সেই অভীপ্সাই নানা আকারে, নানা অবস্থায় বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু কবির সেই মানস-আকৃতি পরবর্তী কোনও বিরোধী আদর্শের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে কি-না সন্দেহ। বরং 'ছিন্নপত্রে' কবির মানস-ভূমণ্ডলের যে নীহারিকাচ্ছন্ন অস্পষ্ট আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে, তাঁহার উত্তর-জীবনের সাহিত্য ও শিল্প-কর্মে তাহারই উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় প্রকাশ সংঘটিত হইয়াছে— দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে কবিজীবনের একটি অনবদ্য testament বলিয়া নির্দেশ করিলেও নিতান্ত ভুল করা হইবে না।

২

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই নগরের কলকোলাহল হইতে দূরে নির্জন প্রকৃতির প্রশস্ত উৎসঙ্গের স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাই যখনই তিনি কলিকাতার নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও

২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮। রচনাকাল ২৭ জুলাই ১৮৮৭। তুলনীয়: "··চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটুকু বছর বৃথা নষ্ট করলুম—" ··ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪২ [৭ই আশ্বিন ১৩২৮]। অপিচ—"ভানুসিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।"— ঐ, পাদটীকা।

সংকীর্ণতার দ্বারা পীড়িত বোধ করিতেন তখনই পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গলাভের জন্য শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর অথবা বোলপুরের দিকে রওনা হইতেন। নাগরিক-জীবনের চঞ্চল পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহের সহিত মফস্বলের স্থির-মন্থর কালস্রোতের তুলনা করিয়া তিনি একটি পত্রে লিখিতেছেন—

"সবে দিন-চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে, আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব।

"আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি; আর, সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে; কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা-অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়; কোনো কোনো ক্ষণিক সুখদুঃখ মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করছি। সেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘ কাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত।"[৩]

পল্লীর এই নিস্তব্ধ রহস্যনিকেতনে কবির চিত্ত নিরন্তর প্রকৃতির অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকিত।—

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্‌টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন— আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ— এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক্‌। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।"[৪]

কবি তাঁহার বোটের উপর শুইয়া রহস্যময়ী রজনীর নীরব বার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেন— প্রকৃতির অনন্ত শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। কেন যে কখনও কখনও অকারণে তাঁহার চোখ অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিত তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।—

"আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব।· ·একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে।· ·মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্‌ ছল্‌ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্‌ ঝিক্‌ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন

---

৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৪ (শিলাইদহ, ২৪ জুন ১৮৯৪)।

৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০ (শিলাইদহ ১৮৮৮)।

পারাবত

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
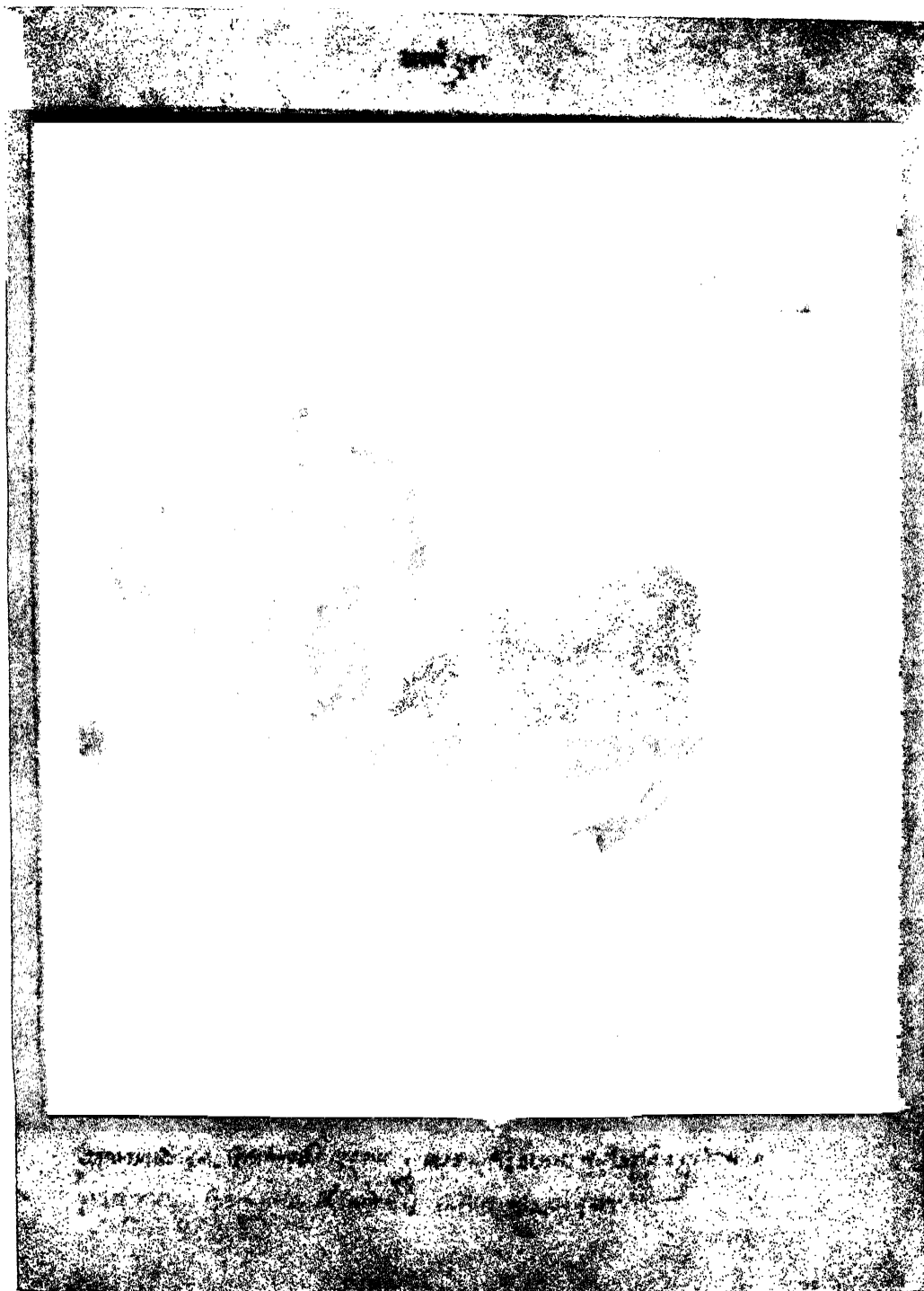
আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে। এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্য প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।"[৫]

এই নির্জন রহস্যময়ী প্রকৃতির নিবিড় স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে মানবসমাজের কোলাহল ও কর্মতৎপরতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি আপনার অন্তরের অলক্ষ্য অন্তঃপুরের মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইতেন। মানুষের— তা সে যতই অন্তরঙ্গ ও আত্মীয় হউক-না কেন, সঙ্গ তখন তাঁহার নিকট অসহনীয় বোধ হইত—

"আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের কারখানাঘরের মতো; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে— কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না— কখন্ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্য অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন। · ·অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক কিন্তু নির্জন জীবনের পক্ষে আঘাতজনক। কেননা, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে; সুতরাং সেই সময়ে মানুষ বড়ো বেশি নিজেরই মতো অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়-- সে অবস্থায় সে লোকসংঘের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যপ্রকৃতির একটা গুণ এই যে, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে মানুষের মনকে সে আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়; সে নিয়ত সঙ্গদান করে, তবু সঙ্গ আদায় করে না।· ·"[৬]

এইভাবে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির রূপসুধা কবি আকণ্ঠ পান করিতেন, তাহার অন্তরের গোপন বাণীটি কান পাতিয়া শুনিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু শুধুই নিস্তব্ধ ধ্যান নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিচিত্র বিভাগের সহিত আপনাকে নিরন্তর যুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য কবির কী ব্যগ্রতা।

৩

১৮৯৩ সালে লিখিত একটি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা-কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা

---

৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ২৬ (সাজাদপুর ২২ জুন ১৮৯১)।

৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৭ (শিলাইদহ, ৩০ জুন ১৮৯৪)। তুলনীয়: পত্রসংখ্যা ১১২ (শিলাইদহ ৮ অগস্ট্, ১৮৯৪)।— "একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাক্‌লেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি, থেকে থেকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়, আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্ছে।· ·"অপিচ, তু° ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৩২ (শিলাইদহ ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪)।

আছে তারপ্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ— তূলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।"[৭]

'ছিন্নপত্র'-পর্বে কবি কত বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলনে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন, তাহার মোটামুটি একটা রেখাচিত্র আমরা পত্রাংশগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া খাড়া করিয়া তুলিতে পারি। তাঁহার বাল্যাবস্থায় বয়োজ্যেষ্ঠগণের তত্ত্বাবধানে যে নানাবিদ্যার আয়োজন হইয়াছিল তাহা তৎকালে যতই ভীতিপ্রদ ও অরুচিকর বলিয়া মনে হউক-না কেন, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধানলের উন্মেষসাধনে যে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। ১৮৯৩ সালে একটি পত্রে কবি লিখিতেছেন—

"এই বোটটি আমার পুরানো ড্রেসিং-গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।"[৮]

৪

'ছিন্নপত্রে'র পত্রাংশগুলিতে কবির বিদ্যানুশীলনের বিচিত্র আয়োজনের যে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ১৮৮৮ সালে শিলাইদহ হইতে লিখিত পত্রে কবি জানাইতেছেন—
"গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি— ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি— আমি একখানা কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম— Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subject-এর বই একটা বাতির আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম।"[৯]

রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থও কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটি হইতে জানা যাইবে—

"এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্‌স্ অফ পলিটিক্‌স্ এবং প্রব্‌লেম্‌স্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখনকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম, এবং যতরকম হিজিবিজি

---

৭ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৯২ (সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩)। তু° "আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেচি— কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেচে— সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।"— ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর নিকট কবির পত্র। দ্র° চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ৩৫ (শান্তিনিকেতন, ৭ মার্চ ১৯৩১)। অপিচ, দ্র° চিঠিপত্র ৫ পত্রসংখ্যা" ৪ পৃ. ৩১।

৮ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭৯ । শিলাইদহ, মে ১৮৯৩। তুলনীয়: "আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে।" — চিঠিপত্র, ৫, পত্র ১৪ (কলকাতা, ১৬ জুন, ১৮৯৪), প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র।

৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০।

হাঙ্গাম। বেশ শাদাসিধে, সহজ, সুন্দর, উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল, কোমল, সুগোল, করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে।· ·যাই হোক, এলিমেন্ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্‌স্‌ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়; একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।"[১০]

কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ ছিল কালিদাসের রচনাবলী— বিশেষ করিয়া মেঘদূত, এবং বৈষ্ণব পদাবলী। ১৮৯৩ মার্চ মাসে তিরন হইতে লেখা একটি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"· ·মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা একরকম ফুরোল, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে· ·বাসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুরফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনও সে ভাবের নয়—বাদলার পর বাদলা। এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখে-শুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কটকের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্রস্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়।· ·এইজন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়; তার সবগুলিই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়; কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।· ·যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত, ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।"[১১]

'মেঘদূত' কবিকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক মাত্রই জানেন। এইস্থলে 'ছিন্নপত্রে'র কয়েকটি পত্রাংশ সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্‌ধৃত হইল—

"কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো, তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না। জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয় বার আসবে না—ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে।· ·হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশজোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত সুখদুঃখ-বিরহমিলন-ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথমদিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি

---

১০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪৪ (শিলাইদহ, ৮ এপ্রিল ১৮৯২)।

১১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭৪। তুলনীয়—"বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি খুব করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে বই নিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।"— চিঠিপত্র. ৫, পত্র°৪ [প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র। রচনাকাল ১৮৯০ (?)]।

বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে— অবশেষে এক সময় আসবে যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে; ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। ."[১২]

পুরী হইতে লিখিত আর-একটি পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"কাঠজুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পাল্কিতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধূধূ করছে। ইংরেজিতে একে যে নদীর বিছানা বলে— বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো— নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন তার ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে, সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি। এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর একটি উপমা পাওয়া গেল।"[১৩]

আর-একস্থলে প্রকৃতির শোভা দেখিয়া কবির মনে শকুন্তলার একটি দৃশ্য উদিত হইতেছে—

"· ·এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপর সূর্যোদয় হয়। · ·দুইধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অপরিণত শাল গাছ, এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্য প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থিরভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে বলব? কালিদাসের শকুন্তলায় আছে দুষ্যন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে।"[১৪]

সাজাদপুর হইতে লিখিত একটি পত্রখণ্ডও কবির অসীম কালিদাস-প্রীতির নিদর্শন হিসাবে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না, 'আপনি

১২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫২ (শিলাইদহ বুধবার। ২ আষাঢ় ১২৯৯)।

১৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭১ (পুরী, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩)

১৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫ (বোয়ালিয়া, ১৮ নভেম্বর ১৮৯২)।

এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।' বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল।· ·

"পোস্টমাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা ব'সে গেছেন, এমন সময় শঙ্খ এবং তুরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ প'রে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে। তার পরে সুনন্দা এক-একজনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করেছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে এর অবশ্য-রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।"[১৫]

কালিদাসের কাব্য কবির চেতনার সহিত কিরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, উপরের উদ্ধৃতগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালিদাসের কাব্য পাঠ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কেবল মানস-বিলাস মাত্র ছিল না, উহা যে তাঁহার অন্তরের অদম্য রসপিপাসার পরিতৃপ্তিসাধনের অন্যতম প্রধান সহায় ছিল, তাহা 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত কবির একটি পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রটি যদিও পরবর্তীকালের রচনা, তবুও কবির মজ্জাগত কালিদাস-প্রীতির অপূর্ব সাক্ষ্য হিসাবে ইহা স্মরণীয় এবং 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত অংশগুলির সহিত একাত্মতা-সূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে জগদীশচন্দ্রের জয়সংবাদ পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া পত্রের অন্তিমছত্রে জানাইতেছেন—

"পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।"[১৬]

প্রবাসী প্রিয়তম বন্ধুর নিকট প্রীতির অর্ঘ্য স্বরূপ আশ্রমবৃক্ষ হইতে শিরীষ পুষ্প পত্র মধ্যে প্রেরণ করার কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কাহারও মনে উদিত হইত কি ? ইহাত' শুধু বুদ্ধি দিয়া কালিদাসকে ভালো লাগা নহে, সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালোবাসা, মহাকবির সুকুমার শিল্পকলাকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া![১৭]

'জীবনস্মৃতি' যাঁহারাই পড়িয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আবাল্য আকর্ষণের কথা অবগত আছেন। কবি নিজেই নানাস্থলে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব কবিতা— এই দুই'এর সংমিশ্রণে তাঁহার মানসিক আবহাওয়া রচিত হইয়াছে। 'ছিন্নপত্রে'র নানাস্থলে

১৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫৯ (সাজাদপুর, ২৯ জুন ১৮৯২)।

১৬ দ্র° চিঠিপত্র ৬, পত্র° ১৯ [এপ্রিল ১৯০২]।

১৭ তু° "বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে ; ভালো লাগা আর ভালো বাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটো পারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের তৃপ্তির দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।"— পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি : যাত্রী, পৃ. ১২৮–১২৯।

পদাবলী-সাহিত্যের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারা যায় কালিদাস-প্রীতির মতই কবির পদাবলী-প্রীতি ছিল সহজাত। শিলাইদহ হইতে লিখিত একখানি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া।"[১৮]

বোলপুর হইতে লিখিত আর একখানি পত্রে কবি বর্ষণমুখর গভীর নিশীথিনীতে বৈষ্ণব কবিগণ-কর্তৃক রাধিকার অভিসার-বর্ণনার যে সকৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য—

"বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। ·আমার আবার চোখে eye-glass ছিল; সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চষমা ধ'রে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে, পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চষমা এবং কোঁচা সামলাতুম না তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেকক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন; কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি, এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কিরকম হত সে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। বেশাবন্যাসেরই বা কি রকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি ক'রে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না। কেবল মানসচক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে, যমুনার তীরপথে, প্রেমের আকর্ষণে, ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন। পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় ব'লে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন; কিন্তু পাছে ভিজে যান ব'লে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান ব'লে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যক জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত!"[১৯]

আর-এক পত্রে দেখিতে পাই কবি বোটে করিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিয়া চলিতেছেন, বর্ষাপ্রকৃতির শ্যাম সমারোহ তিনি মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করিতেছেন, আর বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষাবর্ণনা তাঁহার মনে পড়িতেছে—

"আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে। খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘন নীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরুগুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা-বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়; এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[২০]

---

১৮ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা, ৪৪। (৮ এপ্রিল ১৮৯২)।

১৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা, ৪৮। বোলপুর। মঙ্গলবার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২।

২০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা, ১১৮। কুষ্টিয়ার পথে। ২৪ অগস্ট, ১৮৯৪।

বৈষ্ণব কবিতা কিভাবে তাঁহার কবিদৃষ্টিকে প্রভাবিত করিয়াছিল, কবির তরুণ বয়সের এই স্বীকারোক্তি তাহার এক নিঃসংশয় সাক্ষ্য।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত 'ছিন্নপত্র'-পর্বের অন্তর্ভুক্ত একখানি পত্র হইতে জানা যায় কবি কিরূপ অভিনিবেশ সহকারে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' পাঠ করিতেছিলেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সুপ্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী' সমালোচনা যে কবির পরোক্ষ-প্রত্যয়-সঞ্জাত নহে, বাণভট্টের গদ্যশিল্পের প্রকৃত রসাস্বাদনের জন্য যে কবি ছাত্রের ন্যায়ই এই দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি—

"হাঁ— গৃহ অর্থে 'কক্ষ' শব্দের ব্যবহার আমি কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই-একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে। কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েছে— আরো ততগুলো পাত বাকি আছে।"[২১]

ইহারই কিছু পরবর্তীকালে রচিত 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্ভুক্ত এক চিঠিতে কবি বলিতেছেন—

"'পশুপ্রীতি' বলে ব— একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে; আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।··কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব— কে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি।[২২] পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরই মতো, একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই, এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।"[২৩]

৫

এই যুগে কবি যে শুধু রস-সাহিত্যেই আপনাকে আকণ্ঠ নিমগ্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভের আগ্রহ তাঁহার কিছুমাত্র কম ছিল না। আমরা জানি উপনিষদের মন্ত্রপাঠ আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহর্ষি-পরিবারের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক উপাসনার অঙ্গ ছিল। কিন্তু উপনিষদের প্রতি কবিচিত্তের অনুরাগ শুধু মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই চরিতার্থতা লাভ করিত না। তিনি উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মননের দ্বারা উপলব্ধি করিবার জন্য সতত যত্নশীল ছিলেন। 'ছিন্নপত্র' -পর্বে উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অনুশীলন করিতেছিলেন তাহার পরিচয় আমরা পাই নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে—

"এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি। তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ ও তার অনুবাদ আছে। তার থেকে আমার অনেক সাহায্য হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্তমত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারই একেবারে গর্ডান-গ্রন্থি ছেদন ক'রে বসে আছেন— সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা ছেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম আর মনে হচ্ছে যেন

২১ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ১২ক সাহজাদপুর। ৮ শ্রাবণ [১৮৯১]

২২ দ্র° বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪২—৫০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৯)। উদ্ধৃত পত্রেই *Amiel's Jonrnal* এর যে অংশ কবি উল্লেখ করিয়াছেন, বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকারূপে তাহাও বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩০০)।

২৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০০। পতিসার, ২২ মার্চ, ১৮৯৪।

আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে এ কথা স্থান দিতে পারে। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসংগত আসলে তা নয়— বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধ জন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম— সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া ব'লেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি অতি ঈষ—ৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।"[২৪]

আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ যে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল ইহা আমরা তাঁহার 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলী হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। 'ছিন্নপত্রে'র উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটিতে তাহারই আভাস আমরা পাইতেছি।

বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য কবি কম অধ্যবসায়ের সহিত এই সময়ে অনুশীলন করেন নাই। ১৮৯৩ সালে তিরন হইতে লিখিত পূর্বোদ্‌ধৃত পত্রে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর'এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*[২৫] যে কবির সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে কিরূপ গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের নিকট অজ্ঞাত নয়। শুধুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু আহরণের অফুরন্ত ভাণ্ডার রূপে নহে, কবি মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাধনপ্রণালী ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পাইলেন এই গ্রন্থের মাধ্যমেই। হীনযান মতাবলম্বীর নির্বাণ-সাধনা যে কবির মনঃপূত ছিল না, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ও ভক্তিসাধনাই যে কবিকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্তীকালে রচিত কবির বহু প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি। 'ছিন্নপত্রে'র একটি পত্রেও এই হীনযান মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন কবি বলিতেছেন—

"কেননা সৃষ্টি কখনোই সম্পূর্ণ সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না— কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন— কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায় তা হলে, জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ

২৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১৭। শিলাইদহ ১৬ অগস্ট, ১৮৯৪।

২৫ প্রকাশকাল ১৮৮২।

অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে ; এই যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ সব'— তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে ; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।"[২৬]

পত্রাংশটুকুরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই দীর্ঘকাল ব্যবধানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীরই নিকট লিখিত কবির আর একখানি পত্রে। কবির বয়স তখন সপ্ততিবর্ষ। কবি বলিতেছেন

"হিসাব করে যদি দেখিস্ তো দেখতে পাবি বয়স হোলো প্রায় সত্তর, অর্থাৎ বৈতরণীর ধার ঘেঁষে চলেচি। কিন্তু বোধ হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি আছে, তাই যদিচ ঘাটে আসন পেতেছি তবু খেয়ায় এখনো জায়গা হোলো না। একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে সেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবার মাত্র প্রমাণ করতে পারে, সে হচ্চে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাইবা হোলো— কিছুদিন বেঁচেছি, অত্যন্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্চি আমি— অন্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি— অসীম জগতে এই পরমাশ্চর্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ো যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেচেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে— কিন্তু আমি বলি হওয়াটা যদি মিট্‌ল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়। রুগী বল্‌চে, কব্‌রেজ মশায়, জ্বর ছাড়াও— কবিরাজ নস্য নিয়ে বল্‌লেন দেহ ত্যাগ করলে জ্বরের উৎপাত একেবারে ঘুচবে। রুগীর বক্তব্য এই যে দেহটার জন্যেই জ্বরের অবসান কামনা করা, দেহটারই অবসান যদি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জ্বরটা না হয় রইল। আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি ? মৃত্যুতে ওটা শেষ হয় কি না হয় জানি নে, কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই যে সব সন্ন্যাসী ওটাকে কেবলই রগ্‌ড়ে মুছে ফেলবার চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার বনিবনাও হোলো না। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেচে, অতএব তাকে নিন্দে করব না।..."[২৭]

তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে 'ছিন্নপত্র'-পর্বে জগৎ ও জীবনসম্পর্কে বত্রিশ বৎসর বয়সে তরুণ কবির মনে যে ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, শঙ্করের মায়াবাদ এবং হীনযান বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব-সম্পর্কে কবিমানসে যে প্রতিক্রিয়ার উদয় হইয়াছিল, তাহা বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব দৃঢ়তা অর্জন করিয়াছে, কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

---

২৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮৮ শিলাইদহ, ৪ জুলাই ১৮৯৩।

২৭ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ৩৪। [New Haven, ২৫ অক্টোবর ১৯৩০].

৬

পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থরাজি কবির বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষানলের ইন্ধন জোগাইত। ১৯০০ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বিলাতপ্রবাসী বন্ধুবর জগদীশচন্দ্রের এক পত্রের উত্তরে কবি লিখিতেছেন—

"আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার 'প্রকৃতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন— সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"[২৮]

কবির এই উক্তি নিতান্তই বিনয়প্রসূত। ইতিহাস পুরাবৃত্ত এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বা archaeologyও তাঁহার ঔৎসুক্যের পরিধির বহির্ভূত তো ছিলই না; বস্তুতঃ এমন-সব প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কারের সহিত কবি পরিচিত ছিলেন যাহা আমাদের দেশের বহু ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক-প্রধানেরও জ্ঞানের অগোচর। এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি। 'শেষের কবিতা' কবির পরিণত-বয়সের রচনা। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত রায় তাহার বন্ধু শোভনলাল সম্পর্কে নায়িকা লাবণ্যের কাছে বলিতেছে—

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়— রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা? ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।· ·

"এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারতসরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার-পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে— কখনো কাশ্মীরে, কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্মপ্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।· ·"[২৯]

এই উক্তি যে দাম্ভিক অমিত রায়ের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, প্রৌঢ় কবির গভীর প্রত্নতত্ত্ব-প্রীতির প্রচ্ছন্ন সাক্ষ্য যে উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা হয়তো অনেকেরই মনে উদয় হইবে না। ফরাসি অধ্যাপক ফুশে (A. Foucher) ১৯০১ সালে *Bulletin d' École Francaise d'*

২৮ চিঠিপত্র ৬, পত্র ৮।

২৯ শেষের কবিতা § ১৩, 'আশঙ্কা'।

Extrême-Orient নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রাচীন ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম—*Géographie ancienne du Gandhâra :* Itinéraire de Hiuan-tsang en Afghanistan. পরবর্তী কালে তিনি এই বিষয় লইয়া আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে *La vieille route de Gandhâra à Taxilâ* নামক তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা-কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে ফরাসি পণ্ডিত ফুশে'র এই গবেষণাকে লক্ষ্য করিয়াই অমিত রায়ের মুখ দিয়া শোভনলাল-প্রশস্তি গাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মহর্ষির সাহচর্যে যে দেশভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই দেশ-ভ্রমণের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহারই পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য কবি চিরকাল ভ্রমণবৃত্তান্তের বই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সংকীর্ণ গৃহকোণে তাঁহার দেহ ও মন দুইই সমানভাবে পীড়িত হইত। 'ছিন্নপত্রে'র এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন—

"ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে— বেশ একটি ছবির মত দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত-পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি— বেশ অনেক-গুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাতকাটা বই। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতি সাধন করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে, কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম; সেই রকম বই লিখতে অসামান্য ক্ষমতার দরকার। . ."[৩০]

বোলপুর হইতে লিখিত আর-একটি পত্রে কবি জানাইতেছেন—

"কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বতভ্রমণের বই পড়েছি। এরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে। . .ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক কিম্বা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে চলতে থাকে, তার বড়ো একটা টান আছে— মাঠ তাতে আরও যেন ধূ ধূ ক'রে ওঠে, মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে চলে যেতে থাকে; তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ আকাশ আরও যেন বেশি ক'রে অনুভব করতে পারি।"[৩১]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'— ইহার মধ্যে 'ছিন্নপত্রে'র উদ্‌ধৃত পংক্তি-কয়টির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবানুষঙ্গ লক্ষণীয়।

---

৩০ ছিন্নপত্র. পত্রসংখ্যা ১৪২ (কলকাতা ৯ এপ্রিল ১৮৯৫)।

৩১ ছিন্নপত্র. পত্রসংখ্যা ১২৭ (বোলপুর। ১৯ অক্টোবর ১৮৯৪)।

জীবনীসাহিত্যও কবির কম প্রিয় ছিল না। ডাউডেন-রচিত ইংরেজ কবি শেলির সুপ্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ যে কবি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটুকু তাহার প্রমাণ—

"আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপর সবটা খুবই ছোটো; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বছর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটিমাত্র ভলুম জীবনচরিতের সৃষ্টি করেছেন; তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে বকুনি বিস্তর আছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছরে বোধ করি একখানা ভলুমও পোরে না। . ."[৩২]

শিলাইদহ-প্রবাসকালে কবির নিত্যসহচর ছিলেন আমিয়েল সাহেব—

"আমার একটি নিজনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টেপাল্টে দেখি; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এই বইএর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো। . . আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে; ব—র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।"[৩৩]

'ছিন্নপত্রে'র যুগেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত কবির এক পত্রে দেখি—

'Bashkirtscheff-এর Journal আমিও পড়ছি— মন্দ লাগ্‌চে না কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। . ."[৩৪]

৭

'ছিন্নপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ জর্মান ভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছিলেন, এবং বেশ কিছুটা যে অগ্রসরও হইয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা পাই। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে শিলাইদহ হইতে কবি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিতেছেন—

"জর্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এরকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌনবীর বক্তৃতা

৩২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৩৮ (শিলাইদহ ১৬ ফাল্গুন ১৮৯৫)। Edward Dowden রচিত *Life of Shelley* প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে।

৩৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০। (পতিসর, ২২ মার্চ ১৮৯৪)। দ্র° বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধ।

৩৪ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৫১ (১৭ মাঘ ১৮৯১)।

তু° "আর একটু বড় হলে আমরা গুরুজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকগুলি ইংরেজ লেখকের বই সমানে পড়ে উপভোগ করেছি। Marie Bashkirtscheff-এর জার্নাল আর এমিয়েলের জার্নাল বোধ হয় তার মধ্যে ছিল"—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী: রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ.৪৫। দ্র° "Bashkirtscheff Marie (1860-84), a Russian diarist, whose 'Journal', written in French and published posthumously in 1887, attained a great vogue by its morbid introspection and literary quality, and was translated into several languages (Eng. translation, 1890, by Mathilde Blind)."—*The Oxford Companion to English Literature*, 3rd Edn., 1946, p. 67.

নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান ভাষা বুঝে ওঠা কিরকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজে অনুমান করতে পারবে।· ·"[৩৫]

'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্ভুক্ত আর-একটি পত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে—

"Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাই।"[৩৬]

১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত *The Religion of an Artist* শীর্ষক সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জর্মান ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন—

"I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it may pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

"I also wanted to know German literature and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

"Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*. I believe I found my entrance to the place, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dusky to me."

ইহারই সঙ্গে ফরাসি ভাষা শিক্ষার জন্যও কবি তৎপর হইয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য জগদীশচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে আমরা পাই। পত্রখানি 'ছিন্নপত্র'-পর্বের কয়েক বৎসরের ব্যবধানে রচিত—

৩৫ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৩৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৫০ (কুষ্টিয়া, ৫ অক্টোবর ১৮৯৫)

"চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃতভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হয়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি।"[৩৭]

অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সুবিদিত; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য ও প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন স্বরূপ এই উন্নত ভাষাটির চর্চার প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ঐ বিষয়ে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা কঠিন। কেননা, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট লিখিত একাধিক পত্রে কবি ফরাসি ভাষায় আপনার দক্ষতার অভাব লইয়া অভিযোগ করিতেছেন, দেখা যায়। কয়েকটি পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন—বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই। · · বেলজিয়মে যে নূতন ইস্কুল হয়েছে তার খবর সবুজপত্র থেকে দাবী করচি। তুমি সম্প্রতি নানা লেখা, কিম্বা সম্ভবত না-লেখা, নিয়ে ব্যস্ত আছ—অতএব আমার পরামর্শ, বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত আশার কথা, জ্যোতিদাদা ওখানে আছেন। তিনি এটা পেলে হয়ত ফস্‌ করে এটাকে গৌড়ীয় ভাষায় ঢালাই করে নিতে পারেন। যাই হোক তোমাদের যে রকম মর্জি তাই কোরো কিন্তু আমার এটাতে গরজ আছে। এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Education Morale, Sociale et Artistique"—ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জমা নয়, কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবেনা?"[৩৮]

অপিচ—

"ফরাসী চিঠিগুলো আমাকে তর্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরো না।…"[৩৯]

কবির আগ্রহেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য অধ্যাপনার সূচনা হয়; এবং বেনোয়া (Benoit) নামক একজন ফরাসি অধ্যাপকের উপর অধ্যাপনার ভার অর্পিত হয়—ইহা আমরা জানি।[৪০]

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' হইতে কয়েকটি পংক্তি ফরাসি সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগের সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্ধারযোগ্য—

"বস্তুত তাঁর সাহচয ও সান্নিধ্যের ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। সুরেনের এক জন্মদিনে তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসী শিখতুম বলে একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্য কঁৎদ্‌লীল্‌, লা ফঁতেন প্রভৃতির

৩৭ চিঠিপত্র ৬, পত্র ৪ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০। শিলাইদহ)।

৩৮ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৯ (শান্তি বোলপুর, ২৩ অক্টোবর, ১৯১৭). পৃ. ২২৪-২২৬।

৩৯ চিঠিপত্র ৫ পত্র ৮৩[ক]—তারিখ নাই। অপিচ তু° "সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্বগামীরূপে বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে। ইতি ভাদ্র তারিখ জানি নে, ১৩৩৫।"—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর নিকট লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° চিঠিপত্র ৫।

৪০ দ্র° চিঠিপত্র ৫।

রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। এখনো সেই বইগুলি শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে।"

রবীন্দ্রনাথের জর্মান ও ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয়তো ততখানি গভীর ছিল না; কিন্তু এক দিক দিয়া তাঁহার এই উদ্যম যে ব্যর্থ হয় নাই তাহা কিছুটা বুঝিতে পারি বাংলা ভাষাতত্ত্ব লইয়া তাঁহার রচিত অগণিত প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। বিভিন্ন ভাষার গঠন ও প্রকৃতি, ধ্বনিতত্ত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের যে ক্লেশ তিনি যৌবনকালে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছিল বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনার কালে।

৮

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট এক চিঠিতে লিখিতেছেন—

"··আমার বিষয়ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করি নি। এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরামকেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কিন্তু বুঝে নিয়েছি সে আমার কপালে নেই। টাকার যা সংগতি হয়েছিল তাতে কিছুই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু আমার প্রকৃতির মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন বসে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বল্‌তে হয় Thy need is greater than mine.··"[৪১]

রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একই আধারে কত বিচিত্র উপাদানের যে সমাবেশ হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি কবি। তবুও কবিত্বশক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু পাণ্ডিত্যের কথা ধরিলেই আধুনিক কালে তাঁহার ন্যায় বহুজ্ঞ বা ব্যুৎপন্ন পুরুষ আমাদের দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। এই নিছক মনীষা বা পাণ্ডিত্যের প্রভা তাঁহার কবিশক্তির ভাস্বর জ্যোতিশ্ছটায় ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের হৃদয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ মননশীলতা বা জ্ঞানার্জন-স্পৃহার প্রতি যে আজন্ম সহজাত আকর্ষণ ছিল, এবং সাহিত্যসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যে তিনি সেই জ্ঞানযোগীর নির্লিপ্ত উদাসীন মূর্তির দিকে সস্পৃহ লুব্ধ নেত্রে তাকাইতেন—আপনার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে যাহার আভাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পত্রধারার নানাস্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হইতে পারিত, অথচ হয় নাই—তাদের জন্য কবির অনুশোচনা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও নিরলস জ্ঞানসাধনার যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিবার আমরা চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কবিমানসের ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ইতিহাসের যথাযথ আলোচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। গ্রন্থকীট পণ্ডিত অনেকেই আছেন। কিন্তু এমন জ্ঞানযোগী দুর্লভ যাঁহার প্রতিভার জারকরস-

৪১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনে মনে অনুরূপ আক্ষেপ বহন করিতেন। তু—"বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্‌তে বল্‌তে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কৈ তা হ'লো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না'।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ।

স্পর্শে তথ্য ভারাক্রান্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য রসস্নিগ্ধ শিল্পাকারে পরিণত হইয়া উঠে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে কবি এক পত্রে লিখিতেছেন—

"চিত্তরঞ্জনের কাছে শুনলুম তুমি রীতিমত 'Varsity man হয়ে গেছ। ভার্সিটি ম্যানের কি কি লক্ষণ জানি নে কিন্তু শব্দটা শুনলেই আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়বিমুখ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"[৪২]

পাণ্ডিত্যের যে সাধারণ লক্ষণ আমরা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহার মধ্যে অখণ্ড বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার প্রবণতাই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে দেখা যায়। এই শুষ্ক তার্কিকতা বা scholasticism, যাহা বস্তুর সমগ্র রূপটির যথাযথ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক না হইয়া বাধক হইয়া দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাথের মনে চিরকালই সে সম্বন্ধে একটা বিভীষিকা ছিল। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' কবি এক জায়গায় লিখিতেছেন—

"আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।"[৪৩]

কবি শিলাইদহ-বাসের নিভৃত দিনগুলিতে যে বিচিত্র বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অখণ্ড দৃষ্টি তো আচ্ছন্ন হয়ই নাই, পরন্তু মানসলোক বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই তপস্যালব্ধ জ্ঞানসম্ভার তাঁহার মনের কোন্ অবচেতন গুহায় যে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিত, এবং কখন যে কোন্ অবসরে কোন্ অজ্ঞাত কারণে চেতনার স্তরে উন্মগ্ন হইয়া বিচিত্র বাণীর আকারে জন্মলাভ করিত, তাহা কবির নিকটও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যই ছিল। তাই দেখি, এক জায়গায় কবি বলিতেছেন—

"ছেলেবেলা হতেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগির মত অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মীছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন-কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না, তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।...

"যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না বলে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনো দিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ করে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ

৪২ চিঠিপত্র. ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪। [পত্র° ১৪ কলকাতা, ১৬ জুন ১৮৯৪]।

৪৩ 'জাভাযাত্রীর পত্র. ৪': যাত্রী পৃ. ২০২।

বাঁধিনি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলেমেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গ মূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি।"[৪৪]

শিলাইদহ-যুগে কবির এই অতন্দ্র জ্ঞানসাধনা যেমন তাঁহার মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নিছক ভাবালুতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া রস ও ভাবের (idea and emotion) অপূর্ব সমন্বয় সঞ্জাত এক বিচিত্র দিব্য সৌরভ সঞ্চার করিয়া তাহাকে চিরকালীন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রচলিত সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে— লেখক ও পাঠক, স্রষ্টা ও রসয়িতা, এই উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই মননশীলতার প্রতি গভীর অনাসক্তি ও বৈমুখ্য কবিকে চিরকালই অত্যন্ত পীড়িত করিত। তাই দেখিতে পাই, 'সবুজ পত্র'-পর্বে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত এক পত্রে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"আমাদের দেশের পনেরো আনা লেখার মধ্যে মন জিনিষটা নেই— আমাদের পাঠকদের পাকযন্ত্র সেই জন্যে ওটা এখনও হজম করতে শেখে নি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্তেজনা যতই জোগাবে তার অফুরান কাট্‌তি। কিন্তু মন জিনিসটা বড় বালাই। ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই অমনি গলে না। ওটার সঙ্গে কারবার করতে হলে যে পরিণতির দরকার, যে কারণেই হোক, আমাদের দেশে সেটা দুর্লভ হয়েচে। আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাই নি— যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেছে সেই 'আমার জন্মভূমি'তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয়, নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেক জনের মন সেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়— এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্‌টেভ্‌স্কি বার্নার্ড শ কোট্ করে এবং ব্যাখ্যা করেই স্কুলমাস্টারি করতে পার তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্ছে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর— এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চলবে না। অক্ষয় মজুমদার বলতেন 'অভিনয় করবার সময় দর্শকদের মনে করতুম বাঁদর, তাতেই অভিনয় করা সহজ হত।' কিন্তু অভিনয়ের বেলা যেটা খাটে সাহিত্যের বেলা সেটা খাটে না। সাহিত্যের বেলা মনে রাখতেই হবে যাদের জন্যে লিখচি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই মন আছে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সেই মনের যাচাইটা খাঁটি এবং কড়া নয় বলেই কতই যে বাজে লেখা লিখেচি তার ঠিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে নেবার লোকটি না থাকলে ভিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে। কিন্তু এসমস্ত মেনেও কোমর বেঁধে চলতে হবে এবং জানতে হবে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবিত্বের সহিত মনীষার এমনই মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটিয়াছিল যে, ইহার ফলে একদিকে তাঁহার কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য কর্ম যেমন ক্ষণজীবী সাময়িক সাহিত্যের স্তর হইতে উন্নীত হইয়া চির-কালের বিদগ্ধ সমাজের উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তাঁহার বিশুদ্ধ মননাত্মক রচনারাজিও— যেমন,

৪৪ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি : যাত্রী, পৃ. ১১০-১১১.

৪৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৭ (ফাল্গুন ১৩২৪)।

'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলী, 'মানুষের ধর্ম', বাংলা ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সংক্রান্ত অসংখ্য নিবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি— তেমনই প্রসাদগুণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে; পড়িতে পড়িতে মনেই হয় না যে, কী গভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষা উহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তাঁহার তরুণ বয়সের এই অনলস ও বহুধাবিসারী বিচিত্র সাহিত্যসাধনার কথা জানাইয়া বলিতেছেন—

"এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে তো নেহাৎ সৌখীন চালে করিনি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈরোঁ থেকে শুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢাল সড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়ি নি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা এ কথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজাড় করতে হয়, এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপুরি লাগতে হবে।"[৪৬]

কবির এই আত্মঘোষণা যে কত সত্য, তাঁহার সুবিশাল সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু সেই সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে কবির যে বিরামহীন প্রস্তুতির ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে, 'ছিন্নপত্রে'র খণ্ডিত পত্রাবলী সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিবার পক্ষে পরম সহায়, ইহা প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকই স্বীকার করিবেন।

৪৬ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫২ (শান্তিনিকেতন ১৩ এপ্রিল, ১৯১৭)।

রবীন্দ্রনাটকের নায়ক

শ্রীভবতোষ দত্ত

'রাজা ও রানী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সেই তাঁর প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা[১]। অথচ 'রাজা ও রানী'র আগে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা' বাদ দিলেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকখানি রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা বলে সুপরিচিত। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করেছিলেন।[২]

"এই প্রকৃতির পরিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।··তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কি তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানাবেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

অন্য কাব্যের প্রসঙ্গে যাই হোক প্রকৃতির প্রতিশোধের ভাবটি যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মর্মেও নিহিত আছে, তাও একটু পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। ইংরেজি রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে পরিকল্পিত 'রাজা ও রানী' নাটকটিকে তাঁর প্রথম নাটক মনে করলেও প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে এর ভাবগত মিলটিকেও তিনি দেখিয়েছিলেন এইভাবে[৩]—

"প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।"

অর্থাৎ সত্যকে এরা কেউ সীমা ও অসীমের পূর্ণ মিলনের মধ্য দিয়ে পায় নি। সন্ন্যাসী সীমাকে অবজ্ঞা করে অসীমকে পেতে গিয়েছিল। এও যেমন অন্ধতা তেমনি বিক্রমও বিশ্বকল্যাণ থেকে বিযুক্ত করে আসক্তিতে বদ্ধ হয়েছিল সেও তেমনি অন্ধতা। দুয়ের মধ্যেই আছে সত্যের অবমাননা। সত্যকে কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে, কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনায় কিংবা বিশ্বহিতবিরোধী কোনো খণ্ডিত উপলব্ধিতে পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়া যায় জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধিতে। সত্য যেমন জীবনের বাইরে নেই, সত্য তেমনি নেই জীবনের খণ্ড আকাঙ্ক্ষায়, যে আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে চলতে পারে না। লক্ষ করলে দেখা যায় শুধু রাজা ও রানীতে নয়, বিসর্জনের রঘুপতির মধ্যে, মালিনীর ক্ষেমংকরের মধ্যে, অচলায়তনের মহাপঞ্চকের মধ্যে, মুক্তধারার বিভূতির মধ্যে, রক্তকরবীর রাজার মধ্যে একই তত্ত্ব নানা আকারে দেখা দিয়েছে। এরা সবাই আপন আকাঙ্ক্ষায় অন্ধ, বিশ্বের দিকে

---

১ দ্র° তপতী

২ জীবনস্মৃতি, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী ১: 'রাজা ও রানী'র ভূমিকা

তাকায় নি। তাই একদিন এদের মোহভঙ্গ হয়েছে— সত্যের আলোয় এরা জন্মান্তর লাভ করেছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পুরোপুরি নাটক নয়। একে নাট্যকাব্যই বলা উচিত। এতে দ্বন্দ্ব নেই। সন্ন্যাসীর সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সত্যবোধ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। সেইজন্য নাটকখানি কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। ভাব বা তত্ত্ব যা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, সেটাই এখানে মুখ্যত বিচার্য। সেই তত্ত্বটিকে আলাদা করে সূত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এই সূত্রটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনারও মূল বক্তব্য। এইজন্য এ কথা বলা চলে যে চরিত্র এবং পরিবেশ-সৃষ্টির বাস্তবনিষ্ঠার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে ভাবনিষ্ঠাই বড় হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলির দৈহিক সংস্কার তাদের চালিত করে নি। নাট্যকারের তত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তারা তত্ত্বের প্রয়োজনে চালিত হয়েছে। সত্য ও অসত্যের সংঘর্ষ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দুই বিরোধী নায়কের সৃষ্টি করেন মূলত তাদের মধ্যেই তাঁর বক্তব্য সংহত। পাশ্চাত্ত্য নাটকে যেমন শুধু চরিত্র নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থারও একটা শক্তিশালী ভূমিকা থাকে, রবীন্দ্রনাটকে তা নেই। অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের অনুকূলেই সাজিয়ে তোলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে প্রধান চরিত্র দুটি নেই কিন্তু পরবর্তী অনেক নাটকেই আছে। 'রাজা ও রানী'তে বিক্রমদেব ও সুমিত্রা, বিসর্জনে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি, মালিনীতে মালিনী ও ক্ষেমংকর, প্রায়শ্চিত্তে প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয় বৈরাগী, অচলায়তনে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক, মুক্তধারার বিভূতি ও অভিজিৎ, রক্তকরবীতে রাজা ও নন্দিনী। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই দ্বৈত নায়কদের মধ্যে একজন কবির সত্যবোধের প্রতীক, অন্যজন তার শক্তিশালী বিরোধী। দুয়ের দ্বন্দ্বে সৃষ্টি হয়েছে নাটকের গতিবেগ। রবীন্দ্রনাট্যের পরিকল্পনা এই যে, সত্যের বিরোধিতা করেছে যে তারই পরাজয় ঘটে অবশেষে। অবশ্য 'পরাজয়' অর্থ তার ভিতরে যে মিথ্যাবোধটুকু ছিল সেটারই বিনাশ; আর বেঁচে ওঠে তার মধ্যেকার সুপ্ত সত্যবোধ। দৈহিক মৃত্যু কখনোই তাদের হয় না, কারণ মৃত্যু হলে অপরাজিত সত্য প্রকাশ পাবে কি ভাবে?

অথচ নাটকে যে মৃত্যু নেই তা নয়। কিন্তু মৃত্যু ঘটে এক নিষ্পাপ চরিত্রের। সত্য ও অসত্যের সংঘর্ষে অসত্যের হিংস্রতা যতই প্রকাশ পেতে থাকে ততই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। অবশেষে এই বলি দিয়েই অসত্যের নগ্ন ও চরম রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। তার পরেই ঘটে নাটকের দিক-পরিবর্তন।[৪]

এই তত্ত্ব-রূপায়নে রবীন্দ্রনাট্যের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে— দ্বৈনায়কত্ব। শেক্সপীয়রীয় নাটকে নায়ক একজনই। নাটকীয় গতিবেগের সৃষ্টি হয় যেমন অন্তর্দ্বন্দ্বে, তেমনি বহির্দ্বন্দ্বে। বহির্দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে অবস্থার সঙ্গে নায়ক-চরিত্রের মধ্যে। মৃত্যু আসে নায়কেরই। রবীন্দ্রনাটকে অবস্থার গুরুত্ব নেই। তার পরিবর্তে আছে সত্য ও অসত্যের গুরুত্ব, তাই নাটকে দুই প্রধান চরিত্রের প্রয়োজন, কিন্তু প্রশ্ন এই, নায়ক বলব কাকে?

৪ জীবনকৃষ্ণ শেঠ, রবীন্দ্র-নাটক-প্রসঙ্গ ১৩৬৩, 'রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডির স্বরূপ-লক্ষণ' এবং 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্ববিধানের স্বরূপ' অধ্যায় দুটি দ্রষ্টব্য।

২

'রাজা রানী'কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নাটক-রচনার প্রথম প্রয়াস। এই উক্তির সার্থকতা কি? রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক রচনা করতে আরম্ভ করলেন তার কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশে ইংরেজি পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন[৫]—

"শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"

আমাদের আধুনিক নাটক রচনার প্রথম যুগে সংস্কৃত নাট্যরীতি ও ইংরেজি নাট্যরীতির মধ্যে কিছুকাল দোলাচলতা চলেছিল। মধুসূদনই ইংরেজি নাটক রচনার আদর্শকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার পর দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্র সেই আদর্শকেই অনুসরণ করে এসেছেন। এই নাট্যরীতির উদ্ভব হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যেরই বিবর্তনের ধারায়। গ্রীক ও রোমান নাট্যকলার সূত্র ধরে এই বিশিষ্ট রীতি স্বাভাবিক ভাবেই সে দেশে দেখা দিয়েছিল। এইজন্য দেখা যায় অ্যারিসটট্‌ল নাটকের যে সূত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেই সূত্রটিকে মূলত রক্ষা করে তারই সম্প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন করে পরবর্তী নাট্যকলার আদর্শ নির্ধারিত হয়েছে। এই নাট্যরীতির বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল নায়ক-কল্পনা। অ্যারিসটট্‌ল দেখিয়ে গিয়েছিলেন ট্র্যাজেডির নায়ক হবে একজন অসাধারণ ব্যক্তি (highly renowned and prosperous)। কিন্তু অসাধারণ বলে সে আদর্শচরিত্রের ব্যক্তি হবে, তা নয়, বরং সে হবে দোষে গুণে আমাদেরই মত মানুষ। তার দুর্ভাগ্য তার কোনো পাপের জন্য নয়। তার দুর্ভাগ্য আসে কোনো ভ্রান্তি বা দুর্বলতার জন্য। মোটামুটি এই পরিকল্পনা শেক্সপীয়রেরও ছিল। তঁর নায়কেরাও অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু তারাও আমাদের মতই মানুষ।[৬] কিন্তু এই মানুষই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে আবেগের অন্ধতায়— লক্ষ্য বস্তুর তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। ব্র্যাডলি বলেন, চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ভয়ংকর, কিন্তু এর সঙ্গে একটি মহত্ত্বের স্পর্শও আছে। বিশেষ করে এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয়, হৃদয়ের ঔদার্য, প্রতিভা কিংবা অপরিমেয় শক্তি, তখনই যেন আমরা আত্মার সুপ্ত সম্ভাবনাটি টের পাই, আর যে দ্বন্দ্বে সে লিপ্ত হয়, তারই মধ্যে থাকে এমন একটি বিশালতা যা শুধু করুণা ও সহানুভূতিই জাগায় না, তারই সঙ্গে জাগায় বিস্ময় মুগ্ধতা এবং ভীতি। এমনই একটি চরিত্র অবস্থা বিপর্যয়ে যখন ভুল করে বসে তখনই আসে ধ্বংস। এই ধ্বংস শুধু অসতের নয়, সৎ প্রবৃত্তিরও। তাই ট্র্যাজেডিতে অপচয়ের বেদনা জাগে।

শেক্সপীয়রের নাটক একটি বিশিষ্ট রীতিতে এই নায়ক-চরিত্রের পরিণামকে ফুটিয়ে তুলেছে। সেকালের বাঙালি পাঠক নাটকের এই চরিত্র-ভাগ্য দেখে জীবনের এমন-একটি রস আস্বাদন করেছে যা আমাদের সাহিত্যে এর আগে পায় নি। শেক্সপীয়রের নাটক চরিত্র-কেন্দ্রিক অর্থাৎ একটি নায়ক-চরিত্রের পরিণামই এতে দর্শনীয়। শেক্সপীয়রের নাটকের নামকরণ থেকেই বুঝতে পারা যায়,

৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪: 'মালিনী'র ভূমিকা

৬ "His tragic characters are made of the staff we find within ourselves and within the persons who surround them".—A. C. Bradley. *The Shakespearean Tragedy,* The Substance of Tragedy.

একটি কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্রের ভাগ্যবিবর্তন দেখানোই নাট্যকারের লক্ষ্য। কিন্তু এই ভাগ্যকে সে যে শুধু নিজেই বহন করে আনে তা নয়, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় লীলায় জড়িত হয়ে তাকে দুর্ভাগ্যের দণ্ড স্বীকার করতে হয়। তাই নায়ককে মূলত দেখানোই নাট্যকারের উদ্দেশ্য হলেও প্রকৃতির ভূমিকা এতে কম জটিল নয়। এ জন্যেই নায়ক এখানে কোনো কবিকল্পিত তত্ত্বের বাহক নয়, তার দেহ-মন প্রকৃতির প্ররোচনাতেই দ্বন্দ্বলিপ্ত। তার মৃত্যু এই দ্বন্দ্বেরই পরিণাম।

জীবনমুগ্ধতার এই লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের এইসময়ের কবিতায় ছড়িয়ে আছে। রুদ্র অশান্ত প্রকৃতি এককথায় নৈতিক তত্ত্বমুক্ত অনাবৃত এক জীবন কবির চোখের সামনে আদিম বিস্ময় ও রহস্যবোধ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। এই প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর ভীষণ শক্তি nature in the tooth and claw কবিচিত্তকে বারবার অভিভূত করেছে। তার পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতায় 'সিন্ধুতরঙ্গ' 'ঝুলন' 'বসুন্ধরা' 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতিতে। একটা আরণ্য আদিম শক্তি মানুষের সমস্ত নৈতিক বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে বিরাজিত। কবি যেন তারই সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন।[৭]

যত অন্ত নাহি পাই, তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি—
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

কিন্তু এক আশ্চর্য দ্বিধার লক্ষণও আছে রবীন্দ্রনাথের সময়ের কাব্যে। প্রকৃতিনিষ্ঠা যেমন তাঁর প্রবল, প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কোনো তত্ত্বের মধ্যে নিশ্বাস ফেলে নিঃসংশয়িত হবার আকাঙ্ক্ষাও অপ্রবল নয়। তাঁর অনেক কবিতাই যে শেষাংশে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে তার কারণ প্রথমাংশের রুদ্রতার শান্তরসে অবসাদ। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কিঞ্চিৎ অবান্তর হয়ে পড়বে বলে বক্তব্য বিশদ করবার জন্য একটি দৃষ্টান্তই নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটিতে প্রকৃতির অন্ধ মমতাময় রূপ আবার সেইসঙ্গে এক কঠোর রুদ্র শক্তির রূপও ফুটে উঠেছে। এই কবিতায় যেমন বিচ্ছেদের করুণতা আছে, তেমনি আছে এক মহানিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার ভারমুক্তি। এই মুক্তিতে আনন্দ নেই সত্য কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্তী যুগে এই আত্মনিবেদনই এক নিশ্চিন্ত আনন্দময়তায় রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগের চেয়ে যেন একটা বৃহৎ তত্ত্বের উপলব্ধিই অধিকতর সত্য এবং সংগত বলে মনে হয়েছে। মানসী-চিত্রার যুগে রবীন্দ্রকবিমানসের বৈশিষ্ট্যই ছিল পাশ্চাত্ত্যরীতির প্রকৃতিপ্রেম। এ সময়ের গল্পরচনাতেও জীবনের সেই নৈসর্গিক রূপটাই

---

৭ মানসী, 'প্রকৃতির প্রতি' ১৮৮৮

ফুটে উঠেছে। আবার 'কাবুলিওয়ালা' 'পোস্টমাস্টার' গল্পেও বাস্তব-তীক্ষ্ণতাকে তত্ত্বের রসে অভিষিক্ত করবার লক্ষণও আছে।

এই দ্বিধার লক্ষণ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকেও। য়ুরোপের রেণাশাঁস-পরবর্তী সাহিত্যে এই জীবনমুগ্ধতা এবং প্রকৃতিচেতনা পাশ্চাত্যে যে অপূর্ব নাটক ও কাব্য সৃষ্টি করেছিল, রবীন্দ্র-কবিমানসকে তা একদিন প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই তাঁর মধ্যে যেমন দেখি প্রকৃতিনিষ্ঠা তেমনি দেখি তারই সাহিত্যরীতির অনুসরণ। য়ুরোপের সেই নাট্যরীতিতে জীবনপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত নায়কের করুণ-মধুর ভাগ্যপরিবর্তন স্তরে স্তরে উন্মোচিত করে দেখানো হয়েছে। এই উন্মোচনের সূত্র অবলম্বনে গড়ে উঠেছে নাটকের পাঁচটি ভাগ। বাংলা সাহিত্যের নতুন নাটকরীতি এই পাঁচটি ভাগকেই যথাযথ রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। সেইজন্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নিজস্ব অনুপ্রাণনায় লিখলেও পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রানী'তে তিনি য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শে প্রবর্তিত হয়েছেন।

কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনপ্রকৃতি থেকেই যে নাট্যাদর্শের উদ্ভব তা তাদের জীবনে যত স্বাভাবিক ও সত্য, বাঙালির সাহিত্যে তা ততখানি স্বাভাবিক ও সত্য হল না।[৮] বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাটকেই এই দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মতই রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রকৃতির জটিল বিস্তার যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে প্রকৃতির বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে শান্ত ধীর নির্বিকল্প এক সত্যের অবিচল মহিমা। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে দুই নায়কের— একজন সুমিত্রা-শ্রেণীর আর একজন বিক্রম-শ্রেণীর, একজন সত্যের প্রতীক আর-একজন মোহের প্রতীক। য়ুরোপীয় নাটকে প্রথমোক্ত শ্রেণীর নায়ক বিরল, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর চরিত্রই শেক্সপীয়রীয় নাটকের নায়ক। এই একটি চরিত্রই প্রধান, আর সব চরিত্রের মধ্যে থেকেও অসাধারণ, গর্বোন্নত। তার অসাধারণত্ব কোনো চিরন্তন সত্যের আদর্শে লগ্ন থাকার জন্য নয়, তার দেহায়তনেই জীবনপ্রকৃতির উৎসবলীলার আয়োজন হয়েছে বলে। প্রবল প্রবৃত্তির আত্মঘাতী খেলায় মত্ত বলেই সে অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই শ্রেণীর এক শক্তিশালী চরিত্রও থাকে। তার প্রবৃত্তিবেগ কিছুকালের জন্য বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সেই বিপর্যয় শেক্সপীয়রীয় নাটকের পরিণামের মত মৃত্যু ও অপচয় নিয়ে আসে না, আনে পরিবর্তন। সত্যবোধের প্রতীক অন্য যে প্রধান চরিত্র, তারই আদর্শে ফিরে এসে প্রমত্ত দ্বিতীয় নায়ক শান্ত হয়। এইজন্যেই পাঠক স্থির করে উঠতে পারে না— নাট্যকারের অভিপ্রেত নায়ক কে? একজন কবির সত্যের আদর্শকে বহন করছে; শেষ পর্যন্ত তারই আদর্শ বিজয় লাভ করছে। আর-একজন শেক্সপীয়রীয় নাটকের নায়কের মতই শক্তিমান্ অসাধারণ ও বিস্ময়োদ্দীপক। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যজনকে কবি বিজয়ী করছেন বটে, কিন্তু এর প্রতি কবির আকর্ষণ যে কিছু কম তা তো মনে হয় না। আর সে আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। তিনি নীতিবিদ্ শুধু নন,

৮ "য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য-সুরটি মর্মরধ্বনির উপরে উঠিতে চায় না।" —জীবনস্মৃতি, 'ভগ্নহৃদয়'

তিনি কবি। কৌতুক বোধ করি, তিনি 'রাজা ও রানী' এবং মালিনীর ভূমিকায় বারবার স্মরণ করিয়ে দেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে এদের মিল আছে। রবীন্দ্রকবিমানসের এই দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি কোথায়, তা লক্ষ করার প্রয়োজন আছে।

৩

মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' সম্পর্কে একটি অভিমত প্রচলিত আছে ধর্মপ্রাণ কবি ঈশ্বরকে কাব্যের নায়ক করতে গিয়ে তাকে প্রাণহীন পুতুলে পরিণত করে ফেলেছেন এবং কবির অজ্ঞাতসারে শয়তান প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও উদ্ধত ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাব্যের নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিলটনের শয়তানের বর্ণনা যেমন সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, শয়তানের মুখের বহু উক্তি তেমনি জীবনযুদ্ধে প্রবল পৌরুষের বাণী হয়ে আছে। রেনার্শাসের পর য়ুরোপে প্রকৃতি এমনি করেই প্রতিশোধ নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও দেখি, যে ভ্রান্ত আদর্শের তিনি পরাজয় দেখিয়েছেন, সেই আদর্শের প্রতিনিধি একটা আশ্চর্য বীর্যবত্তার অধিকারী হয়ে আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে। 'তপতী'র এই নায়ক বিক্রম বলেছে—

"তুমি আমাকে চিনতে পারলে না— তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি? সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য— আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু— কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ বলে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা! ভুলে যাও, তোমার ঐ কানে মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপর ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ্‌ সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে— তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম-অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও। একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।"

ইংরেজিতে একেই বলে elemental। প্রেমের এই আদিমতায় এক রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তি অন্ধ আবেগ নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ শক্তি সব নীতিতত্ত্বের বাইরে, পর্বত সমুদ্র ঝঞ্ঝা মৃত্যু উল্কাপাতের মতই সত্য। মানুষ যে নীতির কথা বলে সে মনঃকল্পিত; আর এই দুর্জয় আবেগ কঠোর কঠিন রুদ্র বাস্তব। এই নীতির প্রতিনিধি যে নায়িকা, তপতীর সেই সুমিত্রা প্রেমের এই প্রমত্ত লেলিহান অগ্নিশিখার সামনে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত হয়ে বলে উঠেছে—

"সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে— আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়— উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধূলির পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত।"

বিক্রমের প্রেমের ভার বহন করবার শক্তি সুমিত্রার নেই। সুমিত্রা তুলে নিয়েছে প্রজার কল্যাণের ব্রত। তাতেই সে পেয়েছিল জীবনের অভীষ্ট। তার প্রেমের কল্পনা অন্যরকম। আসলে সে ঠিক প্রেমকেই চায় নি, সে চেয়েছে রাজাকে নিজের আদর্শ দিয়ে কল্পনা করতে। রাজাকে হতে হবে

দেবতা—প্রেমিক নয়। লক্ষ করবার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও এমনি-এক দাম্পত্য সমস্যা আছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে একটির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' কিংবা 'তপতী'র কাহিনীর মত। সীতারাম ও শ্রীর মধ্যে বিচ্ছেদটা প্রথমত আদর্শের জন্য ছিল না। ছিল প্রেমেরই জন্য। স্বামীকে ভালোবাসে বলেই শ্রী স্বামী থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। এ সমস্যা প্রাণের, মনের নয়। কিন্তু পরে শ্রী যখন দেবীতে পরিণত হল, তখন সীতারামের প্রবল শক্তি তার প্রেমকে রূপান্তরিত করল একটা হিংস্র রিপুতে। বঙ্কিমের উপন্যাসে শেক্সপীয়রীয় কল্পনার ছায়া আছে, তবু সীতারামের মত শক্তিমান নায়ককে রিপুপরবশ হতে দেখে মনে হয় সীতারাম প্রেমকে দুর্বার করে তুলতে না পেরে বরং তাকে দুর্বল হীনতার বশীভূত করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিক্রমদেব এই দুর্বলতার বশীভূত হয় নি। বিক্রমদেবের চরিত্রে যে নায়ক-লক্ষণ ফুটে উঠেছে তা আরও নিরঙ্কুশ এবং দুঃসাহসিক অর্থাৎ সে দুর্বৃত্ত-নায়ক, ইংরেজিতে যাকে বলে villain hero।

'তপতী'র বিক্রমদেবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নায়কের একটি পূর্ণবিকশিত রূপ কল্পনা করেছেন। ইতিপূর্বে এক রঘুপতি ছাড়া ঠিক এতখানি পূর্ণাঙ্গতা আর কোনো দ্বিতীয় নায়কে দেখা যায় না। মালিনীর ক্ষেমংকর চরিত্রটির মধ্যে আছে এক অটলতা ; তেমনি অটলতা আছে অচলায়তনের মহাপঞ্চকের। এরা দু জনেই পাষাণের মত দুর্ভেদ্য। এই চরিত্র-পরিকল্পনাতে মহত্ত্বের স্পর্শ (touch of greatness) আছে। এ কথা রবীন্দ্রনাথই অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে পরোক্ষে বলিয়েছেন। অচলায়তন যখন ভেঙে পড়ছে, সবাই যখন গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করছে মহাপঞ্চক তখন বলছে,

"পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।"

তখন দাদাঠাকুর বলছেন,

"শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।"

স্পষ্টতই এই চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণবোধের দিক দিয়ে স্বীকার করতে না পারলেও এর শক্তিকে তিনি অস্বীকার তো করতে পারেনই নি, বরং এর প্রতি এক ধরণের বিস্ময় এবং সম্ভ্রম অনুভব করেছেন। কিন্তু মহাপঞ্চকের চরিত্রে এই শক্তিটি ছাড়া আর-কোনো বিশেষত্ব নেই, সেইজন্যই এর চরিত্রবিকাশের আর-কোনো সূত্র নেই। এই চরিত্রটি যেন একটি কঠিন ধাতুপিণ্ড মাত্র ; এই ধাতু দিয়ে আর কিছু গড়া হয় নি। মালিনীর ক্ষেমংকর চরিত্রটিও এই শ্রেণীর। তার মধ্যেও একটি অন্ধশক্তি আছে, কিন্তু তার পূর্ণবিকাশ ঘটে নি। অথচ ক্ষেমংকর নাট্যকারের সত্যবোধের প্রতিকূল শক্তি হলেও দৃঢ়তা ও একমুখিনতায় সে নায়ক-লক্ষণযুক্ত। 'মুক্তধারা'র রাজা রণজিৎকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি কিন্তু নাটকের শেষাংশে অভিজিতের জন্য তার অসহায় উদ্‌বেগ তার চরিত্রকে নমনীয় করে তুলেছে। রণজিৎ যেন ক্ষেমংকর এবং রঘুপতি মিলিয়ে পরিকল্পিত।

বিসর্জনের রঘুপতি-চরিত্রটিতে কেবল নায়কের দৃঢ়তা ও শক্তির অন্ধতাই প্রকাশ পায় নি, জয়সিংহের প্রতি স্নেহে এবং আরও নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়ে তার চরিত্র ক্রমবিকাশশীল। এই হিসাবে সে নাটকের

নায়ক হবার যোগ্য সন্দেহ নেই। বরং এ দিক দিয়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্য নাট্যকারের সত্যবোধের প্রতীক হলেও এবং শেষপর্যন্ত তারই আদর্শকে বিজয়ী দেখালেও সে স্থির, পরিবর্তনহীন। তার চরিত্রের আর-কোনো বিশেষত্ব নেই বা সূত্র নেই। রঘুপতির আদর্শের প্রতি নাট্যকারের শ্রদ্ধা না থাকলেও সে গোবিন্দমাণিক্যের চেয়ে অধিকতর জীবন্ত। স্রষ্টা রূপে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির রূপায়ণে অধিকতর অবহিত। তার ট্র্যাজেডি এই যে রঘুপতি তার নিজের পরাজয়ের বিষবাণ নিজেই অজ্ঞাতসারে বহন করেছে। জয়সিংহের প্রতি স্নেহই সেই বাণ। সেই অমৃতই অবস্থা-বিপর্যয়ে হল তার কাছে বিষোপম, তার মৃত্যু। এই তার প্রকৃতির প্রতিশোধ। একটি কারণে রঘুপতি ঠিক শেক্সপীয়রীয় নায়ক হয়ে ওঠে নি। রঘুপতির চরিত্রে শক্তি শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধা জাগায় না, কারণ সে যেসব মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তা তার আদর্শকে কলুষিত করেছে। পাঠকের সম্ভ্রম শেষপর্যন্ত আকর্ষণ করতে পারে না। রঘুপতি দুর্বৃত্ত-নায়কও নয়। তার দুর্বৃত্ততার মধ্যে নায়কোচিত শক্তির বলিষ্ঠ অনাবৃত দুঃসাহসিকতা নেই যা বরং আমরা তপতীর বিক্রমদেবের মধ্যে দেখি। আবার পুরোপুরি নায়কগৌরবও সে পায় না তার চরিত্রগত হীনতার জন্য।

এই দ্বিধার হাত থেকে কিছু মুক্তি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন 'রক্তকরবী'র রাজার কল্পনায়। রক্তকরবী রূপক নাটক, রাজাও একটি সাংকেতিক চরিত্র মাত্র এবং সে দিক থেকে অন্য নাটকের সঙ্গে ঠিক তুলনাও টানা উচিত নয়। তবু রক্তকরবীর রাজার মধ্যে শক্তির একটা অভ্রভেদী বিশালতা ফুটেছে। অবশ্য এই রূপ ক্রিয়ার (action) চেয়ে বর্ণনাতেই প্রকাশিত—

"অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।"

প্রাণসত্তা মুগ্ধ হয়েছে শক্তিকে দেখে, যদিও এই একই শক্তির 'নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ' লালিত হয়েছে। রক্তকরবীর রাজা যে শক্তির প্রতীক, সেই শক্তির লক্ষণই এই যে হৃদয়হীনতাই একে ক্ষয় করে ফেলে—

"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

"তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।"

বিসর্জনের রঘুপতি যেমন শক্তির সঙ্গে স্নেহের দুর্বলতা লালন করেছে, মরকরাজও তেমনি শক্তির সঙ্গে লালন করেছে একটা অপরিতৃপ্ত ক্ষুধাকে। শক্তির মত্ততায় তারা জানতে পারে নি এই দুর্বলতাই তাদের শক্তিমত্তাকে একদিন পরাস্ত করবে। চরিত্রকল্পনার এই রীতিও নাটকীয়। শেক্সপীয়রের নায়কেরা একই সঙ্গে প্রাণ ও মৃত্যুকে বহন করেছে।[৯] কিন্তু রঘুপতি চরিত্রের মধ্যে

[৯] "It is a fatal gift but it carries with it a touch of greatness."—A. C. Bradley. *The Shakespearean Tragedy.* The Substance of Tragedy.

কার্যসাধনের যে হীনতা আছে, রাজার চরিত্রে তা নেই। এইজন্য রাজার যে নায়ক-গৌরব আছে, রঘুপতি পুরোপুরি সে অধিকারে বঞ্চিত।

৪

এককালে শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের দেশে নাট্যরচনার আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথও প্রথম যুগে বহিরঙ্গ নাট্যরীতিতে অন্য সকলের মত শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' ও 'প্রায়শ্চিত্তে'—এই তিনটি নাটক ঘটনাধারার দিক দিয়ে এই প্রথাকে যথাযথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার লক্ষণ পরবর্তী নাটকে অক্ষুন্ন আছে। দুই পদ্ধতি মিলে রবীন্দ্র-নাটকের এক মিশ্ররূপ গড়ে উঠেছে। কবির কল্যাণভাবনা এবং জীবনভাবনা রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। তারই ফলে দ্বিনায়কত্বের সৃষ্টি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৯০৯) থেকেই রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাও করেছেন। নিজস্ব পদ্ধতি, যা পরবর্তী নাটকে পূর্ণ-প্রকাশিত, তার কিছু কিছু লক্ষণ এখানে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি বিদেশী নাট্যপদ্ধতিকে বেশি করে মানলেও প্রথম যুগেও রবীন্দ্রনাথের নিজের চিন্তা বিশেষ ক্ষুন্ন হয় নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল থাকলেও দুই নায়কের মধ্যে একজনের কল্পনায় শেক্সপীয়রীয় নায়ক-লক্ষণ তীব্রতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এইসব আলোচ্য নাটকগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলতে পারা যায়। যেসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে মূলত অবলম্বন করে নায়কের পরিকল্পনা করেছেন সেগুলি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ, জীবনধর্মী এবং নাটকীয়। যেসব নাটকে তিনি চরিত্রের প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে মুখ্য না করে একটা কোনো বহিরঙ্গ আদর্শের প্রতীকরূপে এঁকেছেন, সেই নাটকে নায়ক-চরিত্র স্বভাবতই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে নি। 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী' প্রথমশ্রেণীর। প্রেম ও প্রবৃত্তির সংঘাত এই নাটকের বিষয়। বিসর্জনকেও এরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কারণ ধর্মের মোহ রঘুপতিকে ক্ষমতামত্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করেছিল বলে এতেও মানবস্বভাবকেই তিনি নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত করেছেন। কিন্তু 'মালিনী' 'অচলায়তন' 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'র বিষয় অন্যরকম। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম, যন্ত্রশক্তি অথবা ধনশক্তির পাপ দেখানোই এইসব নাটকের উদ্দেশ্য। সুতরাং এদের নাটকীয় বিষয়টা ব্যক্তিস্বভাবের উপর ততটা নির্ভর ক'রে নেই, যতখানি স্থাপিত সামাজিক সমস্যার উপর। তাই এখানকার নায়করা পূর্ণবিকশিত নয়। এদের পর্বতকঠিন অটলতা কবিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। সেই মুগ্ধতা এবং বিস্ময় দিয়ে কবি এদের গড়েছেন বলেই এরা অসাধারণ এবং সেই গরিমায় নায়ক হবার যোগ্যতা কোনো অংশেই কম নয়। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য, কবি যে কোনো চরিত্রের নামে নাটকের নামকরণ করতে পারেন নি তার একটি কারণ ছিল এই দ্বিনায়কত্ব। ভাব-সংঘাতের প্রকৃতি দিয়ে তিনি নাটকের নাম দিয়েছেন, কোনো চরিত্র দিয়ে নয়। যাকে ভালোবাসলেন তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। যাকে পূজা করলেন তারই অধিষ্ঠান-বেদী তিনি রচনা করলেন।

বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সাতষট্টি বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে ; তাহারা বিচ্ছিন্ন।"[১]

এখন আমরা জাতীয় সংহতির প্রশ্ন নিয়ে ভাবছি। রবীন্দ্রনাথ একাত্মবোধের সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পথটি নির্দেশ করে গিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যে মানবগোষ্ঠীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জানাই প্রকৃত জানা। একদা সংস্কৃত সাহিত্য ভারতের জনসাধারণকে এক সংস্কৃতি-ভাবনায় যুক্ত করেছিল। বেদ উপনিষদ্ ও কালিদাসের কাব্য ভারতের সকল অঞ্চলের পক্ষেই সমান সত্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য দেশের সর্বত্র রচনা করেছিল এক সাংস্কৃতিক পটভূমি।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব নানা কারণে ক্ষীণ হয়ে আসবার পর থেকে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেশী সরকার এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তখন ইংরেজি ভাষার দাপটে আঞ্চলিক ভাষা তার দারিদ্র্য নিয়ে মর্যাদার আসন লাভ করবার সুযোগ পায় নি।

ইংরেজি যে ঐক্য এনেছে তা একান্তই বাহিরের। ইংরেজি আফিস-আদালত ও ব্যবসায়ের ভাষা। হৃদয়ের ভাষা নয়। দরিদ্র হলেও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই দেশের সত্যকার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। যাঁরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত তাঁরাও মাতৃভাষাকেই হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবং এইজন্যই, এত দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজির আধিপত্য সত্ত্বেও, ইংরেজি সাহিত্যে ভারতীয় লেখকের দান উল্লেখযোগ্য নয়।

দেশের হৃদয় আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। জাতীয় সংহতির জন্য দেশকে সমগ্রভাবে জানতে হবে। অপরিচিত ভাষার অন্তরালে দেশের হৃদয়ের যে খণ্ডাংশ আত্মগোপন করে আছে তাকে না জানলে একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়।

জানবার উপায় এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ এবং আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার ব্যবস্থা। এখনও আমরা বিদ্যালয়ে শেক্সপীয়র মিল্টন শেলী কীটস্ পড়ি। বাঙালি ছাত্র যদি তুলসীদাসের নামও শুনে না থাকে তা হলেও তার প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়ে সাহিত্যে এম. এ পাস করতে আটকাবে না। ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠের সুযোগ থাকলে এরূপ অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব।

তুলনা ছাড়া আমাদের চলে না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিমুহূর্তে তুলনা করতে হয়। জ্ঞানচর্চার জন্যও তুলনা অত্যাবশ্যক। ম্যাক্সমূলার বলেছেন, "all higher knowledge is gained by

১ বাংলা জাতীয় সাহিত্য : 'সাহিত্য'

comparison, and rest on comparison।" কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতি এসেছে অনেক পরে।

য়ুরোপের জাতীয়-সাহিত্যগুলি যতদিন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি ততদিন পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার কথা ওঠে নি। তুলনার জন্য প্রয়োজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তু বা বিষয়। মধ্য-যুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যে ল্যাটিন ভাষা, ক্লাসিক রীতি ও ধর্মের প্রাধান্য ছিল। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের উপরে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাব পড়েছে একটি কেন্দ্র থেকে। সুতরাং এইসব প্রভাব অতিক্রম করে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ। রোম-সাম্রাজ্য পতনের পর রাজনৈতিক বন্ধন শিথিল হল ; নানা কারণে চার্চের কর্তৃত্বেরও জোর রইল না। এর ফলে য়ুরোপের মানচিত্রে দেখা দিল কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। এতদিন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ছিল দৃষ্টির অন্তরালে। গাথা পল্লীগীতি এবং উপকথা ছিল এদের আশ্রয়। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর আঞ্চলিক সাহিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্রুত বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই অনেকগুলি আঞ্চলিক সাহিত্য সম্পদশালী হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বর্তমানে যেমন যোগাযোগ নেই, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে য়ুরোপের সাহিত্যগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ।

নতুন সৃষ্টির আনন্দে প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করবার বাসনা জেগে উঠল। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও আমরা এই লক্ষণটি দেখতে পাই। বাংলার শেক্সপীয়র, বাংলার মিল্টন, বাংলার শেলী না বললে যেন বাঙালি লেখকের প্রতিভা চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার প্রধান প্রেরণা এসেছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার ও প্রয়োগ থেকে। বিজ্ঞানের তথ্য সকল দেশেই সমান সত্য। সুতরাং তথ্যানুসন্ধান ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বিজ্ঞানে তুলনামূলক রীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ দেখা যায় জর্জ কুভিয়ার (১৭৬৯ - ১৮৩২) 'শারীরবিদ্যা' (১৮০০) গ্রন্থে।

সমাজবিদ্যার ক্রমবর্ধমান চর্চাও সাহিত্যের আলোচনাকে প্রভাবান্বিত করেছে। একটি বইকে বিচ্ছিন্ন শিল্পকীর্তি হিসাবে না দেখে যুগ ও সামাজিক পরিবেশের শিল্পমণ্ডিত প্রতীক হিসাবে দেখাই সমীচীন বলে কেউ কেউ বলেছেন। অর্থাৎ একটি বই শুধু একজন লেখকেরই সৃষ্টি নয় ; তার রূপায়ণে সমাজ ও কালেরও অংশ আছে। তখনই প্রশ্ন ওঠে তুলনার। জাতি যুগ ও পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা করলে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারে। টেইন[২] তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকায় (১৮৬৩) বিস্তৃতরূপে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্য যে দেশের গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেই সার্থকতা লাভ করে না, তা যে বিশ্বসংস্কৃতি ও বিশ্বসাহিত্যের অংশমাত্র এবং বিশ্বের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবার যোগ্যতা লাভ করবার মধ্যেই যে সার্থকতা— তা অকুণ্ঠ ভাবে ঘোষণা করবার কৃতিত্ব হার্ডারের[৩]। তুলনামূলক সাহিত্যের ইতিহাসে হার্ডারের নাম আর-একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য

২ Hippolyte Taine (1828-1893).

৩ Johann Gottfried Von Herder (1744-1803).

জার্মান সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। হার্ডার বলেছিলেন, শেক্সপীয়র লোকগাথা ও লোকসংগীতের উপর ভিত্তি করেই তাঁর অপূর্ব নাটকগুলি রচনা করেছেন। এই উক্তি যথার্থ না হলেও জার্মানিতে শেক্সপীয়রের রচনার নতুন ব্যাখ্যা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। আরম্ভ হল লোকগাথা ও লোকসংগীতের চর্চা ও সংকলন। শেক্সপীয়রের মত নাটক রচনা করা যে অসম্ভব নয় এমন আশা নিয়ে অনেক লেখক গাথাসাহিত্য আলোচনা আরম্ভ করলেন। লোকসাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হবার ফলে ফাউস্টের কাহিনী গ্যেটের[৪] মন আকৃষ্ট করতে হয়ত সহায়তা করেছে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যেটে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে স্ট্রাসবুর্গে এলেন পড়াশুনা করতে। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় হার্ডারের সঙ্গে। হার্ডার তাঁকে শেক্সপীয়র এবং অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত করে দেন। হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তী জীবনে গ্যেটে বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্য লিখতে এবং বক্তৃতা করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নি। বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ সুস্পষ্টরূপে প্রথম ব্যাখ্যা করেন গ্যেটে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি গ্যেটে একারমানকে বলেন: জাতীয় সাহিত্য এখন অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসছে; সেই যুগকে দ্রুত এগিয়ে আনবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা কর্তব্য।

গ্যেটে বলতেন, বিশ্বসাহিত্য সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বাজার। এ বাজারে বুদ্ধি ও চিন্তার সম্পদগুলি বিনিময়ের জন্য সাজানো থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা বিভেদ আছে; বিশ্বসাহিত্য সেই বিভেদের উপরে মিলনের সেতু। বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে লেখকেরা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে ভাবের আদানপ্রদান করেন। ভাব-সম্পদে কোনো জাতির যদি অভাব থাকে তাহলে পারস্পরিক আলোচনা ও গ্রন্থপাঠ দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যেতে পারে। অন্য দেশের লেখকের রচনায় আমার দেশের কী ছবি ফুটে উঠেছে তা থেকে নিজেদের যথার্থরূপে জানবার সুযোগ পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের প্রধান উপায় অনুবাদ। গ্যেটে অনুবাদের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আদর্শ অনুবাদ দুর্লভ। মোটামুটি ভালো অনুবাদের সাহায্যে এক সাহিত্যের ভাবসম্পদ অন্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে। বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাও পারস্পরিক মৈত্রীভাবনার সহায়ক। কার্লাইল ইংরেজি ভাষায় জার্মান সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, গ্যেটে তা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন জাতির লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও আন্তর্জাতিক ভাবসম্মিলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

গ্যেটের বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ শুধু সমসাময়িক লেখকদের রচনার পাঠ ও আলোচনার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শাশ্বত মানবতার আদর্শে পৌঁছবার জন্য সাহিত্যের সহায়তা অত্যাবশ্যক। প্রাণিজগতে যেমন আদিরূপ আছে— বিভিন্ন প্রাণী সেই আদিরূপের বিচিত্র প্রকাশ— তেমনি আমাদের শিল্প ও বুদ্ধির জগতেও আরকিটাইপ বা আদিরূপের কল্পনা করা যায়। বিভিন্ন জাতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদিরূপেরই রূপভেদ। আদিরূপকে স্পষ্টতর করে বৃহত্তর মানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ করাই বিশ্বসাহিত্যের মুখ্য কর্তব্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে আদিরূপে পৌঁছবার সাধনা

---

৪ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

করবে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাহিত্যে পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন সহজ হবে। কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উপলব্ধি না করতে পারবার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটে বিশ্বসাহিত্য বলতে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যই হয়তো বুঝেছেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তিনি য়ুরোপীয়ান ও বিশ্বসাহিত্য সমার্থক রূপে প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। সংস্কৃত ও চীনা সাহিত্যের নানা বই তিনি পড়েছেন ; তবু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্য দেশের সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা এমন আর নতুন কথা কি। সভ্য সমাজে সকল যুগেই তা হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্য চীন দেশে, শ্যাম জাভা আরব প্রভৃতি দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই পাঠ নিবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে। জনসাধারণ বিদেশী সাহিত্যের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি ; কারণ, অনুবাদের প্রচার মুদ্রণ-পূর্ব যুগে ছিল খুবই কম।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা পাশ্চাত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছে মূলতঃ গোটের আদর্শ অনুসরণ করে। ইউনেস্কো বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন। এখন বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা অনুবাদের সাহায্যেই করা যেতে পারে ; ভাষা না জানলে যে চর্চা বন্ধ রাখতে হবে তেমন অবস্থা আর নেই।

বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে একটি সাহিত্য যে কিরূপ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে তার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্য। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে সকল চিন্তাশীল বাঙালিই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ দেশে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যের প্রচারের জন্য মিলিত ভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর অক্টোবর মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যচরণ ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানাতে বিনামূল্যে বই-পত্র পাঠাবার জন্য। তাঁরা আবেদনে বলেছেন, "One of the great objects of the formation of this Institution [Calcutta Public Library] is the dissemination of European literature and science in this country. As the promotion of the real interests of India, and we may add the happiness of the inhabitants, mainly depend upon the successful prosecution of those efforts which have been made for some years past to foster a taste for the elegant literature and sound knowledge of the west, it may be considered a duty incumbent on every Englishman, whatever be his station, to assist in furthering this object."[৫]

অর্থাৎ, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য এ দেশে প্রচার করাই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অন্যতম

---

৫ Calcutta Public Library : Annual Report, 1848-49.

প্রধান উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্ত্যের সুরুচিপূর্ণ সাহিত্য এবং প্রগাঢ় জ্ঞান এ দেশে প্রচারের উপরে ভারতবাসীর সুখ ও স্বার্থ অনেকটা নির্ভর করছে।

যে বছর এই আবেদন করা হয় সেই বছর, অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করেন। আবেদনকারীরা ঐ কথাটি ব্যবহার না করলেও অন্তর্নিহিত ভাবটি তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

শুধু এই ক'জন আবেদনকারীর মধ্যেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা দেশের মন বিদেশী সাহিত্যের দান গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একমাত্র বাংলা সাহিত্য সেই প্রভাব থেকে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যে আদানপ্রদানের পালা নিত্যই চলছে। নিজের মত করে গ্রহণ করবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। বাঙালির তা ছিল; এই জন্যই বাঙালি লেখকরা অনুকরণ করেন নি। সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিশ্বসাহিত্যের এই মূল তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন, "হোমার বর্জিল মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদানপ্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা না হয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়।...অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন।"[৬]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেব কাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে-হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব

৬ সাহিত্যরূপ: সাহিত্যের পথে

করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত; যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে।… সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।"[৭]

উপরোদ্ধৃত দুটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রধান তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে যে সাহিত্য অন্য জাতির মনে নব-সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত করে তা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। ভাবের জগতে ঋণ গ্রহণ স্বাভাবিক, এবং সে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্যের ভাবসম্পদ কয়েকজন লেখককে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করলেও ইংরেজি পাঠক্রমের মাধ্যমে সাধারণ পাঠককেও তা স্পর্শ করেছিল। তা না হলে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত বাংলাসাহিত্য সমাদর লাভ করত না। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' শুধু মধুসূদনকেই প্রভাবান্বিত করে নি। সাধারণ পাঠকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানবার একমাত্র উপায় মিলটনের আদর্শে রচিত গ্রন্থের অভ্যর্থনা দেখে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জনপ্রিয়তা থেকে বাঙালি-পাঠকের মন যে সেদিন কোন্ দিকে ঝুঁকেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক অখ্যাতনামা লেখকও রচনার মধ্যে মিলটনের প্রতি আকর্ষণের ছাপ রেখে গিয়েছেন। যে-বছর 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয় সে বছরই বেরিয়েছিল তারিণীচরণ শর্মার 'রাবণের জীবনচরিত'।

১৯০৬-০৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের বাংলা বিভাগের পরিচালক ও প্রশ্নকর্তা ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের অনুরোধে সাহিত্য সম্পর্কে চারটি বক্তৃতা দেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে যে বক্তৃতা দেন তার বিষয় ছিল 'বিশ্বসাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার নামকরণ সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।"

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি তা প্রবন্ধের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে: "…পৃথিবী যেমন আমার খেত তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সম্পর্ক পৃথকভাবে দেখেন নি। তিনি জীবনকে সমগ্ররূপে দেখেছেন। "আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।"[৮]

---

৭ সাহিত্যবিচার : সাহিত্যের পথে

৮ বিশ্বসাহিত্য : সাহিত্য

সত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ তিন জাতের: বুদ্ধি, প্রয়োজন ও আনন্দের যোগ। "সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়…।" আনন্দের যোগ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্থাপন করা যেতে পারে। এটা প্রয়োজনের যোগ নয় বলেই স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবার আশঙ্কা নেই। "তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশেপাশেই একটা প্রয়োজন ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস।"

মানবপ্রকৃতির নিত্যকালীন আদর্শ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যেই যথার্থরূপে পাওয়া যায়। কেননা, আনন্দের সৃষ্টি স্বার্থকলঙ্কিত নয়। বিশ্বের মানুষকে জানতে হলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে, সাহিত্যই প্রধান উপায়। তাই বর্তমান জগতে বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সাহিত্য এবং শিল্পের, অর্থাৎ আনন্দ বা সৌন্দর্যের, মাধ্যমে মানুষে-মানুষে উদ্দেশ্যহীন যোগাযোগে লাভ কি? পরস্পরের মঙ্গলকামনাই হবে যোগাযোগের প্রধান লক্ষ্য। "কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে।…সৌন্দর্য-মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।"[৯]

সুন্দর ও মঙ্গল যেমন একার্থবোধক, তেমনি সুন্দর ও সত্য অভিন্ন। যা প্রকৃতই সুন্দর তা সত্য এবং মঙ্গলময়। সাহিত্য সত্যোপলব্ধির চিহ্ন। "জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কার-চিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।"[১০]

মহৎ শিল্প-সাহিত্যে সত্যের প্রকাশ ঘটে বলেই তার প্রভাব এড়ানো যায় না। বিশ্বসাহিত্যের জোর সেখানে। মুসলমান-আমলে আমরা সেমিটিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি। আবার বর্তমানে পাশ্চাত্যের ভাবধারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবকে ঠেকানো সম্ভব নয় এই জন্য যে, এর মধ্যে সত্যের জোর আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা

৯ সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

১০ সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনো মতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।"[১১]

নিরন্তর একের প্রভাব অন্যের উপর পড়ে সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের পাঠ আলোচনা ও প্রচার এই জন্যই প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমানবতা একার্থক। জীবন থেকে পৃথক করে সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি উৎসুক নন। মহৎ সাহিত্যে মানুষের সত্য-রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই বিশ্বসাহিত্যে ঘটে সত্যের মিলন। যেখানে অসত্য, সংঘাত সেখানেই দেখা দেয়। সকল দেশের সাহিত্যের সমষ্টি রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বসাহিত্য নয়। মহৎ সাহিত্যের সামগ্রিক রূপই বিশ্বসাহিত্য। এই সাহিত্য মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, তার অনুভূতির প্রসার ঘটায় এবং বিশ্বমানবতাকে এগিয়ে আনে। কিন্তু তাই বলে বিশ্বসাহিত্যই বিশ্বমানবতার একমাত্র পথ নয়। আমাদের শিল্প দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম সবই মানুষকে বৃহত্তর অনুভূতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়।"[১২]

---

১১ সাহিত্যসৃষ্টি : সাহিত্য

১২ শান্তিনিকেতন, ১০

'শেষ রবিরেখা'

অমিয়কুমার সেন

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর যাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছেন বা শান্তিনিকেতনে বড়ো হয়েছেন তাঁদের কাছে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ছিলেন সব সমাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগের মধ্যমণি। গুরুদেবের প্রথমজীবনের এই সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যাটি জীবনের প্রায় শেষ পর্বে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতে এসেছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলের মধ্যে দৈহিক ভাবে অবস্থান না করেও সেখানকার আত্মিক পরিবেশটি, হয়তো-বা নিজের অজ্ঞাতেই, তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে আজীবন লালন করছিলেন যে ওখানকার মাটিতে পা দেবা মাত্রই যেন তিনি তাঁর নিজস্ব জায়গাটিতে স্বাভাবিক মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। শান্তিনিকেতনেরও তাঁকে অন্তরঙ্গ করে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় নি। ভারতী - সবুজ পত্রের প্রখ্যাতা সহযোগী কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের পুরোগামিনী এই নারী তাঁর সুদীর্ঘ পোশাকী নাম পরিত্যাগ করে আটপৌরে 'বিবিদি' নামে শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া ইতিহাসের পাতায় অবলীলাক্রমেই চিরস্থায়ী স্থান করে নিলেন। 'বিবিদি'কে ছাড়া আজকের শান্তিনিকেতনকে ভাবাই যায় না। তাঁর এক প্রিয় ছাত্রী একদিন বলেছিলেন, "গুরুদেবকে আমরা ছোটোরা তো এত কাছাকাছি পাই নি, বিবিদিই আমাদের কাছে গুরুদেবের মতো ছিলেন।" শান্তিনিকেতনের পুরনো যুগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ কথার হয়তো তেমন তাৎপর্য নেই। কিন্তু এ যুগের ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরেই বলবে, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবকে ঘিরে অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছিল। গুরুদেবের শিষ্যা হিসেবে 'বিবিদি' তাঁদের সকলের চেয়েই পুরনো। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তাঁর আবির্ভাব সকলের শেষে। গুরুদেবের জীবন এবং সাধনা থেকে তাপ সংগ্রহ করে তাঁর এই শিষ্যেরা দীপশিখার মতো জ্বলে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি শিখা গুরুদেবের আগেই নিবে গিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণের পর কয়টি স্বল্পসংখ্যক শিখা শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে তখনও জ্বলছিল, 'বিবিদি'র ধ্যানের নূতন শিখাটি তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হল। এ শিখার স্বতন্ত্র বর্ণ শান্তিনিকেতনের একটি অধ্যায়কে নূতন উজ্জ্বলতা দিয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব শান্তিনিকেতনের উদার ক্ষেত্রে 'একনীড়' হয়ে মিলেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত-মন স্নেহের কাঙাল হয়ে যে মাতৃস্নেহের নীড় খোঁজে, কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা বুঝি তার থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের স্নেহশীলা গৃহবধূরা মাতৃস্নেহের এই ধারাটি সযত্নে অব্যাহত রাখার প্রয়াস করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সতীশচন্দ্রের জীবনদীক্ষা, অজিতচন্দ্রের সাহিত্য-সমীক্ষা, আচার্য ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরের শাস্ত্রানুশীলন, কালীমোহনের লোকসংযোগ, দিনেন্দ্রনাথের আনন্দময়তা এবং নন্দলালের সৃজনীশক্তির মধ্যে শান্তিনিকেতনের মনোজগতের বিভিন্ন ধারাগুলি যে-বৃহৎ এবং মহৎ আশ্রয় পেয়েছিল, শান্তিনিকেতনের মাতৃস্নেহ বুঝি তেমনি ব্যক্তিত্বপূর্ণ একটি মহান্ আশ্রয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে ছিল। গুরুদেবের মৃত্যুর পর সে আশ্রয় 'বিবিদি'র রূপ ধরে শান্তিনিকেতনে আবির্ভূত

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

জন্ম ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩

মৃত্যু ১২ অগস্ট ১৯৬০

হলেন। গত পনর বছর ধরে তাঁর এই মাতৃরূপিণী মূর্তিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে চিরজাগ্রত ছিল। মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের যে অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, বিবিদির উপস্থিতিতে সে অধ্যায়টি আবার নূতন করে পূর্ণ হল। তবু দুঃখ হয়, গুরুদেবের জীবিতকালে কেন 'বিবিদি' শান্তিনিকেতনে এলেন না।

২

যেমন অবলীলাক্রমে 'বিবিদি' শান্তিনিকেতনের একান্ত নিজস্ব স্থানটিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তেমনি অবলীলাক্রমেই তিনি ঠাকুরপরিবারের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঠাকুরপরিবার তথা বাংলাদেশের নবজাগরণের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের একটি যুগ শেষ হয়েছে।

সাহিত্য এবং সংগীত ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভার মতো, অভিনয়ে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। পাণ্ডিত্যও তাঁর কম ছিল না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার বহু শাখায় তাঁর অধিকার নিতান্ত নগণ্য নয়। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার কোন্‌টিতে তাঁর বেশি দক্ষতা ছিল বলা কঠিন। একবার যখন তিনি গুরুদেবের কয়েকটি গানের ইংরেজি তর্জমা করছিলেন তখন শ্রুতলিপি লিখে নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কি অনায়াসে তাঁর মুখ থেকে ইংরেজি বেরিয়ে আসে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় শ্রেণীর সংগীতেই তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। প্রথম-যুগের রবীন্দ্রসংগীতের তিনিই প্রায় একক ভাণ্ডারী ছিলেন। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সুরগুলি তাঁর শৈশবস্মৃতির মধ্যে বেঁচে ছিল। তা না হলে সেগুলির উদ্ধার হত কিনা সন্দেহ। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর অধিকার ছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী প্রথম চৌধুরীর অনেক লেখার তর্জমাও তিনি সুনিপুণ ভাবেই করেছেন। নিজস্ব মৌলিক রচনাসম্ভারও তাঁর কম নয়; তাঁর অনেকটা এখনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে; কোনো কৌতূহলী সংগ্রাহকের দৃষ্টি এখনও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি।

কিন্তু তাঁর প্রতিভার মহত্তম কীর্তি হল এই যে তিনি বাংলা তথা ভারতের ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রতিভাকে এবং সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্বর আর-একটি প্রতিভাকে লালন করেছেন এবং নানাভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন। তন্ময় চিত্তে নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করে তিনি এই কাজের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিদেশিনী ভক্তকে 'নিবেদিতা' নাম দিয়েছিলেন, ইন্দিরাদেবীকেও 'নিবেদিতা' নামটি বুঝি এমনি সুন্দরভাবে মানাত। এই আত্মনিবেদনের জন্য তাঁর নিজের প্রতিভার প্রতি তিনি হয়তো-বা কিছু অবিচারও করেছিলেন, কিন্তু আত্মনিবেদনের রূপটি তাতে স্নিগ্ধতায় মধুর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তিনি এক অক্ষয় বরও লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর প্রসঙ্গ অগণিত, সেখানে তিনি অমর হয়ে আছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'শিশু'র প্রতি স্নেহ এবং কৌতূহল প্রথমে জাগ্রত হয়েছিল ইন্দিরাদেবী এবং তাঁর অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে। তাঁর 'শিশু'-কবিতাগুলির জুড়ি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ। এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম উদ্দীপনার অন্যতম নায়িকা হিসেবে ইন্দিরাদেবী চিরস্মরণীয়া। ভ্রাতাভগ্নীর শৈশব-লীলাকে কবি সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তাঁদের প্রতি হৃদয়মন্থন করা আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন।—

ইহাদের করো আশীর্বাদ!
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

এই আশীর্বাদ ভ্রাতাভগ্নীর জীবনে বিশেষভাবে সফল হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা প্রাণের শুভ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, তাঁদের পার্থিব জীবনে নন্দনের সংবাদ কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

অচলশিখর ছোটো নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে—
যতদূরে যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক না'ই থাক
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস-ঝরনা।

কবির আশিস-ঝরনাও এঁদের প্রতি নিত্যকালের জন্য বর্ষিত হয়ে চলেছে।

'প্রভাত-সংগীত' কাব্য 'ইন্দিরাদেবী প্রাণাধিকাসু'কে উৎসর্গীকৃত। শৈশবলীলার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি যাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাবলারানী', হেসে যাঁকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কবির প্রাণের কথাগুলি 'চোখের জলে ভিজে-ভিজে' হয়ে যেত, পরিণত তাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি 'ছিন্নপত্র' রচিত হয়েছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে ইন্দিরাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি তাঁর মনের মর্মকথা স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন—

"তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্রভাব যে-রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি।...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা, সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেইজন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।...আমাদের সবচেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সবচেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; ...আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। ...তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তাহলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি। ...তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহত ভাবে প্রকাশিত হয়।"

এই উদ্‌ধৃতিটিতে কবির আত্মপ্রকাশের প্রেরণা রূপে ইন্দিরাদেবীর যে চিত্র আঁকা হয়েছে তার জন্য চিরকালের মতো তিনি শুধু যে গৌরবান্বিতা হয়েছেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের অগণিত ভক্ত পাঠকের তিনি গভীরতম কৃতজ্ঞতাভাজনও হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রগৌরবে গৌরবান্বিতা, বিশ্বের অগণিত পাঠকের অন্তরতম কৃতজ্ঞতার পাত্রী এই নারীর মনে তাঁর এই অসামান্যতার জন্য কখনও ন্যূনতম অভিমানও ছিল না। এই হয়তো তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রপ্রতিভার ঘনিষ্ঠসান্নিধ্যের পরিণত ফল রূপে প্রবীণা ইন্দিরাদেবীকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। একটি নীরব তপশ্চর্যার মতো তিনি তখন গুরুদেবের উত্তরাধিকার বহন করছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসার অল্প কিছুদিন পরে ওঁর স্বামী প্রথম চৌধুরীর মৃত্যু হয়। এই বিয়োগব্যথা বুঝি তাঁর চরিত্রে একটি নিঃসঙ্গতা দান করেছিল। নিয়তির নির্দেশে তাঁর দুটি প্রিয়তম ব্যক্তির একজনের জন্মদিন ও একজনের মৃত্যুদিনের আনন্দ ও বেদনাকে তাঁর একসঙ্গেই বহন করতে হয়েছিল। গুরুদেবের প্রয়াণের দিবস বাইশে শ্রাবণ ছিল প্রথম চৌধুরী মশায়ের জন্মদিন। বাইশে শ্রাবণের মন্দিরের উপাসনা থেকে ফিরে স্বামীর পুষ্পশোভিত প্রতিকৃতির সামনে তাঁকে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। আনন্দবেদনার অতীত সেই মূর্তিটি ইন্দিরাদেবীর জীবনের শেষ পরিচয় বহন করছে। ধনীর দুলালী ইন্দিরাদেবীর শেষজীবন দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটেছে। কিন্তু অন্তরের প্রসন্নতায় সে দারিদ্র্য মধুর। কবি পূর্বজীবনে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে'। কবিহীন শান্তিনিকেতনের অনেকাংশে স্থূল পরিবেশের মধ্যে ইন্দিরাদেবী এই 'অন্তরের শান্তিনিকেন'টিকে বহন করে এনেছিলেন।

রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রভাবধারার তন্ময়তায় তাঁর শেষজীবনটি একটি গভীর প্রণতির মতো ফুটে উঠেছিল। 'নটীর পূজা' নাটকের শ্রীমতীর মতো এ তন্ময়তার মধ্যেও কোনো একক অধিকারের অভিমান ছিল না। শ্রীমতীর মতো তিনিও যেন বলতে পেরেছিলেন, 'তিনি যদি আমার অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই।' রবীন্দ্রচর্যা তাঁর জীবনধারণের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো বুদ্ধদেব সম্বন্ধে শ্রীমতীর এই উক্তিটিও তাঁর মুখে এমনি মানত: 'তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ আমাদের সবারই জন্মোৎসব।'

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর তাঁর প্রতিভার বিচিত্র কিরণজাল বিভিন্ন আশ্রয়কে অবলম্বন করে আমাদের চোখের সামনে সুদূর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে কিছুকাল যেন অপেক্ষা করে ছিল। ইন্দিরাদেবীর বিয়োগে বুঝি 'শেষ রবি-রেখা'টিও অন্তর্হিত হল। কিন্তু একটি অমূল্য উত্তরাধিকার তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। শ্রীমতীর মৃত্যুর পর রানী লোকেশ্বরী বলেছিলেন, 'তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। এ আমার।'

ইন্দিরাদেবীকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ একটি ভূষণের আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন—

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ-জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ।

রবীন্দ্রভাবধারার এই বসনভূষণের উত্তরাধিকার ইন্দিরাদেবী আমাদের হাতেই দিয়ে গিয়েছেন। রানী লোকেশ্বরীর মতো আমরাও যেন বলবার যোগ্য হই, 'এ আমার'।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু : ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। মৃত্যুতারিখ ৭ অগস্ট : ২২ শ্রাবণ

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬ - ১৯০৮)

কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২ - ১৯৪০)

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৭৯ - ১৯৬০)

বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৮৭৮ - ১৯৬০)

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২ - ১৯০৪)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২ - ১৯৪০)

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪৮, গ্রে ষ্ট্রীট

১   ২৪শে ফাল্গুন [১৩০৬]

সুহৃদ্বরেষু,

ছবি কয়েক দিন হইল পাইয়াছি, চিঠি আজ পাইলাম। একখানি নূতন ছবি হইলে ভাল হইত, আপনি কলিকাতায় অত দিন থাকিবেন জানিলে তুলাইয়া লইতাম। কিন্তু আমাদের বড় তাড়া, যাহা পাইয়াছি তাহাতেই চালাইতে হইবে।

নিত্য প্রভাতে রবির উদয় এই ত জানি। যদি সে নিয়মের অন্যথা হয় ত রবির নামের সার্থকতা রহিল কি? প্রভাত নামটা বোধ হয় নানা দিক হইতে অর্থযুক্ত হইয়াছে। গল্প কোথায়? পরীক্ষার ভার আমার উপর নাকি? তাহা হইলে অবিলম্বে পাঠাইবেন। পরীক্ষা নিত্য, নিত্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে। আপনার কতকগুলি লেখা পাইলে অনেকটা ভরসা হয়। রমেশ বাবু বোম্বে চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্বে লেখা ও ছবি দুই দিয়া গিয়াছেন।

মাঘ মাসের প্রদীপ আজই পাঠাইতে কার্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া দিয়াছি। অন্তঃপুরের আদেশ পালন করিতে কোন মতেই বিলম্ব হইতে পারে না।

কাগজ বাহির হইবার পূর্বে একবার আপনার কাছে যাইব। পাবনায় কুটুম্ব একজন আছেন— সেখানেও একদিন যাইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কলিকাতা হইতে বাহির হওয়াই কঠিন।

প্রদীপকে শুধু উস্কান কেন, প্রদীপে নূতন সলিতা দিতে হইবে। দুই চারি মাস বোধ হয় সময় লাগিবে। গল্পটায় পাঠকরা আঘাত পাইয়া থাকিতে পারেন কিন্তু সম্পাদক খুন হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন।

আমি শূন্য ঘরে— অঁধেরেমে ঘট্‌তা হয় দিল্‌ মেরা— যাঁহাকে লইয়া ঘর তিনি ময়মনসিংহে। এই অবস্থায় যেমন কুশলে থাকা যায় সেইরূপ আছি।

আপনার বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র লিখিতেছেন ত? যিনি যেটুকু পারেন যেন সহায়তা করেন।

ভবদীয়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট

২   সোমবার

প্রিয়বরেষু,

আপনি আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। বয়সের হিসাবে অধৈর্য্য দোষের স্বীকার করি। কিন্তু যে দায়গ্রস্ত তাহার ধৈর্য্য কেমন করিয়া থাকিবে? প্রসারিত হাত কিছু না পাইলে চাঞ্চল্য যাইবে না।

প্রদীপে তৈলদান স্বরূপে আপনাকে ডাকিতেছি— পতঙ্গবৎ কেন? অবশেষে নির্বাণোন্মুখ প্রদীপে

কিছু তৈল দানং না হয়। তবে ভারতী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কোন কথা নাই। অর্ঘ্যভাগের দাবী করিতে পারিনা, কিন্তু দুই চারিটা উড়ো খই প্রদীপকে নমঃ বলিয়া দিবেন না ?

আর একটা অনুরোধ। মাঝে মাঝে প্রদীপ সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে যদি আপনার অভিমত আমাকে লিখিয়া পাঠান ত আমার নিজের বড় উপকার হয়। আমি এ কার্য্যে নবদীক্ষিত, আপনি প্রবীণাচার্য্য।

বিরহের অবস্থা সেইরূপ। একটা গুরুতর রকম বিরহোচ্ছ্বাসের ইচ্ছা প্রবল কিন্তু অবকাশ হয় না।

আপনার তটিনীকলমুখরিত পল্লীভবনের বড় প্রলোভন দেখাইয়াছেন। সে প্রলোভনও আমাকে স্মরণ করিতে হইতেছে।

ভবদীয়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩

বান্দোরা
বোম্বাই
২৩শে মার্চ ১৯৩২

প্রিয়বরেষু,

এবার এলাহাবাদে গিয়ে জানতে পারলুম Sheaves তোমাকে পাঠানো হয়নি। একখানি এখন পাঠাই। Sheaves আমেরিকায় ম্যাকমিলানও ছেপেছে। তোমাকে পাঠিয়েছে কি ? না পেয়ে থাক তাহলে আমি পাঠিয়ে দেব।

তোমার আর কতকগুলি কবিতা Lays & Lyrics নাম দিয়ে আমি তর্জমা করেছি। সে সম্বন্ধে ম্যাকমিলানের সঙ্গে লেখালেখি হয়েচে। সেখানিও তারা ছাপছে।

মাস নয় দশ আমি কিছুই করতে পারিনি। প্রথমে আমার অসুখ, তারপর আমার ছোটছেলের কঠিন ব্যারাম। এলাহাবাদ থেকে তাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে আমি এখানে ফিরে এসেছি। তোমার নতুন কোন বই যদি তর্জমা না হয়ে থাকে তাহলে আমি না হয় একবার চেষ্টা করি। আমার নিজের লেখা বইও ম্যাকমিলানরা দেখতে চেয়েছে।

এখন তোমার শরীর সুস্থ ত ?

তোমাদের
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পত্র ১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসর-গ্রহণান্তে নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ'-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ফাল্গুন ১৩০৬ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭— এই চার মাস নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ' সম্পাদনা করেন। ১৩০৭ সালের প্রথম দিকে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'প্রভাত' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। —দ্র° সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৬৬ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র ২ ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও আশ্বিন সংখ্যা 'প্রদীপ 'পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যথাক্রমে এই দুইটি গল্প প্রকাশিত হয় : 'সদর ও অন্দর' এবং 'শুভদৃষ্টি'। —দ্র° শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প" গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কৃত তথ্যপঞ্জী।

পত্র ৩ *Sheaves* : Poems and Songs by Rabindranath Tagore, Selected and Translated by Nagendranath Gupta। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত Rabindranath Tagore : the Man and the Poet শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ সংযুক্ত।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৬১ - ১৯৪০

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু ও গুণগ্রাহী সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রায় ষাট বছরের সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সে যুগের পত্রপত্রিকার অন্তরালে নগেন্দ্রনাথের ইংরেজী-বাংলা বহু রচনা আত্মগোপন করে আছে। সেকালে তিনি কথাশিল্পী হিসাবেই প্রধানত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগের ছোটগল্প লেখকদের মধ্যেও নগেন্দ্রনাথ অন্যতম।[১] কথাসাহিত্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে তিনি কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু 'স্বপন-সঙ্গীত' (১৮৮২) ছাড়া আর-কোনো কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয় নি। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সাহিত্যসমালোচনা, সরস লঘু রচনা ও বহু সাময়িক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী ও রামেশ্বরের 'সত্যপীরের কথা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি রচনাতেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিণত বয়সে তিনি নিজের ও সমকালীনদের যে স্মৃতিকাহিনী রচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য আজ অবশ্যস্বীকার্য।[২]

নগেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনীর দু-একটি সূত্রের সন্ধান নিতে হবে। তাঁর পিতা মথুরানাথ বিহারে সবজজ ছিলেন। তাই তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে বিহারের বিভিন্ন স্থানে। নগেন্দ্রনাথের কর্মজীবনও বিচিত্র। বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই তিনি করাচির 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক হন। সাত বছর পর তিনি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে 'ট্রিবিউন' ছেড়ে তিনি পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। একই সময়ে তিনি 'প্রভাত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পিপল্' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনাভার গ্রহণ করার জন্য আহূত হন। চার বছর পর 'ইণ্ডিয়ান পিপল্' যখন দৈনিক 'লীডারে'র সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন তিনি যুগ্মসম্পাদক রূপে পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি

১ 'ভারতী' পত্রিকার চল্লিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন: "ভারতীর অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের "ঘাটের কথা" বাহির হয়। তাহার ভিতরে ছোটগল্পের যথেষ্ট লক্ষণ আছে। পর বৎসরে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের 'সুলোচনা' একটি চমৎকার ছোট গল্প। তাহার পর অন্য কোন মাসিকপত্রে ছোটগল্প বাহির হইবার আগে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির ছোটগল্প "ভারতী"তে বাহির হইয়াছে।"— ভারতীর ইতিহাস, বৈশাখ ১৩২৩।

২ রচনাগুলি ১৯২৭-৩০ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের মৃত্যুর সাত বছর পর *'Reflections and Reminiscences'* নাম দিয়ে বোম্বাই থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য আছে।

দ্বিতীয় বার 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগ দেন। কিছুকাল তিনি লাহোরের 'পঞ্জাবী' পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন।[৩]

বাংলাদেশের বাইরে সাংবাদিক হিসাবেই নগেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর খ্যাতি প্রধানত সাহিত্যিক হিসাবেই। অল্পবয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়। কবি বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সতীর্থ। নগেন্দ্রনাথের খুল্লতাত-পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে বলেছেন, "মেজদার সঙ্গে প্রিয়বাবুর বাড়ী অনেকবার গেছি। মেজদা তাঁর কাছ থেকে কত বই যে এনে পড়তেন তার আর ঠিকানা নাই। মেজদার পড়ার বাইটা অসামান্য ছিল।‥আর এই সময় অনেকবার জোড়াসাঁকোর রবিবাবুদের বাড়ী যেতেন। আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতাম। মেজদা ও রবিবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল।"[৪] রবীন্দ্রনাথের বিবাহে যে কজন বিশিষ্ট বন্ধু উপস্থিত হয়েছিলেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।[৫] 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সে কালে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, নগেন্দ্রনাথ তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাবিত্রী লাইব্রেরির বিভিন্ন অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। তাঁর রসবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের কতখানি আস্থা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি থেকে :

> Rabindranath frequently read out his freshly composed poems to come. Once he brought out one of his best known dramas, which he had just written, and we read it together. The final incident of the play did not seem to me to be in keeping with the spirit of the drama and I told him so. He said his 'Bara Dada' was of the same opinion, and he changed the concluding part before sending the manuscript to the press. [৬]

২

'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকা অবলম্বন করেই নগেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ফিনিক্স পত্রিকার সম্পাদনাভার নিয়ে যখন তিনি করাচিতে যাত্রা করেন, তখনও পত্রিকা-দুটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে উক্ত দুটি পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর যে দুখানি চিঠি প্রকাশিত হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথই আলোচনার সূত্রপাত করেন তাঁর 'বর্ষার চিঠি'[৭] চিঠিখানিতে :

---

৩ নগেন্দ্রনাথের জীবনীর মূলসূত্রগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৬৬সংখ্যক গ্রন্থ ও নগেন্দ্রনাথের স্মৃতি-কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে।

৪ সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬৬, পৃ: ৬৬-৬৭ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ "I was present at Rabindranath's marriage. He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married." —*Reflections and Reminiscences*, p. 62. একই চিঠি প্রিয়নাথ সেনও পেয়েছিলেন। ব্লক করা পত্রখানি ১৩৫০ সনের বৈশাখ মাসের বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬ *Reflections and Reminiscences*, p. 62.

৭ বালক, শ্রাবণ ১২৯২।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"সুহৃদ্বর, আপনি ত সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে বাস করচেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদ্‌লাটা কল্পনা করুন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যময় ভাষায় বাংলাদেশের বর্ষার একটি অপরূপ ছবি এঁকেছেন। পরের মাসেই নগেন্দ্রনাথ চিঠিখানির উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর গদ্যরীতি যে কতখানি সহজ ও স্বচ্ছন্দ তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বন্ধুর জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখেছেন, "দেশের বর্ষা মনে পড়ে বই কি! চারিদিকে সব ভিজে ভিজে, মনটার যেন ভিজে ভিজে ভাব। বাড়ীর উঠানে শ্যাওলা, দেওয়ালের রং ধুয়ে আর এক মূর্তি ধারণ করেছে। ঘরের ভিতর জিনিষপত্রগুলতে ছাতা ধরেছে, বাড়ীর ঝি বউ, ছেলেপিলে, দাসদাসী আনাগোনা করতে দুমদাম্ করে আছাড় খাচ্চে, তারপর চুন-হলুদের পালা!"[৮] বাংলাদেশের বর্ষাচিত্রের এই নিপুণ বর্ণনার পর তিনি করাচির সমুদ্রতীরের বর্ণনা দিয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে চিঠিখানির শেষাংশে। কলকাতা ও করাচির দৃশ্যপট বর্ণনার পর তিনি বর্ষার যে ভাবরূপ আবিষ্কার করেছেন, তাতে তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ গভীরাশ্রয়ী কবিমন এক নিবিড় রসানন্দে উদ্ভাসিত হয়েছে। আলোচ্য পত্রাংশটি উদ্ধৃতির যোগ্য—

"বর্ষার সময়টা সব কিছু ঘরের ভিতর আসে। রূপকথা বর্ষার সময় শুনিতে যেমন ভাল লাগে এমন আর কোন সময় নয়। আপনার যা কিছু আছে বর্ষার কাছে আনিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে সবাই মিলিয়া ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া বাহিরে বৃষ্টি দেখি। প্রবাসী বর্ষাপ্রারম্ভে ঘরে ফিরিবে, কতকাল ধরিয়া এ নিয়ম রহিয়াছে। বসন্তের বিচ্ছেদ কবিরা বলেন গুরুতর, কিন্তু বর্ষার বিচ্ছেদ আরও কঠিন। একটা গান আছে: 'সঁইয়া ঘর না আয়ে বরষ গয়ে বদরা'। 'সঁইয়া' কি শুধু প্রণয়ী! আমার তো এমন বোধ হয় না। নইলে সঁইয়া কাছে থাকিলেও বর্ষার সময় ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করে কেন? তা নয় 'মেঘলোকে ভবতি সুখিনোপ্যথাবৃত্তি চেতঃ'। যে যেখানে আপনার কাছে সকলকে একত্রে জড় করিতে ইচ্ছা করে, সকলে বসিয়া ছেলেবেলাকার গল্প করিতে ইচ্ছা করে, কে কয়বার বৃষ্টিতে স্নান করিয়াছিল, কে কয়বার শিল কুড়াইয়া খাইয়াছিল, কে কয়বার আছাড় খাইয়াছিল, তাহার হিসাবে আবার নূতন করিয়া করিতে ইচ্ছা করে।"[৯]

'বালক' পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথের আর-একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিতে সিন্ধুদেশের প্রকৃতিচিত্র ও 'লোকাল্ কালার' বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।[১০] নগেন্দ্রনাথ ইংরেজি বাংলায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনাও করেছেন। Rabindranath Tagore: The Man and the Poet প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা।[১১] এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির প্রথমার্ধে তিনি রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তিনি 'উর্বশী' কবিতা অবলম্বন করে রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি মূলসূত্রের সংকেত দিয়েছেন। উর্বশীর পৌরাণিক উপাখ্যানকে কবি কিভাবে নবরূপ দিয়েছেন, তাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদের মধ্যেও অনুবাদকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদটি শুধু মূলানুগই নয়, মূল

৮ প্রবাসের চিঠি: বালক ১২৯২ ভাদ্র।

৯ পূর্বোল্লিখিত পত্র।

১০ করাচির চিঠি: বালক ১২৯২ মাঘ।

১১ Modern Review, July, 1927.

বাংলা কবিতার ছন্দ ও ধ্বনিও এখানে অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে। কবিতাটির অনুবাদ যে কত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল তা একটি উদাহরণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়:

Like a flower without a stem blooming in itself,
When didst thou blossom Urvasi?
Out of the churned sea thou didst rise
in the primal spring-morn
With the chalice of ambrosia in thine right hand,
the poison cup in thy left;
Like a serpent charm-stilled the mighty
ocean wave-tost
Sank at thy feet bending its million having hoods
In obeisance.
White as the *Kunda* flower, in beauty undraped,
the lord of the Gods bowing before thee
Fair Art thou![১২]

নগেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনা করেন (১৯০৯)। একাধিক রচনায় তিনি বৈষ্ণবকবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসংযোগের কথা আলোচনা করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "কিশোর বয়সে, তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] প্রতিভার উন্মেষের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বটতলার পুঁথি লইয়াই তিনি পদকল্পতরু পড়িতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন দত্ত 'মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে' পাইয়া ইংরেজি রচনার ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের জহুরি। তিনি চিনিয়াছিলেন খনির সর্বশ্রেষ্ঠ মণি বৈষ্ণব কবিতা।"[১৩]

পরিণতবয়সে নগেন্দ্রনাথ 'প্রভাত' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন।[১৪] এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প ও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[১৫] চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যখন বাদানুবাদ শুরু হয় তখন নগেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের পক্ষেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। ১২৯৯ সালের শ্রাবণ মাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং

১২ 'উর্বশী' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ।

১৩ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা: প্রবাসী ১৩২৯ আষাঢ়।

১৪ "Among my contributors were Romesh Chandra Dutt and Rabindranath Tagore"

১৫ বন্ধুর আগ্রহে ও অনুরোধে দুটি প্রবন্ধও দিয়াছিলেন— 'তৈলাক্ত শিরে তৈল সেক' (? শ্রাবণ) ও 'চুম্বক কৌশল' (ভাদ্র)। আমাদের মতে এই 'প্রভাত' কাগজে কবির তিনটি গল্পও প্রকাশিত হয়। সেই তিনটি গল্প হইতেছে 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'উলুখড়ের বিপদ' ও 'প্রতিবেশিনী'। — রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭, পৃ ৪৪৯ : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,

ছট্' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু। এরূপ লেখা তাঁহার উচিত হয় নাই।"[১৬] রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, "হিং টিং ছট্ নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখন উদিত হইতে পারে, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।"[১৭]

৩

নগেন্দ্রনাথের রচনাবলীর বৈচিত্র্য কম নয়। কবিতা উপন্যাস ছোটগল্প নাটক রসরচনা ও বিবিধ গদ্যরচনা, সাহিত্যের নানা বিভাগেই তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু সে যুগে তিনি কথাশিল্পী হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী বন্ধু হলেও নগেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রযুগের কথাসাহিত্যিক বলা যায় না। চরিত্রধর্মের দিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি বঙ্কিমপর্বেরই অনুগত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্সের বর্ণবৈচিত্র্যে বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নূতন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তুললেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধানত দুটি লক্ষ্য ছিল। তাঁর ইতিহাস-সচেতন মন সে যুগের স্বল্প ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যেও সত্যানুসন্ধান করেছিল। দ্বিতীয়ত, বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ইতিহাসের চঞ্চল প্রবাহ সঞ্চারিত করে তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও গতিবেগ এনেছিলেন। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিক রোমান্সের সমন্বয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে এক নূতন সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও অন্তর্জীবনচিত্রণ প্রধান স্থান অধিকার করেছে। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের একটি তৃপ্তিদায়ক ফর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই প্রথম পাওয়া গেল।

বঙ্কিম-অনুবর্তী ঔপন্যাসিকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাকেই প্রধানত মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। কদাচিৎ তাঁদের রচনায় মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিম-উপন্যাসের অক্ষম অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও প্রায় পঁচিশ বছর অব্যাহত থাকে। বঙ্কিম-অনুবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত— প্রমুখ ঔপন্যাসিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু সাধারণ ধর্মের দিকে অনেকখানি মিল পাওয়া যায়।

নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। এই যুগের ঔপন্যাসিকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে সুলভ রোমান্টিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। অতিরিক্ত রোমান্স-প্রবণতা, আকস্মিকতা, অতিনাটকীয়তা, গোয়েন্দা-কাহিনী-সুলভ ঘটনার অনাবশ্যক জটিলতা এ যুগের উপন্যাসের কয়েকটি দুর্লক্ষণ। সামাজিক উপন্যাসও রেহাই পায় নি। সমাজ-জীবনের সঙ্গে অলৌকিক ও উদ্ভট কাহিনী মিশিয়ে রোমান্স-রস পরিবেশন করা

১৬ তর্কবৈচিত্র্য: সাহিত্য ১২৯৯ ফাল্গুন।

১৭ রবীন্দ্রবাবুর পত্র: সাহিত্য বৈশাখ ১৩০০। ১২৯৯ সালে চৈত্র মাসের সাধনায় কবি এ সম্পর্কে আর একবার জবাব দিয়াছিলেন।

হয়েছে। বাস্তবজীবনের সহজ রূপটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে নি। খুন-জখম ও ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর কাহিনী সামাজিক উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক হতে দেয় নি। তা ছাড়া নীতিধর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা অধিকাংশ উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করেছে।

নগেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস পর্বতবাসিনী (১৮৮৩)। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোনো জনশ্রুতি অবলম্বন করে কাহিনীটি রচিত হয়েছে। মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে ভূমিকা হিসাবে 'আভাস' অংশটি সংযোজিত হয়েছে। পার্বত্য পথে একজন বিদেশী পর্যটককে একজন পর্বতবাসী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। পর্বতবাসীই বিদেশীকে তারাবাইয়ের প্রেতাত্মা দেখিয়েছে: "আমরা গল্প শুনিয়াছি, সে ঐ পাহাড়ে বাস করিত। অদ্যাবধি তাহার প্রেতাত্মা বিচরণ করে।" কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে বিদেশী পথিক বা পর্বতবাসীর কোনো যোগ নেই— এমনকি মূল কাহিনী উত্তমপুরুষেও বর্ণিত হয় নি।

তারাবাই রঘুজী শম্ভুজী ও গোকুলজী— প্রধান চরিত্রগুলির কেউই জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। তারাবাই কাহিনীর নায়িকা, কিন্তু তার চরিত্রে সংগতির অভাব আছে। তার পুরুষোচিত দৃপ্তভঙ্গি, নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসাস্পৃহা ও প্রণয়াবেগের মধ্যে সন্তোষজনক সমন্বয় অনুপস্থিত। রঘুজী-চরিত্র সবচেয়ে অস্বাভাবিক, সে যেন মূর্তিমান নিষ্ঠুরতা। কোনো মানবীয় অনুভূতি তার চরিত্রে নেই। এমনকি একমাত্র মাতৃহারা কন্যা তারার প্রতিও সে একাধিকবার কারণে অকারণে নির্মম ব্যবহার করেছে। এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই— নির্মমতার জন্যই নির্মমতা। তারাবাই-গোকুলজীর প্রেমকাহিনীও রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুলতায় আচ্ছন্ন। হৃদয়-বিশ্লেষণের চেয়ে বাইরের ঘটনারই প্রাধান্য। মহাদেব ও মায়ীর চরিত্র অপ্রধান হলেও জীবন্ত।

নবম পরিচ্ছেদে তারার স্বপ্নকাহিনী উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নির্বাসিতা তারা নিদ্রিতাবস্থায় তার অশুভ ভাবী জীবনের নির্মম পরিণতি দেখেছে। শৈলশিখরের তুষারচক্ষু জটাধারী মহাকায় পুরুষ ও তুষারনয়না সপ্ত পাষাণসুন্দরীর অমোঘ নির্দেশ নববিবাহিতা তারার জীবনকেও এক রহস্যগূঢ় মৃত্যুশীতল পাষাণতটে নিক্ষেপ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন-কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন তাদের ভাবী পরিণতিরই অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু দু' ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নকাহিনীকে শুধু বহির্ঘটনা হিসাবেই স্থাপিত করেন নি, ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে স্বপ্নকাহিনীর একটি নিগূঢ় সংযোগ দেখিয়েছেন।[১৮] কিন্তু তারাবাইয়ের স্বপ্নটি নিতান্তই বাইরের ঘটনা। এর সঙ্গে তার মনোজীবন বা ঘটনাবৃত্তের কোনো যোগ নেই। পর্বতবাসিনী তারার মনোবিকার ও পার্বত্য প্রদেশের ভীষণ-রমণীয় বর্ণনা চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিনীর নরকদর্শন অধ্যায়গুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত।

---

১৮ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনামায় বঙ্কিমচন্দ্র বায়রন থেকে একটি চরণ উদ্ধার করেছেন— "I had a dream which was not at all a dream."

৪

নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'অমরসিংহ' (১৮৮৯) সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাসের চেয়ে দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি অনেকখানি পরিণত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাসটির আশ্রয় বিশুদ্ধ রোমান্স, চরিত্রগুলি প্রাণহীন কাঠের পুতুল। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস সম্পর্কে ঠিক সে কথা বলা যায় না। সে যুগের জনশ্রুতি-কিংবদন্তী-জড়িত ঐতিহাসিক বিবেকবর্জিত রোমান্টিক কাহিনীগুলির তুলনায় 'অমরসিংহ' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি ও উপকথা অবলম্বন করে কাহিনীর কোনো কোনো অংশ রচিত হলেও মূল কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে ইতিহাসের খুব বেশি পার্থক্য নেই। নগেন্দ্রনাথ বাল্য-কৈশোরে আরায় যে বাড়িতে ছিলেন, সে বাড়ি ছিল সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বাবু কুমার সিংহের।[১৯] উপন্যাসটির উপকরণ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য :

Most enthusiastic were the stories about Amar Singh, a younger brother of Babu Kumar Singh. . . He was in the habit of neglecting his position and family and wandering about in the company of sadhus. But the mutiny made him a hero, and his dash and élan in every fight were recounted with epic fervour. According to every account that I heard, Amar Singh performed prodigies of valour, and escaped to Nepal when the mutiny was suppressed. The exploits of Amar Singh so impressed my youthful imagination that several years later I wrote a story in Bengali of the Mutiny bearing his name.[২০]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে 'অমরসিংহ' উপন্যাসের স্বরূপ-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক সুকৌশলে ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে জনশ্রুতি ও কাল্পনিক কাহিনীর সমন্বয় করেছেন। সেই প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুধু জগদীশপুরেই নয়, শাহাবাদ জেলায় তথা সমগ্র বিহারে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক সিপাহী-বিদ্রোহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তাতে সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের লেশমাত্রও নেই। সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "সিপাহী-বিদ্রোহের মূলে স্বদেশানুরাগ বা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, যুদ্ধধর্ম প্রতিপালন করে নাই। বৃদ্ধ, রমণী, বালক যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত; শুধু ফিরিঙ্গী নহে, স্বদেশীয়রাও তাহাদের হাতে নিস্তার পাইত না।" সিপাহীদের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্যও ছিল না: "যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা কেন যুদ্ধ করে তাহা জানে। সিপাহীরা তাহা জানিত না। তাহারা জানিত যে, ইংরাজ নির্মূলে ধ্বংস হইলে দিল্লীর বাদশাহ পুনরায় ভারতবর্ষের সম্রাট হইবেন। দিল্লীর বাদশাহের নামেই তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা জানিত না যে, মোগলের সৌভাগ্যসূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে।"

১৯ "The house in which we lived at Arrah originally belonged to Babu Kumar Singh, the well-known leader of Indian Mutiny in Bihar."—*Reflections and Reminiscences*, Page 16.

২০ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৯।

কমিশনার টেলার সাহেবের দুরভিসন্ধিময় প্রস্তাবে কুমার সিংহের ভীষণ শপথ, অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর বর্ণনা, আরার উপকণ্ঠে ইংরেজ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়, বিবিগঞ্জে কৃষ্ণবর্মাবৃত অমরসিংহের দুঃসাহসিকতা, লরার সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি থেকে তার পলায়ন, জগদীশপুরের অরণ্যে কুমারসিংহের মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা লেখকের বর্ণনাকৌশলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার এই বেগদৃপ্ত প্রবাহের মধ্যে পারিবারিক জীবন সহজেই গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু অমরসিংহের পারিবারিক জীবনের যেটুকু পরিচয় আছে তা যেমন সুকুমার তেমনি রসোজ্জ্বল। রাণী, লছুমী ও ইংরেজ তরুণী লরা— এই তিনজন নারীর জীবন অমরসিংহকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়েছে। বিধবা লছুমীর দৈবাহত চরিত্রটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তার চোখের সম্মুখে প্রেমের যে উৎসব চলেছে সেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই। অমরসিংহের প্রতি তার মনোভাবকে লেখক বিশ্লেষণ করেন নি, একটি অস্পষ্ট বাসনার মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছেন। লরার নীরব ভালোবাসা প্রেমের সমুন্নত মহিমায় উজ্জ্বল। ফুলশাহের অলৌকিক ক্ষমতা ও বাঁশুরিয়া বাবার রহস্যময় বংশীধ্বনি উপন্যাসটির মধ্যে রোমাঞ্চরস সঞ্চারিত করেছে। অমরসিংহ উপন্যাসে লেখক পরিণত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'লীলা' (১৮৯২) সে যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[২১] উপন্যাসটির মধ্যে কোনো কেন্দ্রসংহতি নেই। লীলার নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ হলেও তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায় না। সুরেশচন্দ্র-কিরণবালার দাম্পত্য জীবন ও ঘরগৃহস্থালীর বর্ণনা উপন্যাসের একটি বিস্তৃত স্থান অধিকার করেছে। গণেশচন্দ্রের উপকাহিনীকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। বিধবা লীলার চরিত্রে কোনো বিশ্লেষণ নেই। লীলার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে সুদীর্ঘ বর্ণনার সাহায্যে ভরে তোলা হয়েছে। এইসমস্ত অংশ উপন্যাসিকের বিশ্লেষণের চেয়ে কবিকল্পনারই অধিকতর অনুগত। মোটকথা, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 'লীলা' উপন্যাসে তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না।

নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'তমস্বিনী' (১৯০১) উপন্যাসটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে লেখক অবৈধ প্রণয়ের একটি উন্মুক্ত বাস্তব মূর্তি উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। 'তমস্বিনী' উপন্যাসের ঘটনা জটিল। ঘটনার জটিলাবর্তের মধ্যে কাহিনীর কেন্দ্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অনেকগুলি 'এপিসোড' এখানে ভিড় করে এসেছে, কাহিনীর দিক থেকে তাই সমগ্রতার অভাব সহজেই চোখে পড়ে। উপন্যাসটির পটভূমিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা। তখনো সম্পন্ন পরিবারের বিশেষ বিশেষ কক্ষ বেলোয়ারি

---

২১ "ভারতীর মধ্যস্থতায় ও সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য যেসকল রত্ন লাভ করিয়াছে এবং যেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে অল্পবিস্তর আন্দোলনের সূত্রপাত অথবা লেখককে সাধারণের সহিত পরিচিত করিয়াছিল, এখানে তাহার একটি অসম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ তালিকার স্থানাভাব) তালিকা দিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউঠাকুরাণীর হাট, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহের পদাবলী, চিরকুমার সভা, নষ্টনীড় ও গদ্যে-পদ্যে বিবিধ রচনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাসই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'লীলা' ও ছোট গল্প।"— হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভারতীর ইতিহাস প্রবন্ধের পাদটীকা। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ।

ঝাড়লণ্ঠনে আলোকিত হত, মদ্যপান ও বাইনাচ নৈশবিলাসের অঙ্গীভূত ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচিত্র ধর্মসংকট উপস্থিত হয়েছিল উপন্যাসে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়—

"হরিচরণবাবুর এক ছেলের ধর্মের প্রতি কিছু অনুরাগ হইয়াছিল। কেহ বলিত ব্রাহ্ম হইবে, কেহ বলিত খৃষ্টান হইবে। তাহা শুনিয়া জাতিভয়ে পরমহিন্দু হরিচরণ ছেলেকে ডাকাইয়া অনেক রকম শাসাইয়াছিলেন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন পর্যন্ত বলিয়াছিলেন। ছেলে উত্তরে একটি কথাও বলিল না, কিন্তু পিতৃবাক্যও শুনিল না, পূর্বে যেমন যেখানে ইচ্ছা যাওয়া-আসা করিত, সেইরূপ করিতে লাগিল।"

রমানাথের দুষ্ট সংসর্গে রজনীকান্ত যে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হল, লেখক তার বিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু একটি চিত্র ছাড়া এর অন্য-কোনো মূল্য নেই। রজনীকান্ত, নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলাল নয়। তার কোনোকালেই যে চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল, কোনো প্রমাণ নেই। তাই পাপের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সে পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পিতার কড়া শাসন তার আত্মবিকাশের অন্তরায় হয়েছিল। বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কোনোটিই তার ছিল না। তাই পাপের প্রবাহে যখন সে গা ভাসিয়ে দিল, তখন তাকে রোধ করার মত কোনো শক্তিই তার ছিল না। নগেন্দ্রনাথের বা গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ, তাই পাপের বিরুদ্ধে তাঁরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের পদস্খলনের প্রতিটি ধাপ ও কার্যকারণ সম্পর্কগুলিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তাঁদের পতনের মধ্যেও একটি ট্র্যাজিক মহিমা আছে। আর উচ্ছৃঙ্খল রজনীকান্তের পরিণতি পাঠকচিত্তে কোনো সহানুভূতিই জাগায় না।

স্বর্ণময়ী ও হেমন্তকুমারের সমাজবিগর্হিত প্রণয়কাহিনীকে লেখক খুব জোরালো করার চেষ্টা করেছেন। হেমন্তকুমারের প্রতি স্বর্ণময়ীর অনতিস্ফুট অনুরাগ স্বামী কান্তিচন্দ্রের উৎপীড়নে ও অত্যাচারে যে কিরূপে প্রণয়াবেগে পরিণত হয়েছে, লেখক তার মোটামুটি সন্তোষজনক চিত্র এঁকেছেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি। হেমন্তকুমারের সঙ্গে স্বর্ণময়ী গৃহত্যাগ করেছিল। নগর থেকে বহুদূরে একখানি বাগান-বাড়িতে তাদের বর্তমান বাসস্থান। অবস্থাগত সাদৃশ্যের দিক থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের চিত্তবিকারের যে স্বল্পসংক্ষিপ্ত আভাস দিয়েছেন তা যেমন সংযত, তেমনি সংগত। শীর্ণশরীরা চিত্রা নদী, পুরনো নীলকুঠির গ্লানিময় ইতিহাস, বিলাসিনী রোহিণীর সংগীতশিক্ষা ও অন্যমনস্ক গোবিন্দলালের নভেল পড়া—সব কিছু-মিলে একটি অশুভ ছায়া বিস্তার করেছিল। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রেমে যে ভাঁটা পড়েছিল তা উপলব্ধি করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু হেমন্তকুমারের পরিবর্তন তুলনায় অনেকখানি আকস্মিক। লেখক অবশ্য একটি কারণ দেখিয়েছেন, "যখন স্বর্ণময়ীকে পায় নাই, তখন সমাজের উপর খড়্গহস্ত। যদি স্বর্ণময়ীকে পাইল ত সমাজের কণ্ঠলগ্ন হইবার জন্য উৎসুক।" গোবিন্দলালের তুলনায় হেমন্তকুমার সুবিধাবাদী ও হৃদয়হীন ক্ষণসুখবিলাসী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্যামার কাহিনীকে নিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া চলত। কিন্তু লেখক কিশোর বৈকুণ্ঠ ও শ্যামার সম্পর্ককে আকস্মিকভাবেই শেষ করেছেন। যদি পূর্ণ রূপ দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য না হত, তা হলে এ কাহিনীর অবতারণা করলেন কেন? 'তমস্বিনী' উপন্যাসের মৌলিক দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি লিখেছেন—

"নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realismএর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে।... নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি ক'রে করেছেন। ফর্ ইন্‌ষ্টান্স, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন?... এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি ভাল ক'রে গোপন করতেও পারেন নি।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। উপন্যাসটিতে লেখক অনেকগুলি উপকাহিনী এনেছেন, কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জেগে আছে। 'তমস্বিনী' উপন্যাস না হয়ে চিত্রসমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লেখক গোবিন্দচন্দ্রের মুখ দিয়ে নীতিকাহিনী শুনিয়েছেন।

'তমস্বিনী'র প্রায় বিশ বছর পর 'জয়ন্তী' (১৯২৯) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাসের মত এই উপন্যাসখানিও বিশুদ্ধ রোমান্স। বাদশাহের নাম আলমগীর, কিন্তু তিনি ঔরংজেব নন। সম্রাটের মৃত্যুশয্যায় যে দু জন বাদশাজাদা সিংহাসন নিয়ে কলহ করেছেন তাঁদের নাম হাতেম ও রুস্তম। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ক্ষীণ প্রভাব আছে। প্রজারা যাতে উৎপীড়িত না হয় এজন্য এক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় নি। এই সমিতির নেতা গৌরীশংকর সবজান্তা সর্বশক্তিমান পুরুষ, তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। জয়ন্তীর উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের শান্তি ও প্রফুল্ল চরিত্রের প্রভাব আছে। বিহারীলালের সহচর পুণ্ডরীক দিগ্বিজয় (মৃণালিনী) ও মাণিকলালের (রাজসিংহ) বিচিত্রমিশ্রণে রচিত হয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোলের সীমার বাইরে এ এক উদ্ভট রোমান্স লোকের কাহিনী! 'আরাতামা' (১৯৩০) বিলাতি রোমান্সের অনুসরণে রচিত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথের শেষজীবনের উপন্যাসের মধ্যে 'ব্রজনাথের বিবাহ' (১৯৩১) অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক। শতাধিক বছর আগের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তখনকার দিনে পথঘাট বিপদসংকুল ছিল। জমিদারেরা দিনে জমিদারী ও রাত্রিতে ডাকাতি করতেন। চুরি ডাকাতি ও উত্তেজনাময় দৃশ্য সত্ত্বেও কাহিনীর স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়ও ব্যাহত হয় নি—মিলন-মধুর প্রসন্নতায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। রাধানাথ ঠাকুর ও হরেরাম সর্দারের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'স্বাগতা' (প্রবাসী, আষাঢ়-চৈত্র ১৩৩৯) আগাগোড়া রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত। গোয়েন্দা-কাহিনী-সুলভ অপরাধীর অনুসন্ধান উপন্যাসের অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে।

৬

নগেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের প্রারম্ভিক লগ্নে তাঁর গল্পগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনার সমকালে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

২২ ১২ আশ্বিন ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা চিঠি: পত্রাবলী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০।

ছোটগল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। 'ভারতী' পত্রিকাই সর্বপ্রথম বিশেষভাবে ছোটগল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।[২৩] নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির সঙ্গে ছোটগল্পের আত্মিক সম্পর্ক আছে। উভয়ক্ষেত্রে একই প্রকার দোষগুণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পে তিনি অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় কাহিনীর শিথিলবিন্যাস ও বহু ভাষণের অসংযম অনেক সময় অতিমাত্রায় উগ্র হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পের নির্ধারিত পরিসরে এই শ্রেণীর শিল্প-দৌর্বল্যের অবকাশ কম। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক ও গঠনশৈলী নগেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পেই অনুপস্থিত। তীক্ষ্ণতা ও ব্যঞ্জনাগর্ভ ও নাটকীয় পরিসমাপ্তি এখানে অনুসন্ধান করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নগেন্দ্রনাথ যখন গল্পরচনায় হাত দেন তখন বাংলা ছোটগল্পের শৈশবলগ্ন। ছোটগল্পের কোনো ফর্ম বা কলাবিধি তখনো গড়ে ওঠে নি। কাহিনী-রসের চমৎকারিত্ব একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তের মধ্যে সন্নিবেশ করলেই ছোটগল্প নামে চিহ্নিত হত।

নগেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে : বিহার বাংলা আগ্রা অযোধ্যা পাঞ্জাব সিন্ধু ও বোম্বাই। বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে তিনি অনেক সময় তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ব্যবহার করেছেন। এইসমস্ত অঞ্চলের দৃশ্যচিত্র ও প্রাকৃতিক বর্ণনাও তাঁর গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। তাঁর গল্পগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ইতিহাসাশ্রিত গল্প, কল্পনাশ্রয়ী রোমান্টিক গল্প, এবং সামাজিক গার্হস্থ্য রসের গল্প। নগেন্দ্রনাথের প্রায় ষাটটি গল্পের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের গল্পের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাঁর রোমান্সপ্রবণ মন সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনী -রচনায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে নি।

নগেন্দ্রনাথের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি অধিকাংশই স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী অবলম্বন করে লেখা, কোনো প্রামাণিক ঐতিহাসিক ভিত্তি সেখানে নেই। 'ব্রাহ্মণাবাদ' গল্পটির মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনীর একটি অংশ উল্লেখযোগ্য :

> In the desert district of Thar and Paker there are the ruins of an ancient Aryan city known as Brahmanabad. There is complete lack of historical data, but a very old tradition has it that the city in the desert was once, long ago, prosperous and had a large number of Brahman residents. The last king was a young Kshatriya of dissolute habits, who had no regard for Brahmins and no respect for their women. He was cursed by a holy Brahman for his sinfulness, and shortly afterwards the city of Brahmanabad was overwhelmed by a sand-storm which buried the city under mountainous heaps of sand.[২৪]

---

২৩ "পূর্বে তিন-চারটি গল্প বাহির হইয়াছিল, যাহাতে ছোটগল্পের রূপ স্ফুটতর। এই তিনটি গল্প হইতেছে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (ভ্রমর, বৈশাখ ১২৮১) এবং 'দামিনী' (ভ্রমর, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে-সকল ছোটগল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল দামিনী গল্পটিতেই ছোটগল্পের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।"— শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫০) ; পৃ. ২৮১-২৮২

২৪ *Reflections and Reminiscences*, p. 136.

একটি প্রাচীন কিংবদন্তীর ক্ষীণসূত্র ধরে লেখক নিপুণভাবে একটি কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মরুপ্রদেশের আঞ্চলিক প্রকৃতির ছবি চিত্তাকর্ষক। 'টিকিয়া শাহ' গল্পটিও পাটনা-অঞ্চলের একটি জনশ্রুতি কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে উক্ত অঞ্চলে নানাজাতীয় গল্পগুজব প্রচলিত ছিল— এ গল্পটি তারই অন্যতম। টিকিয়া শাহের রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ছাড়া গল্পটির মধ্যে আর-কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। 'ইংরাজ ও পাঠান' গল্পটিও পেশোয়ার-অঞ্চলের একটি বাস্তব কাহিনীর উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। 'ভৈরবী' গল্পটিও সিপাহী-বিদ্রোহ-সম্পর্কিত কাহিনী; রানী চন্দার ব্যক্তিত্ব ও গল্পরস কাহিনীটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে 'সুরজ কওর' গল্পটিই শ্রেষ্ঠ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে যে আত্মকলহ, জটিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে লাহোরের পথঘাট, এমনকি জীবনযাত্রা পর্যন্ত, বিপদসংকুল হয়ে উঠেছিল। লেখক লাহোরের সেই ষড়যন্ত্র-সংকুল শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত পরিবেশের একটি নিপুণ ও বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। ধ্যানসিংহ ও সিদ্ধিয়ানদের বিরোধের সূত্র ধরে রূপসী সুরজ কওর এই সংঘাতময় রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বহু রূপমুগ্ধ পুরুষকে সে দগ্ধ করেছে। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। পরিণামে নিজেরই অচরিতার্থ কামনাবহ্নি তাকে দগ্ধ করেছে। 'জমাল-জমিল' গল্পটিও রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর লাহোরের ষড়যন্ত্র-সংকুল পটভূমিকায় রচিত।

'মেহেরজান' 'মিলন' 'রোশিনারা' 'শাহনওয়াজ' প্রভৃতি গল্প মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক রোমান্সের উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। 'মেহেরজান' গল্পে ইসপাহানী বাইজী মেহেরজানের গর্বিত হৃদয়ের চূড়ান্ত পরাজয় দেখানো হয়েছে। মোগল-পাঠান যুগের রোমান্স-রস সে যুগের কথাশিল্পী ও নাট্যকারদের অত্যন্ত প্রিয় উপকরণ ছিল। নগেন্দ্রনাথও একাধিক গল্পে এই রোমান্সলোক থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। 'রোশিনারা' গল্পে উজীর ও নয়নচাঁদের পরনারী-হরণের ব্যর্থতা এক অতি প্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মন্ত্র-তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল গল্পটির স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করেছে। 'শাহনওয়াজ' গল্পটিতে বাদশাহী আমলের লক্ষ্ণৌ শহরের পটভূমিকায় এক অভিজাতবংশীয় তরুণ ও এক তরুণী বাইজীর প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'মিলন' গল্পে যশল্মীরের এক রাজপুতের সঙ্গে এক মুসলমান দুর্গাধিপতির প্রেম ও শোচনীয় পরিণামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৬২) ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রচনার পর বাংলা সাহিত্যে এই-জাতীয় কাহিনী রচনার একটি জোয়ার এসেছিল। নগেন্দ্রনাথের গল্পটির পটভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি মধ্যযুগীয় রোমান্সকে চিত্ররূপময় করে তুলেছেন— আরব্যরজনীর রহস্যময় মায়াজাল দিয়ে তিনি যুগ-জীবনের প্রাণস্পন্দন সঞ্চার করেছেন।

'মালবিকা' ও 'দৈবরাত ও প্রসেন'— হিন্দু যুগের দুটি বিশেষত্ববিহীন কাহিনী। 'অলকা' গল্পটিতে দুই শক্তিশালী ভূম্যধিকারীর বিরোধকাহিনী ও তার মিলনমধুর উপসংহার বর্ণিত হয়েছে। 'ভৈরব-মন্দির' কাহিনীতে এক রূপসী কুহকিনীর রোমাঞ্চকর জীবনবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত মনে হয়। 'মায়াবিনী' 'ছায়া' 'দুইবার' প্রভৃতি কয়েকটি রচনাকে ঠিক গল্প বলা যায় না। কোনো বিষয়ই সেখানে স্পষ্ট হয় নি। কয়েকটি অসাধারণ মুহূর্ত নিয়ে লেখক উচ্ছ্বসিত কাব্যধর্মী বর্ণনা করেছেন। চরিত্র, ঘটনা, কাহিনীর পরিণাম ও লক্ষ্য—সব-কিছুই এখানে অলৌকিকতায় ও কাব্যকুয়াশায় আচ্ছন্ন। নগেন্দ্রনাথের পারিবারিক ও সামাজিক গল্পগুলিতে তেমন বিশেষত্ব নেই। 'ছোটবৌ' ও 'নির্মলা' গল্প

দুটিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি সহজ ও সুন্দর। 'নূতন বাড়ী' গল্পটির অতিপ্রাকৃত রস শেষপর্যন্ত দানা বেঁধে উঠতে পারে নি, বাস্তব কামনার স্থূল পরিণতি ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

নগেন্দ্রনাথের গল্পগুলি বিবৃতিপ্রধান, মন্থরগতি 'টেল্'ধর্মী কাহিনী। সূক্ষ্ম কারুকার্য, ক্লাইম্যাক্সের তীক্ষ্ণতা ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত অতর্কিত নাটকীয় পরিসমাপ্তি এখানে অনুপস্থিত। চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে ঘটনাপ্রধান কাহিনীবিন্যাসের দিকেই লেখকের অধিকতর প্রবণতা। সাধারণ জীবনের সমতলভূমির দিকে কদাচিৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা ও রোমাঞ্চকর মুহূর্তই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। নগেন্দ্রনাথকে এজন্য অপরাধী করে লাভ নেই। কারণ সে যুগের সাহিত্য কদাচিৎ এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখনো আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম অনুবর্তীরা তখন পূর্বযুগের রোমন্থন করে চলেছেন। রবীন্দ্রানুরাগী নগেন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যেই তাঁর স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

৭

নগেন্দ্রনাথ কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম যুগের 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁর অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর একমাত্র কাব্যসংকলন 'স্বপন-সংগীত'(১৮৮২) প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।[২৫] পরবর্তীকালেও তিনি অল্পসংখ্যক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সনেটগুলির মধ্যে 'কড়ি ও কোমল'এর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ 'ঘুম' নামক সনেটটি উদ্ধার করা যায়—

পড়েছে ঘুমের ছায়া ঘুমন্ত আননে,
ঘুমের আলসে হের শিথিলিত কায় ;
মুখর নূপুর এবে চরণ ঘুমায়,
ঘুমায় রতন কাঞ্চী কটি আলিঙ্গনে,
অধরে ফুটিছে হাসি সুখের স্বপনে ;
অযতনে শয়নেতে অঞ্চল লুটায়,
পূর্ণ পীনপয়োধর জড়িত মালায়,
আঁখিপাতা ঢাকিয়াছে কমলনয়নে ;
খসেছে কটির বাস, মুক্ত কেশভার
কোমল চিকণ বাহু ঘুমায় শিথান,
ললিত কোমল কর বুকের মাঝার
নিশ্বাসের সাথে সাথে পতন-উত্থান,
মরি মরি রূপখানি ঘুমন্ত এখন,
জাগিলে বুকের মাঝে কে করে গ্রহণ।[২৬]

---

২৫ "লেখকের হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেকস্থানে যথার্থ কবিতা আছে। অনেকস্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।" —ভারতী ১২৮৯ বৈশাখ

২৬ ঘুম : সাহিত্য ১৩০০ ভাদ্র।

নগেন্দ্রনাথ ‘নবনগর’ কৌতুকনাট্য ও অনেকগুলি লঘুরসের নক্‌শা লিখেছিলেন। ‘চুলের কলপ’ ও ‘কোঁচার কথা’ রচনা-দুটির বিশেষত্ব আছে। ‘বিবিধ’ নাম দিয়ে এক সময়ে ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ‘ফিচার’ লিখেছিলেন। নগেন্দ্রনাথের অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে ‘জীবন ও মৃত্যু’ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ‘মৃত্যুর পরে’ নাম দিয়ে প্রবন্ধটি ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ‘জীবন ও মৃত্যু’ সেই মুষ্টিমেয় রচনাবলীর অন্যতম, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দুরূহ তত্ত্বকথাকে তিনি উপমার সাহায্যে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন।[২৭] ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কিত রচনা পড়ে রোম্যাঁ রলাঁও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।[২৮]

নগেন্দ্রনাথের রচনাবলীর পরিধি ও বৈচিত্র্য দুইই কম নয়। তাঁকে একজন ‘প্রলিফিক্ রাইটার’ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের মাত্র সাত মাস আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে (২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০)। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছেন। শ্রমনিষ্ঠ অনুসন্ধান ব্যতীত তাঁর সাহিত্যকৃতিকে আজ উদ্ধার করা কঠিন। এত তাড়াতাড়ি তিনি বিস্মৃত হলেন কেন। মনে হয় এই বিস্মৃতির প্রধান কারণ দুটি।— নগেন্দ্রনাথের পেশা ছিল সাংবাদিকতা, কিন্তু নেশা ছিল সাহিত্য। এই দুইয়ের মধ্যে যে মিল তা অনেকখানি কাকতালীয়বৎ— বরং বিরোধটাই সুস্পষ্ট। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি নানাজাতীয় প্রবন্ধ-রসরচনা গল্প-কবিতা-টিপ্পনী লিখেছেন। তাঁর অনেক রচনার মধ্যেই দ্রুতলিখনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এই মানসিকতা তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যেও অলক্ষ্যগোচর নয়। সাংবাদিকতা তাঁর শিল্পীসত্তাকে শুধু বিচলিতই করে নি, দ্বিধাগ্রস্তও করেছে। দ্বিতীয়ত, সে যুগে কথাশিল্পী হিসেবেই নগেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাচীন ধারারই সংরক্ষক। মৃত্যুর অল্পদিন আগেও তিনি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু কোনো নবীন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের পূর্ণপ্রতিষ্ঠার দিনেও তিনি বঙ্কিম-অনুবর্তীদের গণ্ডি ছেড়ে কদাচিৎ অগ্রসর হতে পেরেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক-জীবনে সামান্য ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়া আর-কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অথচ বিংশ শতাব্দীর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই কথাসাহিত্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ এবং ‘গোরা’ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষে, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে নগেন্দ্রনাথের শেষ আশ্রয়টুকুও লুপ্ত হয়েছে। দেশ কাল ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসাধনা শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

---

২৭ “বঙ্কিমবাবু বলিলেন, ‘বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তের ‘মৃত্যুর পরে’ উঁচুদরের লেখা। বঙ্গদর্শনে এরকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।’ বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ‘মৃত্যুর পরে’র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন-চার বার আমার নিকটে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর Life-এরও তিনি প্রশংসা করিতেন।”— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বঙ্কিম-প্রসঙ্গে, পৃ ৩৪৯।

২৮ *Reflections and Reminiscences.*

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক এস. মুখার্জী, ১২/২ রামতনু বোস লেন, কলিকাতা ৬। সাড়ে পাঁচ টাকা।

কৃত্তিবাস-পরিচয়। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীসুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রিষড়া, হুগলি। পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য (১৮৫০-১৯০০)। শ্রীপ্রভাময়ী দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাড়ে ছয় টাকা।

শিবায়ন : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র -রচিত। সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬। সাত টাকা।

'আমাদের দেশের লোকেরা ইতিহাস সম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন ছিলেন' এবং এই ঔদাসীন্যই অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অস্পষ্টতার প্রধান কারণ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অস্পষ্টতা আছে— এ বিষয়ে লেখকের সহিত কাহারও মতান্তর হইতে পারে না, কিন্তু অস্পষ্টতার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহার গ্রন্থের পাঠকগণের সম্পূর্ণ ঐকমত্য না হইতেও পারে। অন্ততঃ গ্রন্থ-রচয়িতারা ইতিহাস-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ, নামভণিতা। কি কাব্য, কি পালাগান, কি গীতিকবিতা নামভণিতা সর্বত্রই আছে। কোন্ চর্যা সরোহপাদের আর কোন্ চর্যা কাহ্নপাদের সেটুকু জানিতে যে বাধা হয় না সেজন্য আমরা কবিদের ইতিহাসবোধের কাছেই ঋণী। প্রথম সোপানটা তাঁহারা উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের কালানু-সন্ধানের কথা আজ আমরা চিন্তা করিতে পারিতেছি। এক নামের একাধিক লেখক থাকিতে পারেন, কিন্তু ঐকাধিক্যেরও একটা সীমা আছে, যেমন চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে হইয়াছে। চণ্ডীদাস এক, না দুই, না তিন— সেটা সমস্যা বটে। কিন্তু পদান্তে চণ্ডীদাস নামটা না থাকিলে সে সমস্যা আরও গুরুতর হইতে পারিত।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থরচনার তারিখ। গ্রন্থরচনার তারিখ ছোট ছোট পদে থাকে না কিন্তু বড় কাব্যগুলিতে থাকে। কবি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন সাল-তারিখটি সযত্নে বসাইয়া দেন। পরে লিপিকার সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানে) তাহা বদলাইয়া ফেলেন। ফলে গবেষকের বিপদ হয়। মূল কবির স্বহস্ত-লিখিত কাব্যগ্রন্থ আদ্যন্ত অক্ষুন্ন পাওয়া গেলে কবির কালনির্ণয়ে অসুবিধা হয় না। আমরা মূল কবির হস্তলিখিত পুঁথি কদাচিৎ পাই। আর, কি মূল কি প্রতিলিপি অনেক পুঁথিরই শেষের পাতা এবং প্রথম পাতা নষ্ট হইয়া যায়। ফলে তারিখের অংশটি পাওয়া যায় না। অতিব্যবহার তাহার কারণ। বস্তুতঃ গ্রন্থ-রচনার তারিখ দিতে যাঁহাদের ভুল হইত না তাঁহারা ইতিহাস-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এ কথা বলা যায় না।

কারণ যাহাই হউক-না কেন, সাহিত্যের ইতিহাসে সাল-তারিখের গণ্ডগোল কিছু আছে এবং তাহা দূরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সাহিত্য এবং ইতিহাস উভয়ের স্বার্থেই তাহার প্রয়োজন আছে। সুখময়বাবু যে সেই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা আনন্দের কথা। তথ্যসন্ধানের কাজ গুরুতর শ্রম এবং অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় -সাপেক্ষ। সুখময়বাবু ইতিহাসের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ সে কাজে চেষ্টার ত্রুটি

রাখেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলেই যে-নামগুলি আমাদের মনে আসে তাহার প্রায় সবই সুখময়বাবুর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসরের ইতিহাস। এই সহস্র বৎসরের শেষের প্রান্ত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ, রামপ্রসাদের মৃত্যুকাল, প্রমাণের দ্বারা পরিচিহ্নিত। প্রথম প্রান্ত, চর্যাগীতি-রচনার প্রারম্ভকাল, ধরা হইয়াছে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ। চর্যাগীতির এই ঊর্ধ্বসীমা প্রতিষ্ঠার জন্য লেখক যে-সকল উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহার মধ্যে নূতন তথ্যও অনেক আছে। সকল তথ্যই প্রমাণসিদ্ধ না হইতে পারে কিন্তু দিগ্‌দর্শনের সহায়ক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যে তথ্যগুলির উপর সুখময়বাবু চর্যাগীতির প্রারম্ভকালের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন সেগুলি এই :

১. ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের "Sumpa Mkhan-Po-র লেখা Pag-Sam-Jon Zan (রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রী.), তারনাথের লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (রচনাকাল ১৬০৮ খ্রী.) এবং Arthur Green Wedel-এর জার্মান ভাষায় লেখা ৮৪ সিদ্ধার ইতিহাস থেকে তথ্য আহরণ করে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৫শ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় এবং বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালের ১৪শ বর্ষের ২য় সংখ্যায়" লিখিত দুইটি প্রবন্ধ।

২. ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী' '*Sa-Skya-bka'-bum-pha* নামক একটি তিব্বতী গ্রন্থ হইতে যাহার তথ্য সংগৃহীত।

৩. *Deb-ther Snon-Po* নামক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-বিষয়ক তিব্বতী গ্রন্থের জর্জ রোরিক কৃত The Blue Annals নামক ইংরাজী অনুবাদ।

৪. *Bu-Ston Rin-po-che* (রচনাকাল ১৩২২ খ্রী.) বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-বিষয়ক আর-একটি তিব্বতী গ্রন্থের Dr. E. Obermiller কৃত ইংরাজী অনুবাদ।

The Blue Annals -এর বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে উল্লিখিত বহু ঘটনার সন-তারিখ দেওয়া আছে। গ্রন্থের অনুবাদক বলিয়াছেন, "The work is invaluable for its attempt to establish a firm chronology of events of Tibetan history." তিব্বতীয় ইতিহাসের সহিত চর্যাকারদের সম্পর্ক আছে, কাজেই তাঁহাদের কাল-নিরূপণের জন্য স্বভাবতঃই বর্তমান লেখক The Blue Annals -এর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে *Deb-ther Snon-Po* গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে রচিত। এই গ্রন্থের সাল-তারিখ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু গ্রন্থকার কোনো তথ্যকেই তথ্যান্তরের সহিত না মিলাইয়া নিরস্ত হন নাই। তথ্যপ্রমাণের সহিত অনুমান প্রয়োগের প্রয়োজনও হইয়াছে। যেমন Blue Annals হইতে অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাব-কাল পাওয়া গেল— দশম-একাদশ শতক। সরহ অতীশের ঊর্ধ্বতন দ্বাদশগুরু। সে গুরুপরম্পরাও উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। প্রতি গুরুর ব্যবধান গড়পড়তা ২০ বৎসর ধরিলে "সরহের জীবৎকাল হয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ"। পিতৃপুত্রানুক্রমে এক এক পুরুষের যে ব্যবধান ধরা হয় তাহার মধ্যে যতটা শৃঙ্খলা থাকে গুরুশিষ্যানুক্রমে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। তবু এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান ছাড়া উপায় নাই— এবং এ-অনুমানকে নিতান্ত অসংগত বলা যায় না।

গ্রন্থকার সরহ-পা শবর-পা লুই-পা দারিক-পা নারো-পা শান্তি-পা ভুসুকু-পা এবং ডোম্বী-পা-র

সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আবির্ভাবকাল প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য প্রাচীন সাহিত্যরসিকদের কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য।

চর্যাগীতিকার ছাড়াও জয়দেব, লক্ষ্মণ সংবৎরহস্য, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ (যথা, অদ্বৈত, হরিদাস, নিত্যানন্দ, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর, রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট) মুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি বহু নাম ও বিষয় গ্রন্থের সূচীভুক্ত হইয়াছে।

প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসার ফলে গ্রন্থকার কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নূতনতর তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের এক বৎসর পরে 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' নামে তাঁহার যে পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে, কৃত্তিবাস সম্পর্কে তাহা সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানের পরিচয় বহন করিতেছে। কৃত্তিবাস সম্পর্কে এযাবৎ আলোচনা কম হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের পরেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল-সমস্যা ঐতিহাসিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। পুরাতন সাহিত্যে কৃত্তিবাস সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী (১৮৪৫ হইতে ১৫১০ এর মধ্যে রচিত) গ্রন্থে। "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তো জনপ্রিয়ঃ"— কবি সম্পর্কে ইহার অধিক আর-কিছু বলা হয় নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (১৬শ শতকের শেষার্ধে রচিত) কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়:

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥

ঊনবিংশ শতকের প্রথম হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হয়। তখন হইতেই কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হয়। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ অবধি কবির পরিচয়জ্ঞাপক কোনো তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের প্রকাশিত 'কৃত্তিবাসের পরিচয়সংগ্রহ' নামক একটি পুস্তিকায় কবির জীবনকথা-প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ পাওয়া গেল। তাহাতে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনো তথ্য ছিল না। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত (১৮৭০) 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে কৃত্তিবাসের জন্ম-সন ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ বলা হইয়াছে। 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৮৭৮) রাজনারায়ণ বসু কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার কাল ১৫৩৮ বলিয়া উল্লেখ করেন। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৪) 'বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ রামায়ণের রচনাকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ১৩০৫ (১৮৯৮) সালে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত্তিবাস-পরিচয়-সূচক পয়ার ছন্দের নয়টি ছত্র প্রকাশ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ প্রকাশিত হয়। এই আত্মবিবরণই কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের প্রধান সূত্র। অবশ্য কুলজী গ্রন্থের প্রমাণকে আনুষঙ্গিক তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি দীনেশচন্দ্র সেন -কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত এই আত্মবিবরণকে কেন্দ্র করিয়াই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে যাবতীয় গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। সুখময়বাবুর গবেষণারও প্রধান ভিত্তিভূমি ঐ আত্মবিবরণ। সুখময়বাবু যাঁহাদের শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয়, তাঁহাদেরও। সুতরাং 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থের লেখক তাঁহার 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' গ্রন্থে "কৃত্তিবাস সম্বন্ধে গবেষণায় যাঁদের দান সবচেয়ে বেশী" বলিয়া মনে করিয়াছেন

অন্যান্য গবেষক স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের দানকে যদি ততোধিক বলিয়া মনে করেন তো তাঁহাদের দোষ দেওয়া যাইবে না।

কিন্তু যে যাহাই হউক, মোট ফল কি দাঁড়াইল? সুখময়বাবু কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বহুতর গবেষণা করিয়া যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই :

১. (কৃত্তিবাস ও স্বরূপ দামোদরের মধ্যে চার পুরুষের ব্যবধান ধরিয়া) "কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাবে না। কেবলমাত্র এইটুকু ধরা যেতে পারে যে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন।"—কৃত্তিবাস-পরিচয়, পৃ ৩০। ২. ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে (১৫শ শতকের শেষার্ধ) কৃত্তিবাসের উল্লেখ আছে এবং বংশিবদন বিদ্যারত্নের কুলকারিকায় উদ্ধৃত "সপ্তাকাশ ...ব্যবস্থাপক" শ্লোকে বলা হইয়াছে ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকাব্দে কুলতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই শ্লোকের "উক্তিটি সত্য হলে কৃত্তিবাস ১৪০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলতে হবে।"—পৃ ৩২। ৩. জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসের উল্লেখ -প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, "জয়ানন্দ যে রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর (কৃত্তিবাসের) নাম উল্লেখ করেছেন, তার থেকে মনে হয়, কৃত্তিবাস জয়ানন্দের অনেক আগে, এমনকি চৈতন্যদেবেরও আগে, আবির্ভূত হয়েছিলেন।"—পৃ ৩৩। ৪. ধ্রুবানন্দের মহাবংশে উল্লিখিত কৃত্তিবাসের বংশাবলীতে এক সুষেণ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও এক সুষেণের দেখা মিলে। ইনি সম্পর্কে "কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র" এবং "১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন। পিতামহ এবং পৌত্রের স্বভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর ধরা যায়। এই হিসাবে কৃত্তিবাস ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দ মত সময়ে জীবিত ছিলেন। মোটের উপর তিনি ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।"—পৃ ৩৬। ৫. কৃত্তিবাসের তিন বিবাহ। তাঁহার এক শ্বশুরের নাম শঙ্কর। শঙ্করের এক ভাইয়ের নাম উৎসাহ। উৎসাহের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশ। ইনি ১৫৫০ হইতে ১৫৮ র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এই তথ্যগুলি বিবৃত করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "সুতরাং কণাদের প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস তার ৮০-৯০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম বা নবম দশকে বর্তমান ছিলেন বলতে হয়।"—পৃ ৩৭। শ্বশুরের সূত্রে বয়সের হিসাব বড় বিপজ্জনক। লেখক পিতামহ ও পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধান একবার ৫০ বৎসর ধরিয়াছেন অর্থাৎ প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর হিসাবে ধরিয়াছেন। এইরূপ ধরিয়া যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ প্রামাণিক হইতে পারে না। তাহার উপর পিতামহর শ্বশুরকে প্রপিতামহর স্থানে বসাইলে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আরও বাড়িয়া যায়। শ্বশুর বয়সে পিতার অপেক্ষাও বড় হইতে পারেন, এবং তেমন-তেমন ক্ষেত্রে সমবয়স্ক এমনকি বয়ঃকনিষ্ঠ হইবারও বাধা নাই। প্রপিতামহ-স্থানীয় ধরিলেও ৮০-৯০ বৎসরের ব্যবধান কেন হইবে? লেখক পিতামহ ও পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধানের যে নিয়ম ধরিয়াছেন সে হিসাবে তো ৭৫ বৎসর ব্যবধান হওয়া উচিত। ৬. "চৈতন্যদেবের অনেক আগেই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই নবদ্বীপ কৃত্তিবাসের বাসভূমি, ফুলিয়া থেকে সাত-আট ক্রোশ দূর ..। তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস যখন সুদূর বরেন্দ্রভূমে পড়তে গেলেন তখন বোঝা যায় তাঁর সময়ে বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপের অভ্যুদয় হয় নি। সুতরাং তিনি চৈতন্যদেবের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং চৈতন্যদেবের জন্মের অনেক আগেই তাঁর পাঠ সাঙ্গ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" "অনেক আগে" বলিতে কত আগে বুঝিতে হইবে? অনেক শব্দটা নিতান্তই

আপেক্ষিক। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া সাল-তারিখ নিরূপণটাই যখন গবেষকের লক্ষ্য তখন অনেক শব্দটি ব্যবহার না করিয়া একটা স্থূল বর্ষসংখ্যা দিলে ভালো হয়। ৭০ বৎসর ৮০ বৎসর ১০০ বৎসর যাহাই হউক একটা সংখ্যা বলা ভালো। যে পাঠক সত্যই বিচার করিতে চান, একটা সংখ্যা বলিলে তাঁহাকে সাহায্য করা হয়। আমি যদি এই "অনেক"কে ৮০ হইতে ১০০ বৎসর ধরি, তাহা হইলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের জ্যোতিষিক বিচারে প্রাপ্ত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ কৃত্তিবাসের জন্ম-বৎসর সমর্থিত হয়। ৭. আরও কয়েকটি প্রমাণ এবং অনুমান -সাহায্যে লেখক স্বীয় মত প্রবলতর ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন: "সুতরাং আমরা এখন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।"—পৃ ৪৪। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কেহ তো এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। সুখময়বাবু নূতন তথ্যের দ্বারা কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে পুরাতন ধারণা খণ্ডন না করিয়া তাহাকে দৃঢ়তর করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ জীবৎকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। চরম সিদ্ধান্ত শুধু এইটুকু জানাইলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। অর্থাৎ ১৪৫১ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো-না-কোনো সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। ইহা একটা তথ্য বটে, কিন্তু এ তথ্যের সবটা আমাদের অজ্ঞাতপূর্ব নয়, এবং কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের পুরাতন জ্ঞানবর্ধনে সহায়ক হয় নাই। বরং দুই-এক ক্ষেত্রে একটু জটিলতা বাড়িয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুখময়বাবু কৃত্তিবাসের কালনিরূপণ -প্রসঙ্গে 'কৃত্তিবাস-পরিচয়ে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কোন কোন সময়ে আবার পেয়েছি আশার অতিরিক্ত পুরস্কার।" যেমন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'তে লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ে কতকগুলি বিশেষ পূর্বধারণার প্রভাবে গবেষকদিগকে পরস্পরবিরোধী কাল-পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত সামঞ্জস্যবিধান-প্রয়াসের সম্মুখীন হইতে হওয়ায় মীমাংসা জটিলতর হইয়াছে। শ্রীমান সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম গ্রন্থে এই বিষয় সংক্রান্ত নানা তথ্য ও অনুমান আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকৃত হইতে পারে।"

সুখময়বাবুর যে সিদ্ধান্তটি ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত গ্রন্থের ('বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা') ৫৯ পৃষ্ঠা খুলিলাম। দেখিলাম, উদ্ধৃত অংশের পর আছে, "অবশ্য কোন যুক্তিই একেবারে চূড়ান্তরূপে সংশয়নিরসক নহে। তথাপি রাজা ও রাজসভা প্রতিবেশ সম্বন্ধে নানা প্রমাণের বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির পরস্পর-পোষকতার জন্য ইহা যে সত্যাভিমুখী তাহা নিঃসংশয়। এই যুক্তিপরম্পরার অনুসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্ম-সময়কে মোটামুটি ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ এই কালপরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতন্যপূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তাঁহাকে চতুর্দশ শতকের শেষপাদে স্থাপন করার যে অনুমান আমাদের অতিরিক্ত প্রাচীনত্বপ্রীতির পরিচয় দেয় তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।"

সুখময়বাবুর যে সিদ্ধান্তের সহিত ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একমত সেটি তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, কৃত্তিবাস ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি সুখময়বাবুর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কারণ সুখময়বাবু এই উক্তিরই অব্যবহিত

পূর্ববর্তী কয়েক ছত্র 'কৃত্তিবাস-পরিচয়ে'র গ্রন্থভূমিকায় উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তির প্রতিবাদ তিনি করেন নাই এবং মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির কিয়দংশ তিনি 'আশার অতিরিক্ত' পুরস্কার রূপেই স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল, ১৪৬০ হইতে ১৪৯০-এর মধ্যে কোনো সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল। সুখময়বাবুর এই সিদ্ধান্ত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এবং তাঁহার এই স্বীকৃতি দেখিয়া সুখময়বাবু সুখী হইয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যে সমস্যা মীমাংসার আশা করিয়াছিলাম তাহার সম্ভাবনা আরও দূরে চলিয়া গেল।

জটিলতা কি ভাবে বাড়িল বলি। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন সুখময়বাবুর উপস্থাপিত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় স্থিরীকৃত হইবার ফলে কৃত্তিবাসের "চৈতন্যপূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়"।

কেমন করিয়া হয়? চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৮৬ হইতে ১৪৯০-এর মধ্যে হইলে চৈতন্যপূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে? ১৪৬০ সালে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলেও ঐতিহাসিক বিচারে তাঁহাকে চৈতন্যপূর্ব বলা চলে না। আজিকার মধ্যবয়সী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের রবীন্দ্রসমকালীন বলা হয়।

১৪৬০ হইতে ১৪৯০-এর মধ্যে জন্ম-সময় স্থিরীকৃত হওয়ায় মাননীয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "তাঁহাকে [কৃত্তিবাস] চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার যে অনুমান ··· তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।" ইহা তো নিতান্তই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। এত প্রয়াসের কি নিষ্ফলা সমাপ্তি!

সুখময়বাবু কৃত্তিবাস সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার এবং তৎপূর্বসূরীদের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীকে একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া বিচার করিলে প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কেবল নেতিবাচক সিদ্ধান্ত লইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস ধরিয়া যে গণনা করিয়াছেন তাহাতে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দকে কৃত্তিবাসের জন্ম বৎসর ধরা হইয়াছে। এই জন্ম-বৎসরকে খণ্ডিত করার মত কোনো প্রমাণ তো আপাতত দেখা যাইতেছে না। সুখময়বাবুও সেরকম কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। বরং বলিব তাঁহার কোনো কোনো তথ্য এবং মত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দকে কৃত্তিবাসের জন্ম-বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে আনুকূল্যই করিতেছে। যেমন, ক. ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান অনেক। গৌরাঙ্গদেবের জন্মের কিছুদিন আগে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ৮৮ বৎসর পূর্বেকার নবদ্বীপ সেরূপ নাও থাকিতে পারে। খ. ধ্রুবানন্দের মহাবংশবলীতে কৃত্তিবাসের উল্লেখ আছে। মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। ধরিয়া লইলাম, মহাবংশাবলীর রচনাকাল ১৪৭৫। মহাবংশাবলীতে যখন নাম উঠিয়াছে তখন কৃত্তিবাসের খ্যাতি দেশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং সে-খ্যাতিও নিশ্চয় রামায়ণের খ্যাতি। সে খ্যাতি অল্পদিনে পরিব্যাপ্ত হয় না; রামায়ণ-রচনার পর ১৫ বা ২০ বা ৩০ বৎসর অন্ততঃ গিয়াছে। সে হিসাবেও জন্মকাল ১৩৯৮ ধরিতে বাধা হয় না। গ. কণাদ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস (প্রতিপুরুষ ২৫ বৎসর ধরিয়া) ১৪৭৫ বা তাহার কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। ১৩৯৮ হইতে ১৪৭৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত

জীবিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঘ. কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন তিনি যদি রুকমুদ্দিন বারবক শাহই হন তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। বারবক শাহের রাজ্যকাল ১৪৫৯ হইতে ১৪৭৪। ধরিয়া লইলাম, রাজত্বের প্রথম ভাগেই কবি তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন। মনে করা যাক্, তিনি ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসভায় আসেন এবং তাহার পরও কিছুদিন অর্থাৎ দশ-পনরো বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে ১৩৯৮ হইতে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এই ৭৭ বৎসরকে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল ধরিতে পারি। ঊর্ধ্বসীমা ১৩৯৮কে যতক্ষণ না অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সীমার রেখা যেখানে আছে সেখানেই থাক্। নিম্নতম সীমা ১৪৭৫ ধরিয়াছি। ইহাকে দুই-চার বৎসর এদিক ওদিক সরাইবার প্রয়োজন হইলে সরানো যায়, কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের অতি সন্নিকট করায় বাধা আছে। আবার ১৪৬০এর ওদিকেও সরানো যায় না। সেই কারণেই ১৪৬০ ও ১৪৮৬র মাঝামাঝি ১৪৭৫ রাখিতেছি। ইহাতে তাঁহার জীবৎকালের নিম্নতম সীমার অনুমান সর্বাধিক যুক্তিসংগত হয়।

আর-একটা কথা বলিয়া রাখি, যে পরিবেশন-কৌশলের পরিপাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অপরিহার্য গুণ বলিয়া তিনি স্বয়ং মনে করেন, তাঁহার গ্রন্থে সে পরিপাট্য ষোল-আনা রক্ষিত হইতে পারে নাই। ছাপার ভুলচুক অনেক আছে, তবে সে সম্পর্কে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সে কথা আর তুলিব না। কিন্তু এ জাতীয় গ্রন্থে একটা বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট দিবার কথা তাঁহার মত গবেষকের মনেও উদিত হইল না, ইহা বিস্ময়কর বোধ হইতেছে। "এখনকার পাঠকেরা পাদটীকার পক্ষপাতী নন বলে এই বইয়ে পাদটীকা একেবারেই দেওয়া হয় নি।" তিনি তো নাটক উপন্যাস বা স্কুলপাঠ্য শিশুসাহিত্য লিখিতে বসেন নাই; কে কিসের পক্ষপাতী তাহার বিচার না করিয়া তাঁহার আলোচনার পক্ষে তাঁহার মতপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যাহা-কিছু আবশ্যক তাহাই দেওয়া উচিত। পাদটীকা যেখানে দেওয়া আবশ্যক সেখানে অবশ্যই দিতে হইবে। যে পাঠক দেখিতে চান না তিনি দেখিবেন না, কিন্তু যাঁহার দেখা প্রয়োজন তাঁহাকে লেখক বঞ্চিত করিবেন কেন? নির্ঘণ্ট না থাকাতে এই প্রয়োজন আরও বেশি করিয়া অনুভূত হইবে, অন্ততঃ বর্তমান সমালোচক অনুভব করিয়াছেন।

সুখময়বাবু কৃত্তিবাস সম্পর্কে নূতনতর প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকদিগের সুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধিকে যে ভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার জন্য আবার তাঁহাকে সাধুবাদ জানাই। লেখক পূর্বসূরীদের কাহারও কাহারও প্রতি কোনো কোনো স্থলে কিছু রূঢ় কথা বলিয়াছেন। যেমন, অধ্যাপক সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' সম্বন্ধে লেখকের উক্তি: "আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র বিভিন্ন যুগের রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে না, সেই সঙ্গে থাকে সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনা, তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগের সাহিত্যের গঠন তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হয়; তার ভাষা ও পরিবেশনকৌশলেও পারিপাট্য থাকা চাই, সাহিত্যের ইতিহাস নীরস তালিকামাত্র হলে চলবে না, তাকে সাহিত্যপদবাচ্যও হতে হবে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' দেখা যায় না।" —প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ ৩০৭। কয়েকজন কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের মতের বিচার প্রসঙ্গে সুখময়বাবু এই উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত যথার্থ কি অযথার্থ সে আলোচনা নিষ্ফল, কিন্তু এই উক্তি যে এস্থলে অবান্তর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

সুখময়বাবুর ক্ষেত্র সাহিত্যরসবিচারের ক্ষেত্র নয়। এবং এই রসবিচারের অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিলেও তাঁহার গবেষণার মূল্য ও মর্যাদা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না, এ কথা তিনি যদি এখনও বুঝিয়া না থাকেন তো সেজন্য তাঁহার দোষ দিব না, দোষ দিব তাঁর তরুণবয়সের। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই সাহিত্য-ইতিহাসের যেসকল সমস্যা এখনও সমাধানের প্রতীক্ষা করিতেছে তাঁহার হাতে সেগুলির সদ্‌গতি হউক।

শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবীর 'বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অর্ধশতাব্দীব্যাপী একটি অধ্যায়ের আংশিক ইতিহাস। "প্রস্তুত নিবন্ধে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত কাহিনীকাব্যগুলি আলোচিত হইয়াছে। ইহার আরম্ভে মাইকেল মধুসূদন, সমাপ্তিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথ। এই দুই মহাকবির নাম হইতেই আলোচিত কাব্যধারার আদ্যন্ত সীমা ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট— বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহা পরিবর্তনের যুগ।" এই বলিয়া গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার আলোচনার পরিধি নির্দেশ করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আখ্যায়িকা-কাব্য অনেক লেখা হইয়াছিল। এই শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত গ্রন্থগুলিই লেখিকার আলোচনার বিষয়। সাহিত্যিক বিচারে এই কাব্যগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধ-লেখক এবং গ্রন্থকর্ত্রীর গবেষণা-পরিচালক অধ্যাপক সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "আলোচিত কাব্যগুলি অর্থাৎ পদ্যে লেখা আখ্যায়িকাগুলি অধিকাংশই সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে অকিঞ্চিৎকর।" তথাপি অধ্যাপক-মহাশয় শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবীকে "এই লুপ্ত আখ্যায়িকা কাব্যগুলির পরিচয় উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত" করেন। কেন করেন? "একদা সাধারণ পাঠকের ও সাধারণ লেখকের রুচি ও প্রবণতা কোন্ পথে ধাবিত হয়েছিল তার একটা অব্যর্থ ইঙ্গিত এগুলিতে" পাওয়া যায় বলিয়া।

লেখিকাও সবিনয়ে স্বীকার করিয়াছেন "আলোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই কোনো রকম স্থায়ী মূল্য নাই" এবং বর্তমান কালের পাঠকসমাজের নিকট সেগুলি যে উপেক্ষিত তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। "কিন্তু একদা যে প্রচেষ্টার ফলে এই আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।" আর "সেই ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিবার উপাদান" হিসাবেই এই নিবন্ধ গ্রন্থের অবতারণা। "যে বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থগুলি একদা বাঙ্গালী পাঠকের অল্পবিস্তর মনোরঞ্জন করিয়াছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্বাপর ইতিহাসের সহিত তাহাদের সংযোগসূত্র আবিষ্কার" করিবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সর্বসুদ্ধ ৬৮জন লেখক এবং ৯৬খানি পুস্তকের আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই ৬৮জন লেখকের সব কয়জনই এবং ৯৬খানি পুস্তকের সব কয়টিই যে আমাদের অপরিচিত তাহা যেন কেহ না মনে করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ; রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী, ভগ্নতরী; নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী, রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস; রঙ্গলালের পদ্মিনীউপাখ্যান প্রভৃতি কাব্য আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে আমরা অল্পস্বল্প জানি— যাঁহার সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম ও অপর্যাপ্ত উৎসাহ কবির 'সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত'। ইহার লিখিত 'উদাসিনী' নামক

একটি কাব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রভাময়ী দেবী তাঁহার গ্রন্থে সেই কাব্যটিরও পরিচয় দিয়াছেন। লেখিকার ভাষা পরিচ্ছন্ন এবং বিষয়বিন্যাস সুশৃঙ্খল। একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট, এসব গ্রন্থে যাহা একান্ত আবশ্যক, গ্রন্থশেষে দেওয়া হইয়াছে।

শিব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা কাব্যগুলির মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন যে শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় এ বিষয়ে মতান্তর নাই বলিলেই হয়।

চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।

বর্তমান কালের অধিকতর সন্নিহিত বলিয়াও বটে এবং 'ভদ্রকাব্য' বলিয়াও বটে রামেশ্বরের শিবায়ন যে পরিমাণ প্রচার লাভ করিয়াছে আর কোনো শিব-বিষয়ক কাব্য তেমন করে নাই। রামেশ্বরের শিবায়নের রচনাকাল ১৬৩২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ একখানি সুবৃহৎ শিবায়ন-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই কাব্যেরই মুদ্রিত সংস্করণ। এই কাব্যের দুইটিমাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রথম পুঁথি সংগৃহীত হয়। ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু ও মৃণালকান্তি ঘোষ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন। শিবায়নের দ্বিতীয় পুঁথির বিবরণ বাহির হয় ১৩৪৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়। প্রকাশ করেন কবির বংশধর শ্রীপাঁচুগোপাল রায়। 'তাঁহার সযত্নরক্ষিত পুথি' পরিষদে দান করার ফলেই এই মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থভাণ্ডারে যে একটি নবরত্ন সংযোজিত হইল সেজন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয়ের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলেন।

রামকৃষ্ণ রচিত শিবায়নের মূল্যবত্তা নানা দিক দিয়া বিচার্য। গ্রন্থটি সুবৃহৎ—২৬টি পালায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি পালাই পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্ণ। পুরাণ-বিষয়ে কবির যে গভীর জ্ঞান ছিল এবং তিনি যে বিবিধ পুরাণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন অনেকগুলি ভণিতার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

আপনার মনোরথে নানা পুরাণের মতে
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ। পৃ ৮
কবিচন্দ্র রচে গীত পুরাণের দৃষ্টে। পৃ ১৫
কবিচন্দ্র ভণে শুদ্ধ পুরাণপ্রমাণ। পৃ ২১
রামকৃষ্ণ দাস গায় পুরাণপ্রমাণ। পৃ ৩৯
রামকৃষ্ণ দাস রচে কাশীখণ্ড মতে। পৃ ৪৫
রামকৃষ্ণ দাস গায় কাশীখণ্ড মতে। পৃ ৫৪
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে।
তারকময়ের গীত হরিবংশ মতে॥ পৃ ৬৬

গৌরী শঙ্করের পায়ে রামকৃষ্ণ দাস গায়ে
পণ্ডিত ক্ষমিবে কাব্যদোষ।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিঞা পাইবে পরিতোষ ॥ পৃ ১৬৯

ভস্মের সমান নহে চন্দনের গন্ধ
রামকৃষ্ণ দাস গায় পুরাণ প্রবন্ধ ॥ পৃ ১৭৯

কবিচন্দ্র রচে গীত শিবের মঙ্গল।
শুনহ পুরাণকথা সর্বতীর্থফল ॥ পৃ ২০৬

মহাভারতের কথা এই বনপর্বে।
গ্রন্থগৌরবভয় রচিল সংক্ষেপে ॥
এখনে রচিব বৃহন্নরাদির[১] মতে।
শিবের কুশলে রামকৃষ্ণ বিরচিতে ॥ পৃ ২১৩

রচে রামকৃষ্ণ দাস পুরাণ প্রমাণ ॥ পৃ ২২৬

রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে।
কুমারের জন্মকথা শান্তিপর্ব মতে। পৃ ২২৯

নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিলে সভার হয় প্রীত ॥ পৃ ২৩৭

রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
ইতিহাসকথা গঙ্গা গৌরীর কন্দল। পৃ ২৪০

অন্ধকবধের কথা গাই এই ক্রমে।
হরিবংশ মতে তাহা রচিব প্রথমে ॥ পৃ ২৪৫

পয়ার ত্রিপদী ছাড়াও কয়েকটি ছন্দের প্রয়োগ এই কাব্যে দেখা যায়। মাত্রাবৃত্ত। যেমন, কৃষ্ণের বন্দনায়,—

নীপ সমীপ নীল নব নীরদ তড়িত লতা তহি সাঙ্গ।
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন পীতাম্বর তিরিভঙ্গ ॥
বন্দহুঁ বৃন্দাবনে ব্রজবেশ।
নয়ন ইন্দীবর মুখশশী সুন্দর
চন্দ্রক চুম্বিত কেশ ॥ ধ্রু ॥
কুণ্ডল মণিময় অঙ্গদ সুবলয়
তনুচিত্রিত ঘনসার।
দ্বিভুজ মনোহর বর মুরলীধর
উরে কৌস্তুভ বনমাল ॥ পৃ ৩

১. এইরূপই মুদ্রিত আছে এবং 'পাঠান্তর ও পাঠশুদ্ধি' নির্দেশের মধ্যে বা অন্য কোথাও এই শব্দ সম্পর্কে উল্লেখ নাই।

এ ছন্দ গীতগোবিন্দকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাকালী বন্দনার জন্যও কবি মামুলী ছন্দের ব্যবহার না করিয়া মাত্রাবৃত্তের আশ্রয় লইয়াছেন—

যুকত জটা মদ ঘূর্ণিত নয়না।
রুধিরপান পরিপূর্ণিত বদনা॥

ভীম ভবার্ণব ভীষিত শরণা
রামকৃষ্ণ কবি সেবিত চরণা॥ পৃ ৬

একটি শিববন্দনার পদে এক 'দশাক্ষর' ছন্দের প্রয়োগ দেখা গেল। পদের আরম্ভে, সুরের সংকেত হিসাবেই বোধ হয় লেখা আছে 'গীত দশাক্ষরা'। নিদর্শন দিতেছি—

রজত অচল কলেবরে।
আধ শশী মুকুট উপরে॥
বিশদ জটাজুট ভারা
তাহে উরধ জলধারা॥
সকল গুণাকর শীলে।
গণবর জলধর নীলে॥
ভূত ভবিষ্যতি নীতে।
বিষধরবর উপবীতে॥ পৃ ১৩

অথবা—

তনু ডোর যেন কাঁচ লুনি।
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী
হিমপাতে হারাবে পরাণী॥ পৃ ৮০

এ ছন্দ আমাদের অজ্ঞাত নহে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার অসদ্ভাব নাই। কৃষ্ণকীর্তনের এই পদ তুলনীয়—

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী।
তার থান চলহ আপুণী॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে
তবে বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে।

খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোকের নিদর্শনও এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন—

হরি হরাত্মনে নমো হরয়ে হরয়ে।
পার্বতীপতয়ে নমো কমলাপতয়ে॥
ধরণীধরায় নমো গঙ্গাধরায়।
কনকবাসসে নমো দিগম্বরায়॥

ইহা হইতে কবির সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য সপ্রমাণ হয়।

'সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি' (পৃ ৭) এই ছত্রটি অবলম্বন করিয়া সম্পাদক মহাশয়দ্বয় বলিতে চান, "নিজ সভাপণ্ডিতের নিকটই তিনি পুরাণ শ্রবণকালে সকল শাস্ত্রের সারভাগ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।" সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং পুরাণপাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করার পক্ষে তাঁহার তো কোনো বাধা ছিল না। তিনি নিজে শাস্ত্রাদি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এই অনুমানই তো স্বাভাবিক এবং সংগত। তিনি কায়স্থ বলিয়া শাস্ত্র পাঠ করেন নাই এমন মনে করিবার কি হেতু আছে? কায়স্থের পক্ষে কি সকল শাস্ত্র অধ্যয়নই নিষিদ্ধ ছিল?

রামকৃষ্ণের শিবায়নে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস -বিষয়ে একটি বিশিষ্ট উপকরণ আছে। সম্পাদক-মহাশয়দ্বয় গ্রন্থপরিচায়ক ভূমিকায় সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করায় একটু বিস্ময়বোধ করিতেছি। আমি পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যের নমুনার কথা বলেতেছি।

এই কাব্যের কয়েক স্থলে দুই চার ছত্র গদ্য আছে। যেমন—

"ভাই রে নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন, অবধান করহ।" পৃ ১২৫

"অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের তরে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করি বা হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ।" পৃঃ ১৪৬।

"শুক্রাচার্য বলি রাজাকে কহিতেছেন।" পৃ ২০৩

"পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ।" পৃ ২৩৬

সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটি পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং আলোচনারও সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আলোচনার যেটুকু বাকী আছে সেজন্য তাঁহাদের দায়ী করা অন্যায়। তবে আমাদের স্বভাবের এই এক দোষ, আমরা যাহার কাছে কিছু পাই, তাহার কাছেই আরও পাইতে চাই।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

রূপসী বাংলা। জীবনানন্দ দাশ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২০। তিন টাকা।

বেলা অবেলা কালবেলা। জীবনানন্দ দাশ। নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা ১২। তিন টাকা।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য, একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, জীবনানন্দের কাব্য যে কোথাও সংকীর্ণ দেশ-ভাবনার দ্বারা আক্রান্ত নয়, এই সহজ কথাটাকে বোঝাতে গিয়ে সেদিন বিশিষ্ট একজন বক্তা সেখানে একটি চমকপ্রদ প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তাঁর কাব্যে কোথাও বাংলাদেশের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।" তার কিছুকাল বাদেই প্রকাশিত হল 'রূপসী বাংলা', বাংলাদেশের নাম যে-বইয়ের বিভিন্ন কবিতায় অন্তত একবার, এবং কোনও-কোনও কবিতায় একাধিকবার, উচ্চারিত হয়েছে।

না-হলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, 'রূপসী বাংলা' যদি না-ও প্রকাশিত হত, তাঁর অন্যান্য বইয়ের কবিতা

থেকেই স্পষ্ট করে চিনে নেওয়া সম্ভব ছিল যে, জীবনানন্দ এই বাংলাদেশেরই কবি। গ্রাম-বাংলার জল মাটি মানুষ মাঠ অরণ্য আকাশ শীত শরৎ আর হেমন্ত— বিশেষ করে সেই হেমন্তকাল, বাংলা দেশের বাইরে যাকে স্পষ্ট করে চিনতে পারাই অতি কঠিন কর্ম— তাঁর কবিতায় বারবার ছায়া ফেলেছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বমানবের বিপন্ন যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় একটি অমোঘ ভাষা পেয়েছিল ; কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, কবিতার বাতাবরণ— রচনার ব্যাপারে তাঁর জন্মভূমির সঙ্গে তিনি কোনও যোগ রাখেন নি।

যোগ না রাখবার দরকারই বা হবে কেন। দেশভাবনা কি বিশ্বভাবনার পরিপন্থী ? অবশ্যই নয়। সৎ একজন কবির ক্ষেত্রে তো নয়ই। দেশকে ভালোবেসেও তিনি বিশ্বপৃথিবীকে ভালোবাসতে পারেন। এমনকি দেশকে ভালোবাসেন বলেই হয়তো বিদেশকে ভালোবাসা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় না। কথাটা কি স্বয়ংবিরোধী শোনাল ? শোনানো উচিত নয়। কেননা, ভালোবাসার সীমানা যতই বড় হোক, তার একটা প্রত্যক্ষ অবলম্বন দরকার। নিজের দেশ নিজের কাল ইত্যাদিই সেই প্রত্যক্ষ অবলম্বন— চোখের সামনে যাকে দেখা যায়, হাত বাড়িয়ে যাকে ছোঁয়া যায়, রক্তে যাকে অনুভব করা যায়। সেই প্রত্যক্ষ অবলম্বনকে উপেক্ষা করে কেউ কখনও মহাপৃথিবী কিংবা মহাকালের প্রেমিক হতে পেরেছেন, এমন কথা মেনে নেওয়া একটু শক্ত ব্যাপার।

এক্ষেত্রে আরও শক্ত হচ্ছে। তার কারণ, জীবনানন্দের দৃষ্টি যে কখনও ভৌমিক কিংবা কালগত কোনও সংকীর্ণতার দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, সে তো তাঁর কবিতা পড়েই আমরা জানতে পারি। অথচ, যেমন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কিংবা 'বনলতা সেন'এ, ঠিক তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই সংকলন-দুটিতেও দেখতে পাচ্ছি যে, স্বভূমি এবং সমকাল সম্পর্কে তাঁর মমতা ছিল অতিমাত্রায় গভীর। তা নইলে কি সেই ভূমি এবং সেই কালের চিত্রগুলি তাঁর কবিতায় এইভাবে ফিরে-ফিরে আসত ?— তাঁর সমগ্র সত্তাকে এত প্রবলভাবে এসে নাড়া দিয়ে যেত ? আবারও বলি, জীবনানন্দ এই মহাপৃথিবীর কবি। কিন্তু, পৃথিবীর যে অংশে তিনি লালিত হয়েছিলেন, যার হাওয়ায় তিনি নিশ্বাস নিয়েছিলেন, যার শ্যামল সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, সেই অংশটুকুর প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল দুর্নিবার। তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে সেই খণ্ডপৃথিবীকে— অর্থাৎ তাঁর জন্মভূমিকে— তিনি ভালোবেসেছিলেন।

ভালোবাসলে বেদনা পেতে হয়। 'রূপসী বাংলা'য় কি সেই বেদনা আছে ? অথবা 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় ? তা ছাড়া আর কী আছে, জানা নেই। বেদনা, বেদনা, বেদনা। বিশাল ব্যাপ্ত একটি বেদনাই এই বই-দুখানিকে অধিকার করে আছে। বিশাল, তবু তীব্র। ব্যাপ্ত, তবু সূচীমুখ। এতই সূচীমুখ যে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরমুহূর্তেই যেন হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি হঠাৎ ঝনঝন করে ওঠে। নিতান্ত অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষেও তখন সেই বেদনার হাতে নিজেকে সঁপে না দিয়ে উপায় থাকে না। সঁপে দিয়ে মনে হয়, যেন আরও শুদ্ধ, আরও পবিত্র হওয়া গেল।

আলোচনার পরিধি আরও বাড়ানো যায়। বলা যায় যে, আধুনিক জীবনের সংশয় বুদ্ধির বিপন্নতা সভ্যতার অবক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অনেক মৌল চিন্তা ছিল। বলা যায় যে, 'রূপসী বাংলা'য় না হোক, 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় সেই চিন্তার স্বাক্ষর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, জীবনের চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে যে প্রগাঢ় প্রত্যয় তিনি লালন করতেন— যা তাঁর আর্তিকে কখনও আর্তনাদে পর্যবসিত হতে দেয় নি— সেই প্রত্যয়ের সম্পর্কেও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা এখানে বলা যায়। কিন্তু আপাতত আলোচনার মধ্যে আমরা

যাব না। আপাতত শুধু এইটুকুই বলব যে, অন্তহীন বেদনাই ছিল তাঁর কবিসত্তার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞান; এবং সেই অভিজ্ঞান তাঁর এই বই-দুখানির মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে।—

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে ?'

স্বয়ং জীবনানন্দই বাসতেন। কিন্তু কী মহৎ সেই বেদনা, 'রূপসী বাংলা' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় আমরা আরও একবার তার প্রমাণ পেলাম।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

স্বীকৃতি

রাজশেখর বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র শ্রীআশা বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের চিঠি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত পারাবত চিত্রের ব্লক রবীন্দ্র-ভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্বরলিপি

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে ॥
ওই-যে দূরে কূলে কূলে ফাগুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে—
সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া, লাগে আমার পালে ॥
কোথায় তুমি মম অজানা সাথি
কাটাও বিজনে বিরহরাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

মধ্যলয়ে গেয়। গানটির বিশেষ গীতরূপ অবশ্যরক্ষণীয়

II সা -া রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা[ধ] -মপা [প]-মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ • মা • • • • • • • •• • • • • র্

I মা -া পা -মা । -পা -মা মণা [ধ]-ণা I মা -া -জ্ঞা -া । -া -া -রজ্ঞা -মপা I
আ • প • • • ন• • গা • • • •• •• •ন্

I সা -া রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা[ধ] -মপা [প]-মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ • মা • • • • • • • •• • • • • র্

I মা -পা পা -া । -পা -ধা -ণা[২] -র্সা I র্সধা -র্সা [র্স]ণা [ণ]-ধপা । পমা -ধপা মা -জ্ঞা I
আ • মা • • • • র্ অ• • গো •• চ• ••রে •

I -া -া -া -া । -া -া -মা -পা I সা -া রা -সা । -রা -সা -রা -সা I
• • • • • • • • আ • মা • • • • •

I -রা -পা[ধ] -মপা -মা[প] । -মা -জ্ঞা -া -মা I মা -পা পা -া । -া -া পা ধা I
• • ০০ ০ • • • র্ আ • মা • • র্ ম ন

I ণা[২] -র্সা র্সা -না । [ন]র্সা -ণা ণা -ধা I ধা -ণা -পা -া । -া -া পা ধা I
হ • র • ণ ০ ক • রে ০ • • • • নি য়ে

I না -া র্সা -া । র্রা -া র্রা -া I -া [র্স]-র্রা র্রা -র্মা । -র্জ্ঞা -া -া -া I
সে • যা য়্ ভা • সা ০ • • য়ে • • • • •

I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্মা [র্জ্ঞ]র্মা । র্রা -র্সা [ন]র্সা -ধা I [ধ]ণা -পা মপা -ধপা । মা -জ্ঞা -া -া I
স • ক০ ল সী • মা • রি • পা০ •• রে ০ • •

I রা -সা রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা[ধ] -মপা [প]-মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ ০ মা • • ০ • • • • •• • • • • র্

I মা -া [ম]ণা -ধা । ধা -া ধা -না I না -া র্সা -র্রা । র্সনা -া র্সা -া I
ও ই যে • দূ • রে • কূ • লে • কূ০ • লে •

I না -া র্সা না । [ন]র্সা -না র্সা র্সর্রা I না -র্সা -ণা[২] -ধা । ধা -ণপা পা -ধমা I
ফা ল্ গু ন উ চ্ ছ্ব সি০ ত • • • ফু •• লে ••

I মপা -ধপা মা -জ্ঞা । মা -া [ম]ণা ধা I ধা -া ধা -না । না -া র্সা -র্রা I
ফু০ ‥ লে • ও ই যে • দূ • রে • কূ • লে •

I র্সনা -া র্সা -া । না -া র্সা না I [ন]র্সা -না র্সা র্সর্রা । না -র্সা -ণা[২] -ধা I
কূ০ • লে • ফা ল্ গু ন উ চ্ ছ্ব সি• ত • • •

I ধা -ণপা পা -ধমা । মপা -ধপা মা -জ্ঞা I র্সনা র্সা র্রা র্রা । র্রা -া র্রা -া I
ফু •• লে •• ফু• •• লে • সে• থা হ তে আ • সে •

I -া -া র্রা -া । র্রর্মা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্জ্ঞর্মা -র্মা -র্রা -র্সা । -র্রা -না -র্সা -া I
• • দু • র ন্ ত হাও য়া • • • • • • • •

I র্সনা র্সর্রা নর্সা -ধা । ধণা -পা মপা -ধপা I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া -া -া I
লা• গে• আ • মা র্ পা• •• লে • • • • • • •

I রা -সা রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পাধ -মপা -পমা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ • মা • • • • • • • • • • • • র্

I মা -া মা -পা । পা পা পা পা I পা পা পা -া । পা -মপা ণা -দা I
কো • থা • তু মি ম ম অ জা না • সা • থি •

I -া -া -া -ণা । -পা -া -া -দা I মা -পা মা -ণা । ধা ধপা পণা -মা I
• • • • • • • • কা • টা ও বি জ• নে• •

I মা পা পণা -মা । মপধপা -মপা মা-জ্ঞা I মা -া মা -পা । পা পা পা পা I
বি র হ• • রা•• • • • তি • কো • থা • তু মি ম ম

I পা পা পা -া । পা -মপা পা -র্সা I -ণা -া -া -া । -া -া -া -ধা I
অ জা না • সা • থী • • • • • • • • •

I ধা -া ধা -ণা । ধা ধপা পণা -মা I মা পা পণা -মা । মপধপা-মপা মা-জ্ঞা I
কা • টা ও বি জ• নে• • বি র হ• • রা• • • • • তি •

I মা -া পা -া । পণা -পা না -া I না -া র্সা -র্রা । নপা -পা না না I
এ ॰ সো ॰ এ॰ ॰ সো ॰ উ ॰ ধা ও প॰ ॰ থে র্

I না -া র্সা -া । -া -া -া -া I র্সনা র্সা র্রা -া । র্রা -া -া -া I
যা ॰ ত্রী ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ত॰ রী আ ॰ মা ॰ ॰ য়্

I র্রা -া র্রা -র্সা । র্রা -র্সর্রা র্রা -র্মা I -র্জ্জা -া -া -া । -া -া -া -া I
ট ॰ লো ॰ ম ॰ ॰ লো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I র্জ্জা র্জ্জর্মা র্জ্জর্মা -র্রা । র্সর্রা -না -নর্সা -ধা I -ধণা -পা ধ-মপা -ধপা । মা -জ্জা -া -া II II
ভ রা॰ জো ॰ য়া ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ রে ॰ ॰ ॰

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

দিনরাত গড়্‌গড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে ॥
রবীন্দ্রনাথ
কবিগুরুর জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি
aaa/SER-RC.1

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY
PEARL
BARLEY
LILY
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪
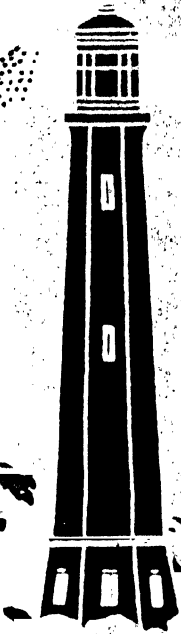
আপনার ব্লক
নির্ব্বাচন ও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34-3793
Gram. Otogravure
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা

অষ্টাদশ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের ক্রমিক চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্রসহ প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

আত্মচরিত

সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ : ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর

ভারতকথা

দাম : ৮·০০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭·৫০ টাকা

আর. জে. মিনির

চার্লস চ্যাপলিন

সচিত্র দাম : ৫·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় সংস্করণ : ২·৫০ টাকা

অনাগত। উপন্যাস : ২·০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন। উপন্যাস : ২·৫০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য। কবিতা-সঞ্চয়ন : ৩·০০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের

গীতায় স্বরাজ। দ্বিতীয় সং : ৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে : ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লি.

৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প ৪·০০

তিন শূন্য ৩·৫০

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি ৫·০০

যে যাই বলুক ৬·০০

প্রচ্ছদপট ৩·৫০

প্রেমের গল্প ৪·০০

শ্রীসুবোধ ঘোষের

ভারত প্রেমকথা ৬·০০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সারা রাত ৪·০০

মনের মানুষ ৩·০০

প্রেমের গল্প ৪·০০

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের

তিন দিন তিন রাত্রি ৫·০০

ময়ূরী ৩·০০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে ৩·৫০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত। ১০ম সং : ৬·০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ। ৬ষ্ঠ সং : ১·২৫

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিন্ময় বঙ্গ। তৃতীয় সং : ৪·০০

শ্রীসরলাবালা সরকারের

গল্পসংগ্রহ ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি.

৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

আপনার গৃহের শ্রীবৃদ্ধি
করতে
বেঙ্গল
ল্যাম্প
(জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)
অদ্বিতীয়

ছন্দময় হয়ে উঠুক আপনার জীবন
জীবনের প্রতিটি অণু পরমাণু নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে আবর্তিত। তাঁরই ছন্দের লীলায় আকাশে রঙ লাগে, পৃথিবীতে জাগে শ্যামলিমার জোয়ার, মানুষের মনে ওঠে সুরের ঝংকার। যুগে যুগে সুরের মায়াজালে মানুষের জীবনে সামান্য মুহূর্ত্তটী হয়ে উঠেছে অসামান্য, রয়ে গেছে চিরদিনের জন্য ---
সুনির্ব্বাচিত বাদ্য যন্ত্রের একমাত্র পরিবেশক—
পত্র লিখিলে সচিত্র মূল্য তালিকা পাঠানো হয়।
টেলিফোন :

যুগপরম্পরায় চলেছে রূপের সাধনা কেশের পরিচর্য্যা—বিশেষ করে নারী জাতির। বর্ত্তমান যুগে ও চলেছে সেই নারীর রূপের আরাধনা। এ আরাধনায় নারী তার আলুলায়িত কেশকে সুরভিত ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলবে--।
কিং কোর 'আর্ণিকা হেয়ার অয়েল' ব্যবহার করে এ যুগের নারী। রূপের সাধনায় আরও অপরূপ হয়ে উঠবে।
KINGKO'S
Arnica
HAIR OIL
King & Co
কিং কো'র
হেয়ার অয়েল
প্রস্তুত কারক- কিং এণ্ড কোং কলিকাতা-৭
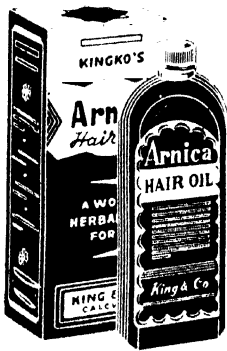
বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১৭
শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান	ক্ষিতিমোহন সেন	৩২৪
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩২৮
রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৩৩৯
রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ	শ্রীসুকুমার সেন	৩৪৯
রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষা	শ্রীহিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৬৫
'অর্ঘ্যাভিহরণ'		৩৭৮
ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ	শ্রীবিনয় ঘোষ	৩৮৩
অগ্রদূত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	৩৯৮
রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম	শ্রীপরিমল গোস্বামী	৪১৯
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা	শ্রীঅমিয়কুমার সেন	৪২৬
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি	শ্রীশান্তিদেব ঘোষ	৪৩১
বিচিত্রা-পর্ব : স্মৃতিকথা	শ্রীসুকুমার বসু	৪৩৭
চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৪৭
রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান	শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৪৪৯
শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি		
বিজয়চন্দ্র মজুমদার	শ্রীসুনীতি দেবী	৪৬১
নীলরতন সরকার	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪৬৭
বিংশ শতাব্দীর কাব্যসূচনা	শ্রীভবতোষ দত্ত	৪৭৭
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮৮
	শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	৪৯১
স্বরলিপি : 'আমি আশায় আশায় থাকি'	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	৪৯৪
সম্পাদকের নিবেদন		৪৯৭

চিত্রসূচী পরপৃষ্ঠায়

মূল্য এক টাকা

চিত্রসূচী

বহুবর্ণ চিত্র রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ৩১৭

রবীন্দ্রনাথ : আনুমানিক পনেরো বৎসর বয়সে ৩২০

'অর্ঘ্যাভিহরণ'-অনুষ্ঠানলিপি ৩৭৮

রাজা নাটকের অনুষ্ঠানসূচী। ১৩১৮ ৩৮১

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি ৩৮৪

পাথুরিয়াঘাটা-ঠাকুরবাড়ি ৩৮৫

ফোর্ট উইলিয়ম। ১৭৩৬ ৩৯২

গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির। ১৭৯২ ৩৯২

এসপ্লানেড। ১৮৩৮ ৩৯৩

চিৎপুর রোডের একাংশ। ১৭৯২ ৩৯৩

'বিচিত্রা' ৪৩৮

'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি ৪৩৯

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৪৪

ডাকঘর অভিনয়ের দৃশ্য ৪৪৫

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৪৬৬

নীলরতন সরকার ৪৬৭

চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ ৪৭২

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক
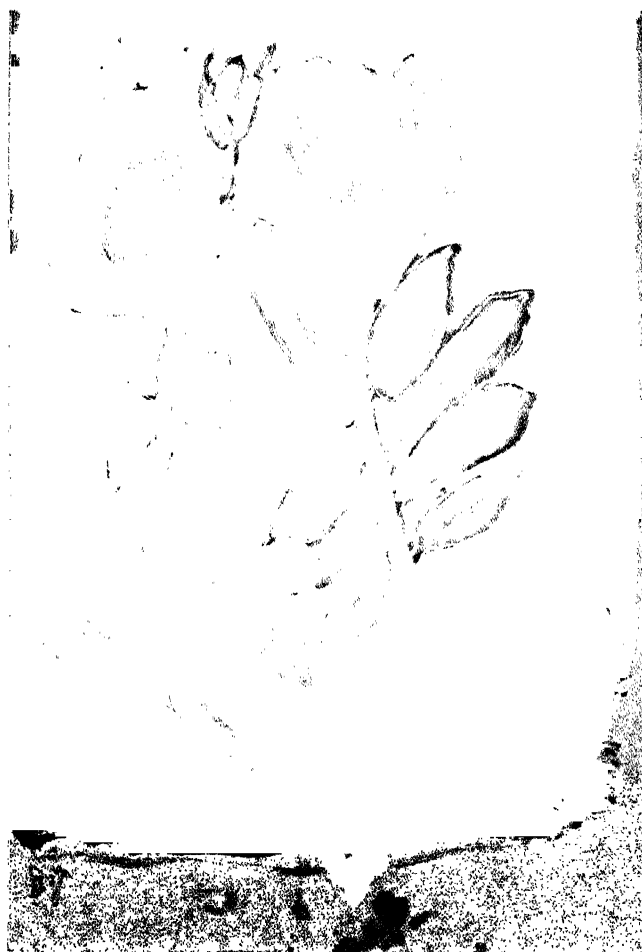
ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভার লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নির্জ্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। সেক্সপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়-চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীন কালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই

অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookhও Lyric Poetry, Irish Melodiesও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতি-কাব্য বলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জ্জীব হইয়া আছে, আবার বাঙ্গলার জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ নির্জ্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত; যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ অষ্ঠে পৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদ-বধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির প্রথম অশ্রুজল। সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজি কালি বাঙ্গালা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নির্জ্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জলন্ত অনল! 'মিলে সবে ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজ কালি বালক পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক! সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ওসকল কথা আর

আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে! এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্য্যসঙ্গীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই; তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একই রূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই সেক্সপীয়র কহিয়াছেন "Words to the heat of deed too cold breath give". তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে!

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী এই তিনখানি গীতিকাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্য্যসঙ্গীত আছে, কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্ব্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনী পড়িলে দেখিবে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দ্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জ্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জ্জিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর-একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাঁহার কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন কেননা যশেচ্ছাই তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুবকের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিরা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভাল হয়, কেননা তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভাল করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিম্বা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংসমধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসরসরোজিনীর "মধুমক্ষিকা-দংশন" ও "প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী" ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

"THE WOUNDED CUPID"

Cupid, as he lay among
Roses, by a bee was stung.
Whereupon, in anger flying
To his mother said thus, crying,
Help, O help, your boy's a-dying!
And why my pretty lad, said she.
Then, blubbering, replied he,
A winged snake has beaten me,
Which country people call a bee.
At which she smiled; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she, my wag! if this
Such a perniceous torment is;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart?

"HERRICK"

মধুমক্ষিকা-দংশন

একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুমরতন
রচিল শয়ন মনের মতন,

*

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন
মুদিয়ে নয়ন রহিল মদন

*

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়

রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক পনেরো বৎসর বয়সে

প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।
"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিল রতিরে
রতিনাথ, "প্রাণ যায় যে অচিরে

*

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল
কি হবে কি করি প্রাণ যে যায়!"

*

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে,
"ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

*

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?"

Flow on thou shining river;
But ere thou reach the sea,
Seek Ella's bower and give her
The wreath I fling o'er thee etc.

MOORE

প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনি!
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে!
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমলকুসুমমালা, দিয়ে করে তার।

ইত্যাদি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাঙ্গালা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

বাঙ্গালী ভায়ারা করি নিবেদন
যোড় করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ!
যা কিছু বলিনু ভালরি কারণ
ভাবি দেখ মনে কোরনা রাগ।

রাগ ত করনা দাসত্ব করিতে
রাগ ত করনা নিগার হইতে
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ !
এসব করিতে রাগ যদি নাই
আমার কথায় রেগোনা দোহাই
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হ'লে !

অবসরসরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু "বাঙ্গালী ভায়ারা" ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোন ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জলন্ত তেজ নাই। তিনি 'কেন ভালবাসির ?'র ন্যায় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও তাঁহার 'প্রিয়তমা হাসিল'র ন্যায় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশলবাক্যের আড়ম্বর আছে, কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বদ্ধ রচনা অনেক আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাঁহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার !
সম্বনে নিম্বনে মলয় পবন,
আহরি সুরভি নন্দনরতন
মন্দারসৌরভ অমৃতরাশি
মর্ম্মরিছে তরু অটল ভূধর,
দমিছে দাপেতে কাঁপিছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না ! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি ! যখন প্রতিভার 'পিশাচী' 'প্রেতিনী' ময়ী কবিতার মধ্যে কোন কর্কশ কথা পাই তখনি ভুবন-মোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি। একজনকে আমি 'উন্মাদিনী' কবিতার

অর্থ বুঝাইতে বলি, তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি মাধুর্য্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য্য কল্পনা করে; এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্ব্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

'সরোজিনী' ও 'প্রতিভা' পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। 'দুঃখসঙ্গিনী'তে আর্য্যসঙ্গীত নাই, আর্য্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, নৈরাশ্য আছে, দ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত! এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে, তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদ-জনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেল! তাহা দমন করিয়া তুমি বলপূর্ব্বক যেন 'ভারত' 'একতা' 'যবন' প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করিও না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উত্থিত হয় না। দুঃখ-সঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি— তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেইখানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের মধ্যে হইতে আমরা অনেক সুন্দর পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে পারিলাম না।

এই রচনাটির পরিচয় এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'অগ্রদূত' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান

ক্ষিতিমোহন সেন

শুভ্র আলোকের মঙ্গলশঙ্খ আকাশ ভরিয়া যুগে যুগে বাজিয়া আসিতেছে। সর্বত্রই তো তাঁহার কল্যাণশঙ্খ বাজিতেছে। আকাশে তাহা বাজিতেছে শুভ্র জ্যোতিতে, প্রকৃতির মধ্যে বাজিয়াছে পুষ্পবনের পুণ্যগন্ধে ও বিহঙ্গকলসংগীতে, মানবের মধ্যে বাজিয়াছে প্রেমমৈত্রীর কল্যাণতপস্যায় ও ত্যাগে। তিমির পরপার হইতে আজ সেই মহাজাগরণের সুমহান্ আহ্বানকে বিমলতর পুণ্যকর-পরশ-হরষিত হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

মানব-কল্যাণ-তপস্যার এই আহ্বানই প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিদের সুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে; তপস্তে আকাশন্ (তৈ. ব্রা., ৩, ১২. ৭৪)। এই তপস্যাই আকাশে আলোকরূপে দীপ্যমান। তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ সত্যং চ ত্যাগশ্চ ধর্মশ্চ সত্যং চ॥ এই শঙ্খই বাজিয়াছে মানবীয় সাধনার তপস্যায়, তাহাই বাজিতেছে আকাশের তেজোময় শুভ্র আলোকে, তাহাই বাজিতেছে মানবের শ্রদ্ধায়, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে সকল সত্যে, সকল ত্যাগে। তাহারই নাম ধর্ম, তাহারই নাম সত্য।

সেই বিশ্ব-সত্যই মানব-তপস্যায় আপনাকে খুঁজিতেছে। সেই মঙ্গলশঙ্খের মূলাধার পরম সত্যকেই ঋষিরা বলিয়াছেন, সত্যং অসি (তৈ. সং. ১ ৬. ১১), তুমিই সত্য। জ্যোতিরসি (অ. ২. ১১. ৫), তুমিই জ্যোতি। জ্যোতির্জনায় শশ্বতে (ঋ. ১. ৩৬. ১৯), তুমিই বিশ্বমানবের শাশ্বত কল্যাণের জ্যোতি। তোমারই জয়, আর জয় জয় তোমারই কল্যাণের সঙ্গে অনুগত যুক্ত মানবের মঙ্গল-তপস্যায়। তপসে স্বাহা (বা. সং. ২২, ৩১), জয় হউক সেই তপস্যার। প্রবুধ্যস্ব সুবুধা বুধ্যমানা (অ. ১৪. ২. ৭৫)। বিশ্ব-চরাচরব্যাপী সেই কল্যাণশঙ্খের শোভন মঙ্গল জাগরণে সকলে বুধ্যমান হইয়া আজ জাগ্রত হউক; প্রবুদ্ধ হউক। আজ জগৎ অকল্যাণের দুঃস্বপ্নে প্রপীড়িত; মোহ ঘুচুক, দুর্গতি দূর হউক।

সেই তপস্যাতে আগে হইতেই যিনি জাগিয়াছেন তিনিই যথার্থ তপস্বী— তপসা তপস্বী, (অথর্ব, ১৩. ২. ২৫)। আগে হইতেই মানবকল্যাণের জাগ্রত সেইসব তপস্বীদের জয় হউক। এখন যাঁহারা সেই কল্যাণ-তপস্যায় জাগিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও জয় হউক। ভবিষ্যতে যাঁহারা কল্যাণের সেই মহাতপস্যায় জাগিবেন, তাঁহাদেরও জয়-জয়কার হউক।

জাগরিতায় স্বাহা
জাগ্রতে স্বাহা
জাগরিষ্যতে স্বাহা— তৈ. সং. ৭. ১. ১৯. ২

এই তপস্যার জন্যই ভবিষ্যৎ তপস্বীদের জাগাইতে গম্ভীর কণ্ঠে কঠোপনিষৎ ডাক দিয়াছেন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।—কঠ, ৩. ১৪

এই শূন্য প্রান্তরের বিশাল বক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই বিরাট ডাকই রাখিয়া গিয়াছেন। আজও বিশ্বজগৎ ভরিয়া সেই আহ্বান-ভারতীই ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার দীক্ষাদিন— আহ্বানের দিনটিকে ধরিয়া এই প্রান্তরে তিনি তাঁহার বিরাট দীক্ষামন্ত্রটি মন্ত্রিত করিলেন। সেই পুণ্যদিনে সেই কল্যাণশঙ্খে ধ্বনিত

হইল—এখানে দীক্ষার যজ্ঞ-অগ্নি জ্বলিয়াছে। সকলে সর্বদিক হইতে এখানে চলিয়া আইস—আয়ন্তু সর্বে সর্বতঃ স্বাহা।

ইহাই কি সত্য? দীক্ষাদিনের ডাক কি আজও ধ্বনিত হইতেছে? নিশ্চয়। সেই ধ্বনির কি অবসান আছে? সেই ধ্বনি এখনো মন্দ্রিত হইয়াই চলিয়াছে। সেই শাশ্বত ঘোষণার কখনো মৃত্যু নাই। কান থাকিলে শুনিবে, চক্ষু থাকিলে দেখিবে।

পশ্যদক্ষণ্বান্ ন বিচেতদন্ধঃ —ঋ ১, ১৬৪, ১৬

যখন কেহ সেই আহ্বান শুনিতে পায়, তখনই ব্রহ্ম তাহার জীবনে হন দীপ্যমান। এই ধ্বনি শুনিতে না পাওয়ার অর্থই মৃত্যু।

এত দ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণোতি অথৈ তম্রিয়তে যন্ন শৃণোতি।

শান্তিনিকেতনের দীক্ষা আহ্বানের মৃত্যু নাই। মহর্ষির সেই ঘোষণার মুহূর্তটি ক্ষণ হইলেও মানব-কল্যাণ-তপস্যার অমৃতপরশে শাশ্বত অক্ষর হইয়া চিরদিন বিরাজ করিবে। কেমন করিয়া তবে বিলয়ধর্মী কাল অমৃতত্ব লাভ করিল?

বৃষ্টির বিন্দু মুহূর্তে বিলীন হয়। তাহাই যদি স্বাতী নক্ষত্রের শুভলগ্নে শুক্তিতে প্রবেশ করে তবে তাহাই হয় মুক্তা। উপমা মিথ্যা হইলেও এ কথা চিরসত্য যে বিশ্বমানবের কল্যাণ-তপস্যায় মৃত্যুহীন অমৃতলগ্নের বিনাশ নাই। সেই মুহূর্তে তাহা যথার্থ কল্যাণপরশ লাভ করিল, সেই মুহূর্তেই তাহা সকল বিশ্বের। শুক্তি যাহারই হউক, মুক্তার মুক্ত সৌন্দর্য নিখিল মানবের। এখানে বৈষয়িক অধিকার যাহারই হউক, এখানকার চিন্ময় অধ্যাত্মসম্পদ্ বিশ্বসংসারের। তাই আশ্রমের উৎসবে সবারই চিরন্তন অধিকার। এই উৎসব-আহ্বান মহর্ষি সকলকে সর্বকালের জন্য দিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মসাধনার ও তপস্যার এই দান লইয়া এখনকার বিজ্ঞান-শাসিত দিনে কি লাভ হইবে? তাহা ছাড়া এ কথাও অনেকে মনে করেন ধর্ম একটা বৃথা ভাব-বিলাসিতা মাত্র। ধর্ম মনের ভাব-সৌন্দর্য, অনুরাগ-ভক্তি-মৈত্রী প্রভৃতি চিন্ময় আনন্দলীলা মাত্র। এখনকার দিনে এইসব সৌন্দর্য ও ভাব-বিলাসিতা লইয়া কী হইবে?

কে বলিল ধর্ম ও মৈত্রী শুধু ভাব-বিলাসিতা? চিন্ময় আনন্দেরও প্রয়োজন আছে। যিনি অরণ্যের কাছে কাষ্ঠ চান, তিনি যদি সৌন্দর্যমাত্র বলিয়া ফুলগুলিকে অরণ্য হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাষ্ঠেরও আশা হয় তিরোহিত। মায়ের বুকের চিন্ময় স্নেহের মধ্যেই জীবশিশু বাড়িয়া উঠে। হাসপাতালের বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিদ্যাতেই যদি সৃষ্টি চলিত তবে আর মাতৃস্নেহের কোনো মূল্য থাকিত না। চিন্ময় সৌন্দর্য বিলাসিতা নহে, স্নেহ-প্রেমও বিলাসিতা নহে। সমস্ত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির মূলাধারই এই বিস্ময় স্নেহ-সৌন্দর্য।

ধর্ম শুধু সৌন্দর্য ও প্রীতি বা মৈত্রীমাত্র নহে। ধর্ম আমাদের সমস্ত জীবনের মূলগত সংযম ও তপস্যা। যেখানে শক্তি ও বেগ সেইখানেই চাই সংযম। তাহা না হইলে সকল শক্তি ও বেগের পরিণতি হইবে প্রলয়ে। পালে বাতাস লাগে যতই জোরে, ততই দৃঢ় হাতে ধরিতে হয় নৌকার হাল। অশ্ব যতই শক্তিশালী, লাগাম ততই শক্ত হওয়া চাই। নহিলেই সমূহ বিপদ।

বিজ্ঞানও প্রচণ্ড শক্তি। এই অন্ধশক্তিকে যদি ধর্ম অর্থাৎ মানবীয় স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা চালিত না করা

হয়। যদি জনকল্যাণ তাহার লক্ষ্য না হয় তবে যে কী সর্বনাশ হইতে পারে তাহা য়ুরোপ ও আমেরিকা ক্রমেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধর্ম হইতে বিমুখ হইলে বিজ্ঞান কী নিষ্ঠুরই হইতে পারে! অথচ ধর্মের সহায়তায় বিজ্ঞানের সম্পদের অন্ত নাই। মানবের কত কল্যাণই বিজ্ঞান না করিতে পারে! ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে কিছুতেই চলিবে না। হাজার হাজার বছর আগে এই কথাই ঈশোপনিষৎ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ —ঈশ. ৯

যাঁহারা অবিদ্যা অর্থাৎ শুধু পার্থিব ভৌতিক বিদ্যার (বিজ্ঞান) উপাসনা করেন তাঁহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। আর যাঁহারা শুধু অধ্যাত্ম বিদ্যায় রত। তাঁহারা তদপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হন।

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে।—ঈশ. ১১

আর যাঁহারা পার্থিব বিদ্যা ও অধ্যাত্ম বিদ্যা একত্র যুক্ত করিয়া জানেন তাঁহারা পার্থিব বিদ্যার কল্যাণে মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

মহর্ষির সাধনার মধ্যে উভয় বিদ্যার এই সামঞ্জস্যটি সুব্যবস্থিত ছিল। তাই এখানে তিনি ধর্মসাধনার তপস্যা করিয়াও উত্তরকালের জ্ঞান ও সৌন্দর্য সাধনার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষির সেই কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিলেন। তাই আজ এই সাধনার স্থানে বিশ্বমানবের অবাধ আমন্ত্রণ বিঘোষিত।— শান্তিনিকেতনে জগতের কল্যাণের জন্য মহাসামঞ্জস্য সাধিত হইবে!

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, বাণীতেই প্রকাশ করা ছিল তাঁর পক্ষে সহজ। নির্জন পদ্মাতীরে তিনি তাঁহার কবিসাধনার আসনে বসিয়া এই মৈত্রীসাধনার কথা কত কবিতায় কত গানে না প্রকাশ করিলেন! কিন্তু কেবল কথা ও সুরে সেই সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। এই জন্যই তাঁহাকে আসিতে হইল শান্তিনিকেতনের এই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে। সেখানে বিদ্যা ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া তিনি তাহারই প্রকাশ দিতে চাহিলেন— ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। কর্মে তিনি সেই মন্ত্রের প্রকাশ দিলেন শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবার কাজে। যে-মন্ত্র তিনি চেতনায় লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে কেবল চেতনায় আবদ্ধ না রাখিয়া তিনি নিখিল লোককল্যাণে ব্যাপ্ত করিতে চাহিলেন। এই যে প্রসার, এই যে প্রকাশ, তাহারই উপর তাঁহার বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। এই সাধনার প্রথমে তিনি শুধু ভারতবর্ষকেই ডাকিয়াছিলেন। অচিরেই তিনি উপলব্ধি করিলেন এই মহামন্ত্র, তার প্রয়োজন সর্বসাধারণের জন্য, সাধনার জন্য সমস্ত বিশ্বের সহযোগ প্রার্থনীয়। প্রথম যুগের ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপান্তরিত হইল বিশ্বভারতীতে।

গুরুদেব আজ পরলোকে। কিন্তু তিনি তাঁহার আহ্বান রাখিয়া গিয়াছেন এই বিশ্বভারতীতে— যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। সেই ডাকে সমস্ত বিশ্বের সাধনা এইখানে একত্রিত হউক, সিদ্ধ হউক এবং সর্বত্র প্রসারিত হইয়া জগতের সমস্ত অকল্যাণকে বিদূরিত করুক— জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

আজ সারা জগতে এই সাধনতীর্থের মুক্ত তপস্যার অতিশয় প্রয়োজন। আজ পৃথিবী বিপন্ন। প্রতীচ্য তাহার বৈজ্ঞানিক দারুণ শক্তি ও দুর্বার অস্ত্রসম্ভারে বিপন্ন ও নিরুপায় হইয়া এই দেশেরই কল্যাণসাধনার দিকে চাহিয়া আছে। আজ ভারত যদি প্রতীচীর এই বিপদের দিনে সাড়া না দেয় তবে বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রভয়ে নিপীড়িত ভীত বিপন্ন পৃথিবীর আর উপায় নাই।

আজ ভারত যদি শুধু তাহার প্রাচীন তপস্যা লইয়াই বসিয়া থাকে বা য়ুরোপ-আমেরিকা যদি শুধু তাহার নবলব্ধ পার্থিব বিজ্ঞানযন্ত্র লইয়াই খুশি থাকে তবে চলিবে না। শিব-শক্তির মিলন না হইলে সৃষ্টি আর থাকে না। এই শিব-শক্তির মিলন না হইলে মহতী বিনষ্টিঃ।

আর আজ ভারত যদি তাহার তথাকথিত স্বাধীনতা পাইয়া হীনস্বার্থ ও সংকীর্ণতা বশত আপন কল্যাণব্রত হইতে সত্য তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হয় তবে সেই দুঃখের আর অন্ত নাই। সে "বিনষ্টি"র আর শেষ নাই, তাহা জগতের সর্বনাশ

বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতি শত মূর্খঃ।
দৌর্ভিক্ষদ যাতি দৌর্ভিক্ষং কষ্টাৎ কষ্টং ভয়াদ্ভয়ম্॥

কাজেই ভারতকে আজ তাহার চিরন্তন মহদাদর্শে অটল থাকিতে হইবে। এবং আজ এই বিপদের দিনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনাকে মিলিতে হইবে। এই মিলন সাধনাই যথার্থ যোগ্য, তাং যোগমিতি মন্যন্তে—কঠ, ৬, ১১। মানবের যেমন দেহ আছে, তেমনি আত্মাও আছে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন দেহ অমেধ্য শবমাত্র এবং দেহ হইতে বিচ্যুত অশরীরী আত্মাকে সকলে দারুণ ভূত বলিয়াই ভয় পায়। দেহ বিনা আত্মা নিষ্ক্রিয়; আর আত্মা ছাড়া দেহ নির্জীব অকর্মণ্য। ইহাকেই সংস্কৃতে বলে অন্ধপঙ্গুন্যায়। চক্ষুষ্মান পঙ্গু আত্মাকে পাইয়া অন্ধ দেহ ধন্য; আর চলচ্ছক্তিসম্পন্ন অন্ধ দেহকে পাইয়া আত্মা সার্থক। আজ তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ছাড়া কোনো গতি নাই। দানবশক্তিকে মানবধর্মের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করিলেই নিখিল চরাচরের পরম কল্যাণ।

মহর্ষির এই সাধনার ক্ষেত্রে সেই পরিপূর্ণ যোগের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। এখানে বেদ-উপনিষদের সাধনা, ভাগবতদের ভক্তি, জৈন বৌদ্ধদের অহিংসা ও মৈত্রী, শৈবদের তপস্যা, বৈষ্ণবদের প্রেম, সাধুসন্তদের সাধনা সব যুক্ত হইয়া নবযুগের সাধনাকে এই মহাযোগতীর্থে আহ্বান করিতেছে। এখানে শুধু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নহে, এখানে নিখিল সাধনার ধারা যুক্ত হইবে। এই মুক্তিতীর্থে সকল চরাচরের প্রতি সকল মানবের প্রতি শাশ্বত আহ্বান আসিয়াছে।

সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। —শ্বেত', ৩, ৪

সকলে সবার পরমকল্যাণের জন্য এখানে আসিয়া যুক্ত হউন।

শান্তিনিকেতন, ১৩৫৫

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬

বৃহস্পতিবার, ১০ই অক্টোবর ১৯২৭

প্রাতরাশ সেরে আজ সকাল ন-টায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুম আর একজন রাজকুমারের বাড়ীতে— Prince Narisra, নরিস্রা বা নরেশ্বর। ইনি প্রবীণ ব্যক্তি, ইংরিজি জানেন না। ইনি একজন ভাল চিত্রকর। যে বড়ো বৈঠকখানা ঘরে আমাদের স্বাগত ক'রলেন, সেখানে এঁরই আঁকা একটি মস্ত বড়ো রঙীন বিষ্ণুমূর্তি দেখলুম। অনন্ত নাগের উপর নারায়ণ, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর সঙ্গে ব'সে। এখানে এই ব্যাপারে বাঙ্লাদেশের সঙ্গে শ্যামদেশের মিল আছে। বাঙ্‌লাদেশে বিষ্ণুর দুই পত্নী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী। প্রাচীন বাঙ্‌লার পাল আর সেন যুগের পাথরের আর ধাতুর বিষ্ণুমূর্তিতে বিষ্ণুর দু-পাশে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে থাকেন লক্ষ্মীদেবী আর সরস্বতীদেবী, আবার বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় লক্ষ্মীদেবী আর ভূদেবী বা পৃথিবীদেবী। দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুর সঙ্গে সরস্বতী থাকেন না— থাকেন লক্ষ্মী আর ভূদেবী। বাঙ্‌লাদেশে সাধারণতঃ সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী এবং লক্ষ্মীর সপত্নী ব'লে পরিচিত। কিন্তু বাঙ্‌লার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যত্র অনেক জায়গায় সরস্বতী হচ্ছেন ব্রহ্মার পত্নী। এক্ষেত্রে শ্যামদেশে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর দেবকাহিনী প্রচলিত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশের একটু বিশেষ যোগ দেখা যাচ্ছে। রাজকুমার নরেশ্বর শ্যামের প্রাচীন শিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ দেখে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এই শিল্পের বাছা-বাছা কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জিনিসের ছবি তিনি পরে কবিকে পাঠিয়ে' দেবেন।

রাজকুমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলুম আর একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখ্‌তে— Wat Sudat বা Wat Sudasn অর্থাৎ 'সুদর্শন' মন্দির। এটি মন্দিরও বটে, আর ভিক্ষুদের থাকবার বিহারও বটে। এই মন্দিরের দেওয়ালে প্রাচীন পদ্ধতির শ্যামী ভিত্তিচিত্র অনেক আছে, বৌদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় শ্যামী জীবন-যাত্রার চমৎকার নিদর্শন এই সব ছবিতে আছে। ব্রোঞ্জের কতকগুলি ঘোড়ার মূর্তিও এই মন্দিরে আছে। মঠাধিকারী একজন অল্প-বয়সী শ্যামী ভিক্ষু। কথাবার্তায় জানা গেল তিনি কিছু পালিও জানেন।

কবি এর পরে হোটেলে ফিরে গেলেন, কারণ তাঁকে নিয়ে এত ঘোরাফেরা চলে না। একে তাঁর বয়স হ'য়েছে, তা-ছাড়া অল্প একটু ঘুরলেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। আমাদের সঙ্গে যে শ্যামী অফিসারটি শ্যামদেশের সরকারের পক্ষ থেকে সব দেখিয়ে' শুনিয়ে' বেড়াচ্ছিলেন, সেই ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ, তিনি একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন—তাঁর ভাবনা হ'চ্ছিল এই যে, সরকার থেকে যেখানে-যেখানে কবিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রোগ্রাম ক'রে দিয়ে তাঁর উপর নিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হ'য়েছে, সেই প্রোগ্রাম-মোতাবেক সব জায়গায় কবিকে না নিয়ে গেলে তাঁর কর্তব্যের খেলাপ হবে, তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যেন তাঁকে জবাবদিহি ক'রতে হবে। এই কারণে তাঁর একটু বেশী আগ্রহ ছিল, যেন কবিকে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেটা না হওয়ায় তিনিও যেন একটু অস্বস্তিতে প'ড়লেন। যা-হ'ক্‌, তিনি কেবল আমাদের সঙ্গে ক'রে বাকি কয় জায়গায় নিয়ে গেলেন, প্রোগ্রামের খেলাপ হ'ল না।

আমাদের তার পরে নিয়ে গেলেন এখানকার স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মন্দিরে। শ্যামী ব্রাহ্মণেরা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, তার নানা প্রমাণ আছে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কম্বুজ বা কাম্বোডিয়ার রাজবংশের পত্তন করেন দক্ষিণ-ভারত থেকে আগত 'কম্বু' নামে একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ঐ দেশে এসে বাস ক'রতে থাকেন, আর 'মেরা' নামে একজন 'অপ্সরা' অর্থাৎ স্থানীয় অভিজাত বংশের কন্যা অথবা রাজ-কুমারীকে বিয়ে করেন। কম্বু আর মেরার পুত্র কাম্বোডিয়ার সূর্য্য-বংশীয় রাজ-কুলের আদি-পুরুষ। আবার চম্পা বা কোচিন-চীনের সোম বা চন্দ্র-বংশীয় রাজ-কুলের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দক্ষিণ-ভারত থেকে আগত 'কৌণ্ডিন্য' নামে আর একজন ব্রাহ্মণ। ইনি 'সোমা' নামে একটি স্থানীয় 'নাগ-কন্যা' অর্থাৎ এখানকার চাম্-জাতির কুমারীকে বিবাহ করেন। এই চম্পা দেশ (কোচিন-চীন, এখনকার দক্ষিণ-ভিয়েৎ-নাম) সেকালে চাম্ বা আদি-চম্পা জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল ; এরা এখনকার ভিয়েৎ-নামী জাতির দ্বারা বিজিত হয়, আর এখন এরা প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা আর ক্ষত্রিয় আর অন্য জাতির লোকেরা এই দেশে এসে বিয়ে-থা ক'রত, স্বদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অন্য-ভাবে থাকলেও, বৈবাহিক আদান-প্রদান, অত দূর দেশ ব'লে, আর হ'তে পা'র্‌ত না। শ্যাম-দেশের ব্রাহ্মণদের চেহারা দেখ্‌লে বোঝা যায় যে এঁরা মিশ্র জাতির মানুষ। গায়ের রঙ্ গৌর-বর্ণ, তবে অন্য শ্যামীদের তুলনায় একটু ময়লা-মতন। কারণ, অপেক্ষাকৃত শ্যাম-বর্ণ ভারতীয় জাতির সঙ্গে মিশ্রণ হ'য়েছিল। মিশ্র জাতির হ'লেও, ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, সংস্কৃত-চর্চা এই সমস্তই এঁরা পূরাপূরি বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রে এসেছেন। প্রাচীন কালে শ্যামীরা ফানুম বা মাল-কোঁচা দিয়ে লুঙ্গি প'রত— মেয়ে পুরুষ দুই-ই,— আর গায়ে একখানা চাদর রাখ্‌ত। এখানকার ব্রাহ্মণদের পোশাকও ঐ রকমের ছিল। তবে আজকাল কোনও-কিছু সরকারী ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিক-ভাবে যোগ দিতে হ'লে, তাঁদের নীল বা শাদা রঙের ফানুম, আর সাদা কাপড়ের গলা-আঁটা কোট প'রতে হয়। শ্যামী জাতির মানুষের মতন এখানকার ব্রাহ্মণদের মুখে দাড়ি-গোঁফ কম। তবে মাথার উপরে সকলে চূড়ার আকারের একটি বড়ো টিকি বা ঝুঁটি রাখেন— প্রায় পাকানো বেণী ব'ললেই হয়— সেটিকে মাথার উপরে গোল ক'রে পাকিয়ে', তা'তে ২।১টি ফুল গুঁজে রাখেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্দিরটির স্থানীয় নাম হ'চ্ছে Bot Bhram, 'ব্যোৎ-ফ্রাম', 'ফ্রাম' শব্দটি হ'চ্ছে সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ', অথবা 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দের শ্যামী বিকার। এই মন্দিরে আমাদের জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রতীক্ষা ক'রছিলেন— সকলেরই গায়ে সাদা কোট, পরণে নীল রঙের ফানুম, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত সাদা মোজা, বিলিতি জুতা, আর মাথার চূড়ার মধ্যে ফুল গোঁজা। এঁদের মধ্যে দেখ্‌তে বেশ সুন্দর এবং সৌম্য চেহারার একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন। এঁরা কেউ ইংরিজি জানেন না। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ যথারীতি দোভাষীর কাজ ক'রলেন। মন্দিরের প্রধান দেবতা হ'চ্ছেন শিব। বেদির উপরে একটা ব্রোঞ্জের তৈরী মস্ত বড়ো শিব-মূর্তি, আর তা ছাড়া বেদির আশে-পাশে অন্য নানা দেবতার ছোটো-ছোটো মূর্তি। শ্যামদেশে ভারতের হিন্দু দেবতাদের পোশাকে এবং মুখাবয়বে যে পরিবর্তন হ'য়েছে, তার কিছুটা উল্লেখ উপরে ক'রেছি। এই দেশে গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্তি খুবই লোকপ্রিয়। বৌদ্ধ মন্দিরে দেখেছি, বুদ্ধ-মূর্তির কাছে-পিঠে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী বা বসুধারা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, Naug-Thoroni নাঙ-থরনি অর্থাৎ ধরণী বা পৃথিবী দেবী— এঁদের মূর্তিও খুব দেখা যায়। বেদির সামনে আমাদের বস্‌বার জন্য কতকগুলি চেয়ার পাতা ছিল। ব্রাহ্মণেরা কি রীতিতে তাঁদের পূজার অনুষ্ঠান করেন, সেটা দেখা হ'ল না, তবে বেদির উপর ফুল, পঞ্চপাত্র, শাঁখ, প্রদীপ ইত্যাদি সব ছিল। ওঁরা কিভাবে মন্ত্র পড়েন তা

জান্‌বার ইচ্ছা হওয়ায়, কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্র প'ড়ে ওঁরা শোনালেন— উচ্চারণ একেবারে দুর্বোধ্য নয়, তবে তাতে শ্যামী ভাষার ছাপ স্পষ্ট। ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থা আর শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। শ্যামদেশে প্রাচীন ভারতীয় রীতি কিছু-কিছু বিদ্যমান, অনেকটা বর্মারই মত। অনেকগুলি হিন্দু ও ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান যা বুদ্ধদেব নিজে পালন করেছিলেন, সেগুলি এখানেও চলে। যেমন, নামকরণ, ছোটো ছেলেদের কর্ণবেধ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আস্‌তে হয়। তাঁরাই শ্যামী গৃহস্থদের ঘরে পূজা অর্চনা মন্ত্রপাঠ ক'রে থাকেন। এখন অবশ্য এইগুলি অনেকটা উঠে যাচ্ছে। কিন্তু রাজ-পরিবারের মধ্যে, আর বড়ো-বড়ো সামন্ত আর জমিদারদের ঘরে, প্রাচীন আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান অনেক আছে। শ্যামদেশে নূতন রাজার অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণদের একটা মস্ত বড়ো স্থান আছে। এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি বয়সে আর বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রবীণ, তাঁকে স্বয়ং কাশীতে এসে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে হয়, তাতে রাজার অভিষেক হয়। আমরা যেদিন বাংকক শহরে এসেছিলুম, সেদিন বিজয়া দশমীর দিন। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অনুসরণে শ্যামী ফৌজের এক বিরাট্ প্যারেড হ'ল, তখন প্রত্যেক সেনাদলের ঝাণ্ডা আনা হ'ল মন্ত্রপূত করবার জন্য, দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডপে— একটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হ'ল্‌দে কাপড় প'রে জমা হ'য়েছিলেন, তাঁরা পালি মন্ত্র প'ড়ে যুদ্ধের ঝাণ্ডা বা পতাকার উদ্দেশ্যে মঙ্গল-কামনা ক'রলেন, তারপর আর একটি মণ্ডপে সাদা জামা পরা, মাথায় চূড়া, পায়ে জুতা শ্যামী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চপাত্র থেকে জল ছিটিয়ে ঝাণ্ডাগুলিকে মন্ত্রপূত ক'রে দিলেন। এই ব্রাহ্মণদের জমিজমা কিছু-কিছু আছে। তবে প্রাচীন-কালের মতন এঁদের আর সেই মর্য্যাদার স্থান থাক্‌ছে না। সাধারণ-ভাবে এঁরা অন্য শ্যামী নাগরিকের মত লেখাপড়া শিখে সরকারী কাজকর্মেও যেতে আরম্ভ ক'রেছেন। কিন্তু এখনও বেশীর ভাগই ঘরে ব'সে একটু সংস্কৃত শিখে নেন, জ্যোতিষের চর্চা করেন, তবে এই পর্য্যন্ত— শ্যামী ব্রাহ্মণরা কাশিতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও রীতিমত সংস্কৃত প'ড়তে এসেছেন, তা শুনি নি। বহুপূর্বে এই রকম রীতি ছিল। বর্মা থেকে আসতেন, বৌদ্ধভিক্ষু আর ব্রাহ্মণেরা— বর্মায় ব্রাহ্মণদের বলা হয় "পোন্না"— তেমনি শ্যাম থেকেও সম্ভবতঃ আস্‌তেন। অতি প্রাচীন কালের কথা আলাদা। আমার খুব ইচ্ছা হ'চ্ছিল এঁদের সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা কই। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে যতটা জানতে পারা গিয়েছিল, এখানে ততটা জান্‌তে পারা গেল না, এজন্য বেশ একটু আপসোস্ হয়— বলিদ্বীপে দুই সপ্তাহ, আর শ্যামী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঘণ্টাখানেকের বেশী তো নয়।

এর পরে আমরা গেলুম, অনেক লক্ষ টিকল খরচ ক'রে তৈরি ওখানকার রাজার সিংহাসন-দরবারে। একটা বিরাট্ পাথরের বাড়ী— আধুনিক ইটালিয়ান রেনেসাঁস্, বা প্রাচীন গ্রীক আর রোমান বাস্তু-রীতি এবং শিল্পের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ১৫-১৬র শতকে ইটালিতে যে বাস্তু-রীতি প্রবর্তিত হয়, সেই রীতি অনুসারে এই বাড়ীটি পরিকল্পিত। এর ভিতরটার অলঙ্করণ নানা রঙীন মর্মর-প্রস্তরে তৈরী। ইটালি থেকে আনা হয়েছিল এইসব রঙীন পাথর। তা-দিয়ে বাড়ীর ভিতরকার থাম, মেঝে, দেওয়াল, প্রভৃতি ; এবং বাড়ীর ছাতের গোল গম্বুজের নীচে mosaic মোসাইক বা পচ্চেকারী কাজ, অর্থাৎ রঙীন, সোনালী আর রূপালী চীনে-মাটির আর পাথরের টুকরো মিলিয়ে-মিলিয়ে আঁকা ছবি বা নক্‌শা— এসব রচিত হ'য়েছে। এই প্রকারের ছবিতে শ্যামদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে। কোনও বিশেষ ঘটার ব্যাপার হ'লে, এই সিংহাসন-সভা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোন বিদেশী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিকে যখন শ্যামদেশের রাজা

আনুষ্ঠানিক-ভাবে দেখা দেন, আর সেই রাষ্ট্র-প্রতিনিধি বা দূতের কাছ থেকে তাঁর নিজের দেশের সরকারের পক্ষ থেকে পত্র গ্রহণ করেন। এই বাড়ীটির নাম হ'চ্ছে Dusit Prasat অর্থাৎ 'তুষিত প্রাসাদ', 'তুষিত' হ'চ্ছে বৌদ্ধ মতে একটি স্বর্গের নাম, যে স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেব পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন আর শাক্য-বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। স্থানীয় ইংরিজি ভাষায় একে বলে Dusit Throne Hall. এই Dusit Throne Hall-এর প্রধান ঘর বা কেন্দ্র হ'চ্ছে 'আনন্দ সমাগম' রাজ-সভা— এই আনন্দ সমাগম রাজ-সভায় রাজার সিংহাসন স্থাপিত আছে। শ্যামী উচ্চারণে বলে 'আনন্থ সমাখোম'। একটি সিংহাসন হ'চ্ছে ইউরোপীয় ধরণের— একটি বড়ো স্বর্ণমণ্ডিত চেয়ার। আর একটি সিংহাসন হ'চ্ছে প্রাচীন শ্যামী বা ভারতীয় পদ্ধতির, সেটি খুব উঁচু, পিছনের দিক্ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে হয়। সেটির উপরে যে গদি পাতা আছে, তার উপরে সিংহচর্ম বিছানো আছে, এবং দুই পাশে জরির কাজ করা সাদা কাপড়ে ঢাকা তাকিয়া। সিংহাসনের মাথার উপরেতে একটির উপরে আর একটি ক'রে, সাতটি সাদা কাপড়ের সাবেক চালের ছত্র; আর সিংহাসনে রাজা যেখানে পিঠ রেখে বসেন তার পিছনে গরুড়-বাহন বিষ্ণু-মূর্তি, কালো কাঠের তক্তায় সাদা ঝিনুকের কাজে এই মূর্তি আঁকা। সমস্ত প্রাসাদটির মধ্যে বেশ একটা শিল্প-ভাস্বর ঐশ্বর্য্যের ভাব।

আজকে দুপুর একটায় ছিল এখানকার চূড়ালঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন। অনেক প্রধান-প্রধান ব্যক্তির আগমন হ'য়েছিল। কতকগুলি মহারাজকুমার— শ্যামের মহারাজার পিতৃব্যরা— এসেছিলেন, যেমন রাজকুমার দামরঙ্, রাজকুমার ধনিনিরাৎ, রাজকুমার বিদ্যা। ভারতীয় বণিক্ শ্রীযুত নানা-ও আহূত হ'য়ে এসেছিলেন। একজন রাজকুমার ব'ললেন যে তিনি ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী, Accountant-General শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্রকে জানেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খোলা ময়দানে প্রায় দুই-আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাগম হ'ল। কবিকে সেখানে গিয়ে ছোটো একটি বক্তৃতা দিতে হ'ল— প্রাসঙ্গিক-ভাবে তিনি বুদ্ধদেবের করুণার বাণী আর ভারতবর্ষের জ্ঞান-চর্চার কথা ব'ললেন, প্রায় ২০ মিনিট ধ'রে। তারপর সামান্য কিছু বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, এবং আমাদের সভা এখানেই শেষ হ'ল।

কবি হোটেলে ফিরে গেলেন। আমরা তখন জাহাজ কোম্পানীর আপিসে গিয়ে, আমাদের দেশে ফির্‌বার জন্য জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা ক'রতে ব'সে গেলুম। জাপানী জাহাজ-লাইন Nippon Yusen Kaisha কোম্পানীর Awa Maru 'আওয়া-মারু' জাহাজ, পেনাং থেকে ক'লকাতায় যাবে কয়দিন পরে, ক'লকাতার জন্য তিন খানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনলুম। ঠিক হ'ল যে কবি, সুরেন-বাবু এবং আমি, এই তিনজন একত্র ফিরবো; আর আরিয়ম্ এখানে দিন কতকের জন্য থেকে যাবেন। এর পরে সুরেন-বাবুতে আর আমাতে শহরের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা ক'রে, কতকগুলি টুকিটাকি জিনিস কিনলুম। তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের মিউজিয়মের জন্য ঝিনুকের পচ্চেকারী কাজ করা কালো কাঠের বাক্স ছিল।

আজ বিকেল পাঁচটায় স্থানীয় চীনাদের আহূত এক সভায় কবির সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়, আর তাঁর জন্য চা-পানের আয়োজন করা হয়। জাহাজের ব্যবস্থা আর অন্য কেনা-কাটার কাজে নিযুক্ত থাকায়, সুরেন-বাবুর এবং আমার এই চীনাদের চা-পান সভায় যাওয়া হ'ল না, কবির সঙ্গে কেবল আরিয়ম্ ছিলেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের জন্য তাঁর বাড়ী থেকে ভারতীয় খাবার তৈরী ক'রে এনে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে ভারতীয় রান্না পোলাও, কোর্মা, হালুয়া প্রভৃতি খাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় কতকগুলি ছোকরাও এসেছিল। স্থানীয় সিন্ধী curio বা মণিহারী দোকানের মালিকরা কবিকে কয়েকখানি কাশীর কিংখাব উপহার দিয়ে গেলেন।

কবি ইতিপূর্বে শ্যাম-দেশের উদ্দেশ্যে ইংরিজিতে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি স্থানীয় 'বাংকক ডেলি-মেল' প্রেসে অতি সুন্দর-ভাবে ছাপানো হয়। শ্যামের রাজা ও রানীকে ভেট দেবার জন্য সেই কবিতা দুখানি ভালো কাগজে ভালো ক'রে ছেপে রেশমের রুমালে মুড়ে নেওয়া হ'ল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবির নিজের হাতে লেখা ইংরিজি অনুবাদ আর মূল বাঙ্‌লা দুই-ই ঐ সঙ্গে আমরা নিয়ে নিলুম।

নৈশ আহারের পরে, রাত্রি সাড়ে-নয়টায় আমাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। কবি অবশ্য সাদা গরদের জোড় আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবী প'রে গেলেন, এতে তাঁকে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের তিন জনকে এক অভূত-পূর্ব পোশাকে কি-রকম দেখাচ্ছিল তা অনুমান ক'রতে পারি না। শ্যাম-দেশের রাজসভার এটিকেটের মর্য্যাদা এ-রকম অদ্ভুত-ভাবে আমরা রক্ষা ক'রলুম— আমরা প'রেছিলুম কালো রেশমের ধুতি আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবী, আর গলায় সাদা রেশমের চাদর, এবং মাথায় গোল কালো টুপি। অবশ্য রাজসভার শ্যামী অভিজাত-বর্গের পোশাকের সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য হ'ল— তাঁরা প'রেছিলেন, সকলেই, স্বয় রাজা পর্য্যন্ত— কালো রেশমের ফানুম, সাদা জিনের কোট, আর পায়ে সাদা মোজা। এই সভায় শ্যাম-দেশের অনেক রাজপুত্র আর অন্য অভিজাত ব্যক্তিরাও ছিলেন, যেমন প্রিন্স দামরঙ্, প্রিন্স চান্তাবুন, প্রিন্স ধনীনিব্রাং, প্রিন্স নরিস্রা। একটা বড়ো ঘরে কবির ভাষণ শুন্‌বার জন্য রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে অনেকগুলি লোক এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। উপরে একটা গ্যালারি ছিল, সেটা-ও ভর্তি হ'য়ে গিয়েছিল। আমরা কবির সঙ্গে এই ঘরে আস্‌তে, আমাদের তিনজনকে যথাস্থানে বসিয়ে' দেওয়া হ'ল। কিন্তু কবিকে ভিতরে রাজার খাস কামরায় নিয়ে গেল, কবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত Interview বা সাক্ষাতের জন্য। কবি এবং রাজা দুজনের এক সঙ্গে আগমনের জন্য বাইরে আমরা প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলুম।

রাজার সঙ্গে কবি শিষ্টাচার-সম্মত আলাপ ক'রলেন। ভারতবর্ষ আর শ্যামের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে রাজা বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বোধ হয় মিনিট ২০ এইভাবে কেটে গেল, স্থানীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের মধ্যে মৃদু আলাপের একটা গুঞ্জন চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। তারপরে দশটা বাজবার কিছু পরে কবিকে নিয়ে রাজা বক্তৃতা-ঘরে এলেন, সঙ্গে শ্যাম-দেশের রানীও ছিলেন। কবি আমাদের তিনজনকে রাজা ও রানীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে' দিলেন। যথারীতি ওঁরা আমাদের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন। আজকালকার দিনে রাজ-বাড়ীর আদব-কায়দা অনেক ব'দলে গিয়েছে। আগে রাজার সামনে কেউ দাঁড়াতে পার্‌ত না, ভূঁয়ে হাঁটুগেড়ে ব'স্‌তে হ'ত— বিদেশী হ'লেও। সে-সব এখন অতীতের কথা। তারপর কবির বক্তৃতা হ'ল, এক ঘণ্টার উপর ধ'রে। প্রায় ১০-২০ থেকে রাত্রি ১১-৩০ পর্য্যন্ত। এই রাজসভায় কবির বক্তৃতাটি চমৎকার হ'য়েছিল, যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাষা, তেমনি তাঁর বলবার ভঙ্গী। প্রধানতঃ তিনি শান্তিনিকেতনের কথা ব'ললেন— প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা দেওয়া, প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গুরু আর শিষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগ, জাতীয় আত্মচেতনার উদ্বোধন, এই-সব আদর্শের কথা। শান্তিনিকেতনের কিছু-কিছু স্লাইড আমাদের কাছে ছিল, সেগুলি দেখাবার ব্যবস্থা হয়। তারপর শ্যামদেশ-সম্বন্ধে যে কবিতাটি

তিনি লিখেছিলেন, সেটি বাঙলায় আর ইংরিজিতে কবি পাঠ ক'রলেন, তারপর রাজাকে ও রানীকে এই কবিতা উপহার দেওয়া হ'ল।

এই-ভাবে স্বাধীন শ্যাম-দেশের মহারাজা কর্তৃক কবিকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান ক'রে তাঁর সমাদর করা হ'ল। তাঁর কাছ থেকে তাঁর আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাজা আর শ্যামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু শুন্‌লেন। এই সভাতে নানাদেশের রাজদূত আর প্রধান-প্রধান বিদেশী মেয়ে-পুরুষ অনেকগুলি ছিলেন। সভার সমস্ত পাট চুকিয়ে' হোটেলে ফিরতে আমাদের রাত্রি ১২টা হ'য়ে গেল।

শুক্রবার, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৭ সাল

গত রাত্রের আমাদের রাজ-দর্শন আর রাজবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার একটা বর্ণনা আজ সকালে ব'সে-ব'সে লিখলুম, ইংরিজিতে। সেটি আজকে-ই বিকাল বেলায় 'বাংকক ডেলি-মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। বেলা দশটায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুম এখানকার এক বৌদ্ধ বিহার দেখতে— Devasirindra অর্থাৎ 'দেবশ্রী-ইন্দ্র' বিহার। এই বিহারের যিনি প্রধান, তিনি গতকাল রাত্রে রাজ-বাড়ীতে কবির বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বেশ সৌম্য-মূর্তি, হাসি-মুখ ভিক্ষু ইনি। এখানে আর একজন ভিক্ষুর সঙ্গে আমাদের বিশেষ ক'রে পরিচয় হ'ল। আর একজন ছিলেন রাজবংশের এক রাজকুমার। অল্প বয়সে ইনি প্রব্রজ্যা নিয়েছেন। তবে বোধহয় পূরোপূরি ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ ক'রবেন না। বর্মার মতন এ-দেশেও নিয়ম আছে যে, কিশোর আর তরুণদের কয়েক মাস ভিক্ষুর ব্রত নিয়ে কোনও বিহারে থাকতে হয়, আর এইভাবে সাধারণ যুবকদের মনে তাদের ধর্মের একটা প্রধান প্রকাশ-ক্ষেত্র বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। আর একজন ছোকরা ভিক্ষুকে দেখলুম, অতি সুন্দর সুগঠিত শরীর। ইনি বিলেতে বহুদিন ছিলেন, মনে হ'ল এই যুবক ভিক্ষু বোধ হয় পূরাপূরি ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ ক'রেছেন। বিহারের প্রধান মহাশয়ের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। ইনি অবশ্য ইংরিজি জানতেন না, কিন্তু বিলেত-ফেরত ভিক্ষু যুবকটি দো-ভাষীর কাজ ক'রলেন। এই প্রধান-মহাশয় (বা বিহারের মহাস্থবির) আমাদের কতগুলি পালি বই, শ্যামী অক্ষরে ছাপা, দিলেন; আর দিলেন, তাঁর নিজের হাতের তৈরী একটি ক'রে শিল্প-দ্রব্য, আমাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে— এই শিল্প-দ্রব্যটি আর কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কাপড়ের রুমাল পাকিয়ে, নানান্ রকম-ভাবে গাঁট বেঁধে তৈরী জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি— খরগোশ, হরিণ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি। জিনিসটি ছোটো, কিন্তু বৌদ্ধ বিহারের এক মহাস্থবির এই রকম খেলা ক'রে আনন্দ পান দেখে আমরাও খুশী হ'লুম।

কবি হোটেলে ফিরে গেলেন। আমরা বিশ্বভারতীর সংগ্রহালয়ের জন্য মূর্তির খোঁজে লাখন-কাসেম বাজারে ঘুরে ফিরে বেড়ালুম, আর বড়ো-বড়ো তিনটি ধাতু-নির্মিত মূর্তি সংগ্রহ ক'রলুম।

দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে আমরা একটু ব্যস্ত ছিলুম। এঁদের রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে একজন ছোকরা অফিসার এলেন। এই ক'দিন ধ'রে আমরা যে-সমস্ত পুরোনো মূর্তি আর অন্য শিল্প-দ্রব্য কিনেছি, সরকারী হুকুম না হ'লে দেশের বাইরে আমরা সেগুলি নিয়ে যেতে পারবো না। এখানে নিয়ম আছে যে, কোন প্রাচীন জিনিস দেশের বাইরে নিয়ে যেতে হ'লে, এখানকার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্য শ্যাম-দেশের যে-সব প্রাচীন শিল্প-দ্রব্য যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কোনও আপত্তি উঠ্‌তেই পারত না, সে-জন্য যে কর্মচারীটি এলেন, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের

গায়েতে একটি ক'রে লেবেল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন, আর তার উপরে গালায় সরকারী সীল-মোহরের ছাপ দিলেন। শ্যাম-দেশের সীমা পার হবার সময়ে যদি চুঙ্গি-বিভাগ গোলমাল করে যে দেশের মূল্যবান্ প্রাচীন সম্পদ্ এই-ভাবে দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কেন, তখন এই সীল-মোহর করা টিকিট বা লেবেল থাক্‌লে কোনও গোলমাল হবে না।

বিকেলের দিকে কতকগুলি চীনা অর্থশালী ব্যক্তির আগমন, এঁরা কি-ভাবে বিশ্বভারতীকে অর্থ-সাহায্য ক'রতে পারেন সে বিষয়ে কবি, সুরেন-বাবু আর আরিয়মের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে গেলেন।

আজকে বিকেল সাড়ে-চারটার পর এখানকার মিউজিয়মে কবির বক্তৃতা ছিল। প্রাচীন শ্যামী ব্রোঞ্জ-মূর্তি-সংগ্রহের যে বড়ো হল-ঘরটি আছে, সেখানে সভা হয়। খুব ভীড় হ'য়েছিল, বিস্তর ভারতবাসী এসেছিলেন, আর শ্যামী এবং বিদেশীদের সংখ্যাও কম ছিল না। কবি ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে আর এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ সম্বন্ধে যথারীতি অতি চমৎকার-ভাবে ব'ললেন। মিউজিয়মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ফরাসী পণ্ডিত Dr. Coedes সেদেস্, আমার সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন, আর তাঁর কতগুলি প্রবন্ধের মুদ্রিত প্রতি আমাকে দিলেন।

এর পরে আমাদের আর একটি বৌদ্ধ বিহারে যেতে হ'ল— এটির নাম Bovornivet 'বরর্-নিরেৎ' অর্থাৎ 'প্রবর-নিবেশ' বিহার। এর প্রধান স্থবির হ'চ্ছেন একজন সিংহলী ভিক্ষু। ইনি ১৫ বছর ধ'রে শ্যামে আছেন। এই বিহারে একজন শ্যামী ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হ'ল, ইনি আমেরিকায় Applied Chemistry বা ফলিত-রসায়ন প'ড়ে এসেছেন। আমাদের সব দেখাবার এবং বোঝাবার জন্য ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ ছিলেন। মোটের উপরে, শ্যামদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলি দেখে মনে হ'ল, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা শ্যামদেশে খুব ভালো। বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত আছেন, তা-ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত লোক ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ ক'রে বিহারগুলির পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রছেন।

সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটায় এখানকার জর্মান রাজদূতের বাড়ীতে কবির আর আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। জর্মান রাজদূত নিজে জর্মান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন রুষদেশের মহিলা, অতি সুন্দরী, নর্ডিক বা Scandinavian লোকেদের মত দীর্ঘকায়া, হিরণ্য-কেশী, নীল-চক্ষু; কথাবার্তায় ভব্যতায় অত্যন্ত ভদ্র। অন্য অনেকগুলি অতিথি ছিলেন। মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন, পালি আর বৌদ্ধধর্ম তাঁর বিশেষ বিষয়, এঁর নামটি লিখে নেওয়া হয়নি, এখন ভুলে যাচ্ছি। আমাদের আহারের পর্ব শেষ হ'লে পরে, আরও অনেকগুলি অতিথি এসেছিলেন। কবি তাঁর কেদারায় ব'সে রইলেন, একে-একে সকলে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগ্‌লেন। তাঁদের অনুরোধে কবিকে তাঁর কতগুলি কবিতার ইংরিজি অনুবাদ প'ড়তে হ'ল।

শনিবার ১৫ই অক্টোবর ১৯২৭ সাল

আজকে বাংককে আমাদের শেষ দিন। এঁদের বন্দোবস্ত-মত, সকাল ৮-৫ মিনিটের গাড়ীতে আমরা শ্যাম-দেশের প্রাচীন রাজধানী Ayuthia— 'আয়ুথিয়া' অর্থাৎ 'অযোধ্যা' নগর— দেখ্‌তে গেলুম। কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু, আমি, ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আর শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর পুত্র শ্রীমান্ সৈয়দ সাদির আলী, এই কয়জন ছিলুম। ওখানে যাবার পথে এখানকার হাওয়াই জাহাজের আড্ডা হ'য়ে গেলুম, Bang-pa-in—

বাং-পা-ইন্ এই স্টেশন হ'য়ে যেতে হ'ল। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভদ্রলোক, ২৭ বছর শ্যাম-দেশে আছেন, এখানকার জাতীয়তা গ্রহণ ক'রেছেন। ইনি এখানকার রেলওয়ের কাজে বরাবর আছেন, এখন একজন Permanent Way Inspector অর্থাৎ রেলওয়ে লাইনের তদারককারী। বিয়ে ক'রেছেন একটি শ্যামী মহিলাকে। এঁর নামটি হ'ল Wickremasinhe 'বিক্রম-সিংহ'। বহুদিন ধ'রে ইনি রাজ-প্রাসাদের সংলগ্ন রাজার খাস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। রাজার পক্ষ থেকে এঁকে একটা খেতাব দেওয়া হয়, এই দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ-সেবার দরুন। সেই খেতাবটি হ'চ্ছে পালিতে Vijita-bhaccādhikāra 'বিজিত-ভচ্চাধিকার,' অর্থাৎ 'বিজিত-ভৃত্যাধিকার', আর শ্যামী ভাষায় এই শব্দের উচ্চারণ 'ফিছিং-ফজাথিগান্'। এই লম্বা সংস্কৃত বা পালি শব্দের অর্থ হ'চ্ছে, 'যিনি রাজার সেবার দ্বারা রাজ-ভৃত্যের অধিকারকে জয় করেছেন'। শ্যাম দেশে এই রকম বড়ো-বড়ো সংস্কৃত বা পালি ভাষার পদবীর অভাব নেই— যেমন 'বারিসীমাধ্যক্ষ', 'রথচারণ-প্রত্যক্ষ' ইত্যাদি, যার কথা আগেই ব'লেছি। এই রকম বড়ো-বড়ো উপাধি আমরা সেদিন পর্য্যন্ত মহীশূর-রাজ্যে দেখেছি। ভারত সরকারের প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' আর পালি পণ্ডিতদের জন্য 'অগ্‌গ-মহাপণ্ডিত' মনে করা যেতে পারে।

আমরা বেলা এগারোটায় আয়ুথিয়াতে এলুম। ১৭৮০-র পরে বাংকক্-নগরী থাই বা শ্যামী জাতির নূতন রাজধানী হয়, এর আগে রাজধানী এই অযোধ্যা নগরে ছিল। অযোধ্যা নগরে যখন শ্যামীদের রাজপাট ছিল, তখন প্রতিবেশী বর্মীদের সঙ্গে তাদের লড়াই লেগেই থাক্‌ত। বর্মীরা এই অযোধ্যা নগরের নাম উচ্চারণ ক'র্‌ত 'জোডিয়া' বলে। আয়ুথিয়া থেকে বর্মীদের মধ্যে শ্যামী নাট্যকলা আর শিল্পকলা কিছু-কিছু প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। আয়ুথিয়ার পূর্বে থাই-জাতির রাজাদের মুখ্য কেন্দ্র ছিল, আরো উত্তরে Sukhothai সুখোথাই বা Sukhodaya 'সুখোদয়' নগরে। আয়ুথিয়া নগর তার পূর্বের গৌরব অনেককাল হ'ল হারিয়েছে। কিন্তু এখনো প্রাচীন মন্দির আর অন্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ প্রচুর দেখা যায়। শহরটী মেনাম্ নদীর ধারে। বাংককের মতন এখানেও মানুষের জীবন এই নদীকে অবলম্বন ক'রে অনেকটা জুড়ে আছে। আয়ুথিয়া স্টেশনে পৌঁছুবার পরে শ্যাম রাজ-সরকারের একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের একটি মোটর-লঞ্চে তুললেন। এই লঞ্চে করে মেনাম্ নদী ধ'রে গিয়ে, আমরা দেখে এলুম একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদ— আর তার সংলগ্ন একটী মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা। আমরা মেনাম্ নদীর মধ্যে একটা জিনিস ভালো ক'রে দেখ্‌তে পেলুম। যেটা হ'ল, জলের উপরেতে নৌকো নিয়ে হাট-বাজার বিকি-কিনি। নদীর বুকের উপরে একেবারে যেন একটা চলন্ত বাজার ব'সে গিয়েছে। ছোটো বড়ো নানা নৌকোয় ক'রে জলে ঝপ্-ঝপ্ শব্দ ক'রতে-ক'রতে খরিদ্দারেরা আসছে,— আর তেমনি রকমারি নৌকোর উপর বিক্রেতারা নানারকম জিনিসের পসরা দিয়ে র'য়েছে। শাক-সবজী, মাছ, চা'ল আর অন্য খাদ্য-দ্রব্য ; তা-ছাড়া কাপড়-চোপড়ের দোকান, আর ঘর গৃহস্থালীর নানা জিনিসের দোকানও র'য়েছে। নৌকোর উপর ছোটো-বড়ো রেষ্টুরেণ্ট— অন্য নৌকোর আরোহীরা টাট্‌কারান্না ভাত মাছ তরকারী সেখান থেকে কিনে নিয়ে খাচ্ছে। নৌকোয় আর মানুষে সমস্ত নদীর জল একেবারে ভ'রে গিয়েছে, নৌকো আর মানুষ সেখানে গিজ্-গিজ্ ক'রছে। এটা অদ্ভুত জিনিস লাগ্‌ল।

আজকের দিনে কি একটা উৎসব ছিল, তাই ওখানে দেখা গেল, নদীর ধারে একটী বৌদ্ধ বিহারের কাছে যাত্রীর মেলা। বোধ হয়— এই উৎসবের-ই অঙ্গ-হিসাবে বা'চ খেলা হবে। বা'চের নৌকো

অনেকগুলি এসেছে, আর তার চড়নদাররা সবাই নানারকম উজ্জ্বল রঙীন কাপড় প'রে র'য়েছে। আর কতকগুলি নৌকো বেশ তালে-তালে দাঁড় বেয়ে বা'চের মহড়া দিচ্ছে। দুপুর হ'তে চ'ল্‌ল; রৌদ্র খুব প্রখর। অনেকে নৌকোয় মাথার উপর চীনে' ছাতা খুলে ধ'রেছে, কেউ বা রোদের জন্য মাথায় কাপড়ের ফ্যাটা বেঁধেছে। শ্যামী মেয়েদের আধুনিক শ্যাম দেশের পোশাক—নীচু-গলা হাত-কাটা ঢিলে জামা; আর পরনে রঙীন ফানুম্। আর প্রায় সকলকারই মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা। সমস্ত নদী জুড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে এই দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ললুম।

তারপর আমরা এখানকার স্থানীয় শাসন-কর্তার বাসভবনের কাছে এলুম, আর তাঁর হাউস-বোটে বা থাকবার নৌকোয় আমাদের দুপুরের খাওয়া খেতে যেতে হ'ল। শ্যামী আর বিলিতি উভয় রকম খাবার, নানা পদ ছিল।

বেলা দুটোয় আবার আমরা যাত্রা ক'রলুম। এই অঞ্চলটা আমাদের ঠিক বাঙ্‌লাদেশের মত। এখানে নদী, খ'ড়ো ঘর, আর না'রকেল গাছের বাহুল্য, আমাদের বাঙ্‌লা দেশের কথা মনে করিয়ে' দিতে লাগ্‌ল।

আমরা পরে বাং-পা-ইন রাজ-প্রাসাদ দেখ্‌তে গেলুম। প্রায় আশী বছর আগে শ্যাম দেশের মহারাজা মহা-মঙ্কুটের আমলে তাঁর চীনা প্রজাদের দান হিসাবে রাজা এই বাড়ীটি পান। এটি আগাগোড়া চীনা ধরনে তৈরী। আর এর আস্‌বাব-পত্র অলঙ্করণ সবই চীনা রুচি অনুসারে।

আমাদের স্টীম-লঞ্চে চা খেতে হ'ল। চারটায় আমরা বাং-পা-ইন্ স্টেশনে আবার ফিরলুম। সেখান থেকে সাড়ে-চারটার দিকে বেরিয়ে সওয়া ছ'টায় বাংককে ফিরে এলুম।

এখানকার ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-মন্দিরের কথা পূর্বেই বলেছি। শহরতলীর মধ্যে, শহরের একটু বাইরে, এই মন্দিরটি। ভোজপুরিয়াদের আগ্রহে এই মন্দিরে এসে কবি এঁদের সঙ্গে দেখা ক'রতে, আর এঁদের কিছু ব'লতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। এঁরা বেশীর ভাগ গরীব আর অশিক্ষিত লোক, সে কথা এঁরা উল্লেখ ক'রে বলাতে, কবি সহজেই রাজী হ'য়ে যান। এই মন্দিরের সভায় কবির সঙ্গে কেবল আমি-ই ছিলুম। সাড়ে-ছয়টার দিকে আমরা মন্দিরের কাছে এসে পৌছোলুম। মন্দিরে যেতে গেলে একটা সরু গলি দিয়ে খানিকটা পথ যেতে হয়। কবির জন্য এঁরা একখানা রিক্‌শার ব্যবস্থা করেছিলেন। মন্দিরে গিয়ে দেখি, মন্দিরের আঙিনায় প্রায় তিন-চারশত লোক একত্র হ'য়েছে—বেশীর ভাগই আমাদের "ভৈয়া-লোগ", ভোজপুরী দেশওয়ালী। এরা ইংরিজির ধার ধারে না। আমাদের মূল মন্দিরের সামনে দর-দালানে বসালে। কবি এদের কি বিষয়ে ব'লবেন, সেটা জেনে নিয়ে তৈরী হ'য়ে আসা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু কাজের ভীড়ে এ-বিষয়ে আমার একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। এ-রকম স্থলে, কবি যা ব'লবেন, তা তাঁর কাছে শুনে নিয়ে, হিন্দীতে ছোটো-খাটো একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে রাখতুম, আর সেটী পড়ে দিতুম, মালয়-দেশের দু-একটি জায়গায় এ-রকমটি করায় বেশ কাজ হ'য়েছিল। কিন্তু আজকে আয়ুথিয়ায় সারাদিন ব্যস্ত ছিলুম। কাজেই এ বিষয় চিন্তা ক'রতে পারিনি। তাই এখানে এই ইংরিজি-না-জানা লোকেদের দেখে একটু মুস্কিলে পড়া গেল। কবি কিন্তু অল্প দু-চার কথা মামুলী বাজার-চল্‌তি হিন্দীতেই ব'ললেন। কিন্তু মনে হ'ল, এরা আরো কিছু শুন্‌তে চায়। বিদেশে এসে ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ আর জাতির সম্মান-সম্বন্ধে, জাতীয়তাবোধ যে অবশ্য রক্ষা করবার বিষয়,

তাই নিয়ে সাধারণ-ভাবে দু-একটি কথা বললেন। তখন একজন পাঞ্জাবী কনট্রাক্টর বা ঠিকাদার এসে কবির কাছে ব'ললেন—"অগর হুজুরকী ইজাজৎ হো, তো মৈঁ আপকী অঙ্গ্রেজী তক্‌রীর-কো হিন্দোস্তানী-মেঁ তর্জুমা করকে ইন্‌হেঁ সুনা দুঙ্গা— ইয়ে লোগ, আপ দেখতে তো হৈঁ, জ্যাদাতর জাহেল ঔর অন্‌পঢ় হৈঁ —যদি হুজুরের অনুমতি হয়, তা-হ'লে আপনার ইংরিজি বক্তৃতা হিন্দুস্থানীতে তর্জমা ক'রে এদের শুনিয়ে দেবো— এই লোকগুলি, আপনি তো দেখ্‌ছেন, বেশীর ভাগ হ'চ্ছে মূর্খ আর নিরক্ষর।" পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের চোস্ত উর্দু শুনে আমরা যেন একটু কিনারা পেলুম। যাই হ'ক্— উর্দু তো উর্দু-ই সই— কবির আদর্শের কথা, আর বিশ্বভারতী-স্থাপনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে, তাঁর কথামত ইনি উর্দুতে অর্থাৎ ফারসী-ঘেঁষা হিন্দুস্থানীতে এদের দু কথা ব'লতে পারবেন। তখন কবি ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। খানিকটা-খানিকটা ক'রে তিনি বলেন, আর এই ভদ্রলোক তর্জমা ক'রে যান। দেখলুম, ব্যাপারটি তেমন সুবিধার হ'ল না। একদিকে কবির ভাব আর ভাষা— আর অন্যদিকে এই ভদ্রলোকের বিদ্যাবুদ্ধি আর ইংরিজির জ্ঞান, এই দুই-ই তেমন উচ্চ কোটির নয়, আর বেশী গোলমেলে ব্যাপার দেখলেই তিনি সাঁটে স্থূল-ভাবে ব'লতে আরম্ভ করেন। তার ফল হ'ল যেমন হাস্যকর, তেমনি হৃদয়বিদারক। ইংরিজিতে ব'লতে-ব'লতে কবি এক জায়গায় এই ধরনের একটা কথা ব'ললেন— My idea has been to establish in some place in our Country a centre of study and research, where foreigners, who want to participate in the spiritual feast left by our ancestors, may stay with us as our honoured guests, and receive whatever they can take from us and what India has to give ; and at the same time, we would also claim it as our right to receive from them the best they have to offer from their own culture, their own thought and ideas. এর অনুবাদ এঁর মুখে সংক্ষেপে এই রকম হ'ল— কবির দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তাঁর প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি এইভাবে আকর্ষণ ক'রে, ইনি ব'ললেন, "আপ রাবিন্দর্‌-নাথ টেগোর কহতে হৈঁ কি, পর্‌দেসী তালিবে-ইল্‌মোঁ-কে লিয়ে এক হোটাল বনাওএঙ্গে, তাকি ওয়ে আকর কুছ ইল্‌ম্‌ হাসিল কর সকেঁ— উনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব'লছেন যে, বিদেশী বিদ্যার্থীদের জন্য একটি হোটেল বানাবেন, যাতে তারা এসে কিছু বিদ্যা অর্জন ক'রতে পারে।" তাঁর বিশ্বভারতী-স্থাপনের এই ব্যাখ্যা শুনে কবি চ'মকে উঠ্‌লেন, আর আমার দিকে একবার কাতর-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রলেন। আর আমি অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে রইলুম। কবি তখন যথাসম্ভব শীঘ্র, নমোনমঃ ক'রে, তাঁর এই "অঙ্গ্রেজী তক্‌রীর" শেষ ক'রলেন। কিন্তু এতেই উপস্থিত জনগণের উৎসাহের সীমা নেই। এদের মধ্যে একজন ভোজপুরিয়া ভদ্রলোক, শুন্‌লুম এঁর অনেক গোরু-ম'ষ আছে— মাতব্বর ব্যক্তি, বেশ জোর গলায় সমবেত ভাইদের ঠাকুরজীর "বিস্‌-ভার্‌তী বিস্‌-বিদিয়ালে"-র জন্য চাঁদা দিতে অনুরোধ ক'রলেন। এরা বেশীর ভাগই অল্প পুঁজির লোক। কিন্তু এখান থেকে এক টিকল, ওখান থেকে দু টিকল, দূর কোণ থেকে তিন টিকল, আবার এদিক থেকে চার টিকল, পাঁচ টিকল ক'রে মুদ্রা প'ড়তে লাগ্‌ল। দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আবার তারস্বরে হিন্দীতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে ব'লতে লাগলেন—"ভাঈ লোগ, বিদ্যা-দান-সে বঢ়কর পুন্‌ নহীঁ হৈ— বিদ্যাদানের বাড়া পুণ্য আর নেই ; অপনী শক্তিকে মুতাবিক দান করো।" এইভাবে প্রায় মিনিট দশের মধ্যে ১৬০।১৭০ টিকলের মত চাঁদা বিশ্বভারতীর জন্য এঁরা তুলে দিলেন, বেশীর ভাগ দু-চার টাকার দানে।

একজন চেঁচিয়ে ব'ললেন "পূরো দুইশত টিকল না হ'লে আমাদের বাঙ্কক্ শহরের হিন্দুদের দুর্নাম হবে।" তখন স্থানীয় দু-জন ভদ্রলোক বাকী টাকা দিয়ে দুইশত টিকল পূরো ক'রে দিলেন। ঘটনাটি ছোটো, কিন্তু এর পিছনে যে একটা সহৃদয়তা ছিল, কবির আদর্শ ভালো ক'রে না বুঝলেও তার প্রতি শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি ছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

কবি যখন ঐ স্থান থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর চারিদিকে তাঁর দর্শনার্থী লোকেদের ভীড়। অনেকে তাঁকে প্রণাম ক'রতে লাগ্‌ল। তবে এরা ওঁকে বিব্রত করেনি, বেশীর ভাগ লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে এবং মাথা হেঁট ক'রে ওঁকে প্রণাম জানাতে লাগ্‌ল। কিন্তু উঁচু মঞ্চ থেকে নামবার সময়ে ঠিকমত সিঁড়ি বুঝে নাম্‌তে না পারায়, কবি একটু প'ড়ে গেলেন, পাশ থেকে আমরা ধ'রে ফেলায় চোট লাগে নি। এরা এতে একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়্‌ল, কিন্তু কবি তাঁর প্রসন্ন হাসি হেসে উঠে দাঁড়াতে সকলেই আশ্বস্ত হ'ল। বিদায় নিয়ে পরে আমরা যখন মোটরে এসে ব'সলুম, তখন কবি আমাকে কেবল এই কথা ব'ললেন—"লোকগুলির হৃদয় ভালো, কিন্তু শেষটায় এরা আমাকে হোটেলওয়ালা ক'রে ফেল্‌লে হে।"

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের হোটেলে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে প্রাচীন শিল্পদ্রব্য নিয়ে যাবার জন্য একটা বিশেষ অনুমতি-পত্র এলো। আমরা আহারের পরে জিনিস-পত্র গুছোতে লেগে গেলুম। কাল সকালেই আমাদের বাংকক ছেড়ে যেতে হবে। কবির শ্যামদেশ দর্শন এই-ভাবে সমাপ্ত হ'ল।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা॥

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অঙ্কুর যখন দীর্ঘদিনের জীবন-যাত্রায় মাটি হইতে অনেকখানি উঁচুতে মাথা তুলিয়া বনস্পতি রূপ লাভ করে এবং ঘনপল্লব-কুঞ্চিত শাখাবাহু বিস্তার করিয়া আকাশের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিতে চায় তখন তাহার দিকে তাকাইয়া নীচের মাটির বন্ধনটাকে আর বড় করিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হয় না ; তখন মনে হয়, আকাশে বাড়িয়া অফুরন্ত শূন্যে অবাধ বিস্তার লাভ করা, মেঘ হইতে ছায়া ও জল, বায়ু হইতে প্রাণ এবং সূর্য হইতে তেজ ও বর্ণ আহরণ করা— নিত্য নব পল্লবে ফুলে ফলে নিজেকে বিকশিত করা— বনস্পতির এই হইল জীবনযাত্রা। কিন্তু নীচে মাটির সঙ্গে যোগ শেষ পর্যন্ত থাকিয়া যায়, সে কথাটা একেবারে ভুলিবার নহে। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাইলে মনে হয়, কোনও একটি বিশেষ দেশকালের মাটির সঙ্গে এই অসাধারণভাবে বিস্তৃত ব্যক্তি-বনস্পতির তেমন কোনো শিকড়বন্ধন নাই— জীবনরস সংগৃহীত হইয়াছে দেশে দেশে কালে কালে বিস্তৃত মহামানবের জীবনভূমি হইতে ; কিন্তু তখনও হয়তো বাঙলা দেশের মাটি এবং বাঙলা দেশের জীবনের সঙ্গে মূলে একটা শিকড়বন্ধন ছিল ; কোথায় কিভাবে কতটুকু ছিল— সেই কথাটাই কৌতুকাবহ।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবন কথাটাকে লইয়া ভাবিতে গেলে প্রথমে জাতীয় জীবন কথাটাকেই পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। জাতীয়জীবন কথাটার মধ্যে দুই দিক্ হইতে দুইটি ইঙ্গিত আছে। একদিকে জাতীয় জীবন অত্যন্তভাবে রাজনীতি-ঘেঁষা, যে-ক্ষেত্রে তাহার পরিণতি দেখিতে পাই আজকালকার দিনে বহুপ্রচলিত 'জাতীয়তাবাদ' বা 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' কথাটার মধ্যে। এই 'ন্যাশনালিজ্‌ম্'এর মধ্যে যে 'নেশন' বলিয়া বস্তুটি আছে তাহার উপাদানের মধ্যে অনেক-জাতীয় ঐক্যবন্ধনের উপাদানের কথা আমরা উল্লেখ করি বটে, কিন্তু দেখা যায়, কার্যক্ষেত্রে অন্য সব উপাদান একত্র হইয়া যেন 'ঢাকের বাঁ', 'ডাহিনা'রূপে টং টং করিয়া বাজিতে থাকে শুধু রাষ্ট্রীয় উপাদানটা। অন্য আর একদিকে জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ সমাজজীবনের সঙ্গে ; এ-ভাবে কথাটাকে না বলিয়া আরও ভালোভাবে বলা যায় যদি বলি, একটি বিশেষ কালে বিশেষ দেশে বিশেষ বিশেষ বাস্তব কারণকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে যে একটি সুসংহত সমাজজীবন তাহাই আসল জাতীয়জীবন। এই সুসংহতসমাজ-ভিত্তিক জাতীয়জীবনের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে রাজনৈতিক দিক্ আর পাঁচটা দিকের মত একটা দিক্ মাত্র, তাহার উদগ্র একাধিপত্য লইয়া তো নয়ই, তাহার দাম্ভিক প্রাধান্য লইয়াও নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যখন তাঁহার সঙ্গে জাতীয়জীবনের সম্পর্কের প্রশ্ন তোলা যায় তখন আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই দুই দিক্ হইতে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিতে পারে। প্রথম দিকের জিজ্ঞাসাটাকে এইভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, উনবিংশ এবং বিংশ শতকে আমাদের রাজনীতি-ঘেঁষা জাতীয়জীবনে যে আলোড়ন ও বিবর্তন দেখা দিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে নিজেকে কিভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। 'আমাদের জাতীয়জীবন' বলিতে এখানে আপাততঃ ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি না, বাঙালীর জাতীয়-জীবনের কথাই বলিতেছি। দ্বিতীয় দিক্ হইতে আবার জিজ্ঞাসাটিকে উপস্থাপিত করা যায় এইভাবে,

বিশ্বজীবনের মধ্যে বাঙালীজাতির একটি সমাজভিত্তিক বিশেষ অস্তিত্ব— অর্থাৎ একটি বিশেষ জীবনযাপন-প্রথা রহিয়াছে— যাহা বিশ্বজীবনের মধ্যেই বাঙালী-জীবনকে আবার স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে; এই যে আমাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত একান্ত বাঙালী জীবন তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু যোগ ছিল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিতরে সেই পরিচয় কোথায় কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের যে জাতীয়জীবনের ইতিহাস তাহাকে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, জাতীয়জীবনের কথা বলিলে সে-সময়ে আমরা বিশেষ করিয়া আমাদের বৃহৎ সমাজজীবনের কথাই ভাবিতাম। রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ এ-কথাটা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে জাতীয়-জীবন বলিতে মুখ্যতঃ সমাজজীবনকেই বুঝাইত; রাষ্ট্র এই জন্য কোনোদিনই আমাদের দেশে একটা সর্বগ্রাসী মর্যাদা লাভ করে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে বিশ্লেষণ-বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই বার বারই এই জিনিসটি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তি কোনো যুগেই রাষ্ট্রের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠে নাই— যুগ যুগ ধরিয়া জাতির সামগ্রিক বিবর্তনের পিছনে বেশিভাবে কাজ করিয়াছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিকেন্দ্রিত সমাজ-শক্তি।

রাষ্ট্রবন্ধনের উপরে রবীন্দ্রনাথের একটা সহজাত অবিশ্বাস— সুতরাং অশ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল তাঁহার সমাজবন্ধনের উপরে। কারণটাও খুব দুর্নিরীক্ষ্য নয়; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, দশদিকে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া রাষ্ট্র-নামক যে যন্ত্রটি মানুষের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, এবং তাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত শক্তির একটা একাধিপত্যের দুর্নিবার্য প্রবণতা যেভাবে মাথা নাড়া দিয়া ওঠে— ও জিনিসটা মানববিকাশের কোনো স্বাভাবিক পথে দেখা দেয় না; দেখা দেয় ক্রূর কুটিল পথে মানুষের অপরিমিত লোভ এবং ক্ষমতালিপ্সার প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে জড়িত হইয়া। এই লোভ এবং ক্ষমতামত্ততার নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সমাজ তাহার বৃহৎ পরিধির মধ্যে ছড়াইয়া ছড়াইয়া সৃষ্টি করিয়া লয় যে শক্তি তাহার পিছনে মানবমঙ্গলের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং গতি আছে; কারণ, ইহা গড়িয়া ওঠে মানুষের স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া, আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, মানুষ যে পর্যন্ত অপরিমিত লোভ এবং ক্ষমতাপ্রমত্ততার প্রচণ্ড পাকে পড়িয়া বিকৃত হইয়া না ওঠে সে পর্যন্ত মানুষ স্বভাবতঃ ভালো— সে নিজের ও অপরের কল্যাণকামী— আর সেই কল্যাণ-কামনাতেই সে নীতিপ্রবণ; তাহার এই স্বভাবগত নৈতিক প্রেরণাই তাহার মধ্যে সৃষ্টি করে ধর্মের এষণা; এই ধর্ম তাহাকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াই ধারণ করিয়া রাখে। ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিশ্বাসও বটে, আবার আজীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ দৃঢ় সিদ্ধান্তও বটে। মানুষ যত অন্যায় করুক, যত পাপ করুক— ক্ষণে ক্ষণে মূঢ়তার হিংস্রতার ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে যত কদর্য করিয়া তুলুক, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, শেষ অবধি মানুষের যে স্বরূপটি বিজয়লাভ করিয়া এত যুগ ধরিয়া মানুষের ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইল মানুষের 'কল্যাণকৃৎ' স্বরূপ। বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা— দুই দিক্ হইতেই সমর্থন লাভ করিয়া এই প্রত্যয় তাঁহাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসপ্রবণতাই তো সব মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা নয়, আর রবীন্দ্রনাথ যে কালে যে দেশে যে জাতির মধ্যে জন্মাইলেন তাহার ইতিহাসেরও সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের রুচি-মেজাজের অনুগ-রূপে আবর্তিত হইবার কথা নয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জাতির ভিতরেও যে জাতীয়তাবাদের জাগরণ দেখা দিল তাহার আশেপাশে সর্বতোভাবেই একটা জাগরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল;

কিন্তু তথাপি জাতির বিদ্রোহী শক্তি ক্রমে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়া, জাতীয়-আন্দোলনের মুখ্য দাবীরূপে দেখা দিল পর জাতির কাছ হইতে নিজের জাতির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়া। ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল কংগ্রেস-আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথকে একদিন তাঁহার কবিসত্তা লইয়াই আগাইয়া গিয়া যুক্ত হইতে হইল এই কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে এবং খানিকটা সক্রিয়ভাবেই যাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইলেন তাহাকে ঠিক কংগ্রেস-আন্দোলন বলিব না, তাহাকে বলিব 'স্বদেশী আন্দোলন'। এই উভয় আন্দোলনকেই সাধারণতঃ এক করিয়া ধরা হয়; কিন্তু আমার কাছে এই দুইয়ের মাঝখানে একটা তফাত আছে। কংগ্রেসের সামনে ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তিকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেদের রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তোলা এবং তাহা দিয়া দেশ শাসন করিবার লক্ষ্য; স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকিলেও তাহার মধ্যে একটু অস্পষ্টভাবে আর একটা ব্যাপক দৃষ্টি দেখা দিয়াছিল; সে দৃষ্টি হইল শুধু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-যন্ত্রটিকে নয়— আমাদের বৃহৎ সমাজজীবনটাকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার দৃষ্টি। স্বদেশে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিতে এবং স্বদেশজাত সকল দ্রব্য শ্রদ্ধায় আদরে মাথায় তুলিয়া লইতে যে দুরন্ত আগ্রহ দেখা দিল, যেখানে দেখা দেয় নাই সেখানে সেই আগ্রহকে জাগাইয়া তুলিবার যে ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা দিল, সেটা শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে অপর জাতিকে পরাজিত করিবার জন্য নয়, আত্মবিস্মৃত জাতিকে— আত্মসম্মানে বঞ্চিত জাতিকে— সর্বতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার একটা দৃঢ়পণ সাধনাও তাহার ভিতর দিয়া সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যেটুকু যুক্ত করিয়া তুলিলেন তাহা হইল এই সর্বোতোভাবে চিত্তজাগরণ এবং সর্বোতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনার সঙ্গে।

স্বদেশী যুগে বাহিরের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে চিন্তারও একটা মস্ত বড় আন্দোলন চলিয়াছিল, স্থায়িমূল্যের দিক্ হইতে সেই আন্দোলনটাকেই বড় স্থান দিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়াছিলেন পুরোধা রূপেই। তিনি প্রকাশ্য মঞ্চে উচ্চৈস্বরে অনেক বক্তৃতা দিয়া জননেতারূপে জনসাধারণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন না বটে, কিন্তু জাতীয়জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির কথা এবং তাহাদের সমাধানের কথা তিনি যেমন গভীর করিয়া এবং তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিলেন এবং তাকে প্রবন্ধে ভাষণে প্রকাশ করিতে লাগিলেন তেমন ব্যাপক এবং গভীরভাবে সেই সময়ে আর কেহ তাহা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু তবু তিনি তৎকালে যে প্রকাণ্ড জননেতা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলেন না তাহার মুখ্য কারণ, রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাকে অচিরাৎ করায়ত্ত করিবার জন্য তখন যে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সমস্যার অগ্রভাগে দেখা দিয়াছিল, তাহার উষ্ণতা রবীন্দ্রনাথকে তেমন তপ্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, ইংরেজ তাড়াইবার জন্য অত্যন্ত একটা তাড়া কোনোদিনই কবি তেমনভাবে অনুভব করেন নাই যেমন অনুভব করিয়াছিলেন জাতিকে সবদিক হইতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার তাগিদ। রাজনীতিজ্ঞ-গণের মধ্যে একদল বরাবরই ছিলেন উগ্রপন্থী, তাঁহাদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম; এক্ষেত্রে যাঁহারা ছিলেন স্থিতধী সেইসব নেতাও মনে করিতেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে না পাওয়া পর্যন্ত জাতির সমাজজীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা কখনোই সম্ভব নয়; সেই কারণেই সকল দৃষ্টিকে এবং শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করাই ছিল জাতিগঠনের প্রাথমিক কাজ। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের সঙ্গেও ঠিক একমত হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা ছিল, জাতির দেহবন্ধনের মুখ্য কারণ

একটি বৈদেশিক শক্তির আকস্মিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ নয়, মুখ্য কারণ অজ্ঞানতা জড়তা সংস্কারপ্রিয়তা প্রথা-বদ্ধতার জন্য জাতির চিত্তের বন্ধন। চিত্তবন্ধন দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দেহবন্ধন আপনা হইতে দূরীভূত হইতে বাধ্য। এই চিত্তবন্ধন সবটা বিদেশীশক্তির রাজশক্তিরূপে আবির্ভাবের জন্য নয়; সুতরাং জাতির জাগরণের সঙ্গে আর বিদেশীশক্তিকে অপসারণের সঙ্গে একটা নিত্য ব্যাপ্তি যে স্বীকার করিতেই হইবে এমন কথা নহে।

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন, চিত্তের জাগরণের সঙ্গে বিদেশী শক্তির অপসারণের সঙ্গে যদি কোনো যোগ থাকিয়াও থাকে তথাপি জাতীয় মুক্তির জন্য পররাষ্ট্রশক্তিকে দূরীভূত করিয়া দিবার চেষ্টা অনেকখানি একটা নঙর্থক চেষ্টা; সর্বপ্রকার সৃষ্টিকর্মের ভিতর দিয়া যে মুক্তি তাহাই হইল মুক্তির যথার্থ সদর্থক রূপ। বিপ্লবের নামে আমাদের যে ঝোঁকটা তাহা হইল একটা নঙর্থক প্রবৃত্তি— একটা ভাঙিবার মাতলামি। এই নঙর্থক প্রবৃত্তির প্রবল পরিচালনাই যে আপনা হইতে মহৎ সদর্থক প্রবৃত্তিগুলিকে অনিবার্য-ভাবে জাগ্রত করিয়া দিবে— ভাঙনের অপর্যাপ্ত মাতলামি যে পরমুহূর্তে মানুষকে সৃষ্টিপ্রেরণা না দিয়াই পারে না, রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাকে একটা অবশ্যঘটনীয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

জাতীয়তাবাদের সহচররূপে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় প্রবল জাত্যভিমান, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথমজীবনে এ-সত্যের ব্যত্যয় ঘটে নাই। যেটি ছিল রবীন্দ্রনাথের মন গড়িয়া উঠিবার যুগ সেটি ছিল বাঙালীমানসে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতির ক্রম-উদ্বোধনের যুগ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে তাই চিত্ত ভাবালু হইয়া উঠিল বাঙলাদেশ ও বাঙালীকে লইয়া। ইহার ভিতরেও আবার লক্ষ্য করিতে পারি, তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স হইতে উত্তর-তিরিশের কয়েক বৎসরের মধ্যে রচিত কবির যত স্বদেশী সঙ্গীত তাহার ভিতরে বাঙালী জাতি ততখানি প্রাধান্য লাভ করে নাই যতখানি করিয়াছে বাঙলা দেশ, আর সে বাঙলা দেশ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সর্বত্রই বঙ্গজননী। রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় স্বদেশী সঙ্গীতগুলি এতই প্রসিদ্ধ যে তাহাদের স্মরণ করাইবার জন্য কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন করে না। কিন্তু বাঙলা দেশকে অবলম্বন করিয়া বাঙালী জাতির জন্য একটি বিশেষ মমতা এবং তাহার জন্য একটি বিশেষ দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ কবিচিত্তে সত্বরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কবির একখানি পত্রাংশে—

"এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবজাতিকে আমাদের কি কিছু সংবাদ দিবার নাই?··· আমাদের এই শ্যামল সুন্দর বঙ্গভূমি কি এই সুবিস্তীর্ণ মানবরাজ্যের মধ্যে সাহারা-ক্ষেত্র? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?··· আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে স্বর্গের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না?··· সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙ্গালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে?···

"বাংলা দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিয়া সকলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে— বলিতে ইচ্ছা করে— 'ভাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংলা ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংলা ভাষায় সকলে মিলিয়া মা বলিয়া ডাক।"

— সজনীকান্ত দাসের " 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'এর কবি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৬৮।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে স্বদেশপ্রেম এখানে কবিচিত্তে ভাবালুতায় উচ্ছ্বসিত ; এই উচ্ছ্বাসের পরিচয় স্বদেশী সঙ্গীতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইহার অনেক পরবর্তী কালে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রচনা করিয়াছিলেন, শুধু রচনা করেন নাই, এই গান গাহিয়া কলিকাতার পথে পথে রাখীবন্ধন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। একটা জীবনে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল যে পরবর্তী কালের পরিণতি ও প্রসারণের সঙ্গে যোগ না করিয়া কবির এই জীবনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে আমরা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে 'বাঙলা ও বাঙালীর কবি' বলিয়া বর্ণনা ও গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ জিনিসটি করিতে যাওয়া ভ্রমাত্মক হইবে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মত এমন আশ্চর্যভাবে বর্ধনশীল ব্যক্তিত্ব অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যেন তিনি বাড়িয়াছেন, সারাজীবনে বাড়িয়া ওঠা একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের সত্যকে কোনও একটি বিশেষ কালপরিধিতে প্রকাশিত পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়া আর নববসন্তারম্ভে কিশলয়যুক্ত একটি বৃক্ষকে ফলপুষ্পের সম্ভাবনাবর্জিত একটি কিশলয়সর্বস্ব উদ্ভিদ বলিয়া বর্ণনা করা একই জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধনশীল মন তাঁহার স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তার জন্য ব্যাপকতর পরিধি এবং গভীরতর ভাবাবলম্বন চাহিতেছিল। তখন দেখা গেল, একটি স্বাভাবিক পথেই তাঁহার স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তা বাঙলা-বাঙালীকে অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীতে ছড়াইয়া পড়িল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনার যুগটি কাটিল বাঙলা ও বাঙালীকে লইয়া, অনুভূতির নিবিড়তা ও ধ্যান-মননের গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে লইয়া।

ভারতবর্ষের ধর্ম ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সমাজের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করিয়া উত্তরত্রিশের জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখা লিখিয়াছেন। এ লেখাগুলির মধ্যে আক্রমণাত্মক সুর নাই, পৃথিবীর অপর কোনো জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের কোনো অত্যুৎসাহী প্রচেষ্টা নাই, আছে নিজের পূর্বপরিচয়টা যে মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কোনো দিক হইতেই অগৌরবের নয়— সেই সত্যটির খ্যাপন। এ সত্যটির খ্যাপন তখনকার দিনে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই কবি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। জাতির আসল জীবন বলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই মনে করিতেন জাতির সমাজজীবন। উনবিংশ শতকে আমাদের সমাজ-জীবনে প্রাণশক্তিতে অনেকখানি ভাঁটা পড়িয়া গেল— তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিয়াছিল বিবিধ বিকৃতিতে। এই প্রাণশক্তির ক্ষীণতা এবং তজ্জনিত বিকৃতির উপরে আসিয়া সহসা প্রবলবেগে যখন লাগিল ইউরোপ হইতে আগত অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রবল ধাক্কা, তখন একটা কথাই আমাদের কাছে প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতে চাহিল, যে-জীবনযাত্রা লইয়া আমরা বাঁচিয়াছিলাম মানুষ হিসাবে তেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আমাদের কোনো অর্থ ছিল না ; বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইতে হইলে আমাদের বাঁচিবার ধারাটাকেই আমূল পরিবর্তিত করিয়া লইবার প্রয়োজন ছিল। ইহাকে ঠিক পরিবর্তন করিয়া লওয়া বলা যায় না, ইহা যেন একটাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া অপরটাকে একেবারে নূতন করিয়া গ্রহণ। এইখানে রবীন্দ্রনাথের মনে লাগিয়াছিল একটা বড় ধাক্কা। সংস্কারাবৃত দৃষ্টিতে তিনি যে নূতনের আকৃতিটাকে এবং প্রকৃতিটাকে ঠিক বুঝিতে পারিলেন না— এবং সেই জন্যই একটা অন্ধ

প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হইয়া উঠিলেন তাহা নয়; ইউরোপ হইতে যাহা-কিছু আসিয়াছিল নূতন তাহাকে খুব ভালোভাবে চিনিতে পারিয়া— ভিতরকার মঙ্গলময় সত্যটুকুকে অকুণ্ঠচিত্তে এবং সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাইয়াও তিনি আন্তরিকভাবেই এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইলেন যে, ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীগ্রহের যে অঞ্চলটিতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি মানুষ জীবনের যে মূল্যবোধ লইয়া যে জীবন-যাত্রা গড়িয়া তুলিয়াছে, মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ অগৌরবের নয়। আমাদের সমাজজীবনে যে সজীবপ্রাণের প্রবাহ ছিল তাহার বিমল শক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের দেহের বহু স্থানে যে বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে এবং আমরা মানুষের মত স্বাস্থ্য ও আনন্দময় বিকাশ লাভের অধিকারী হইব।

এ-কথাটা আজকাল আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রথমবয়সে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে খানিকটা চলিতে চলিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিপ্রবণতা লইয়া পাশ কাটাইয়া একটু দূরে সরিয়া পড়িলেন। কথাটাকে তাহা মিথ্যা বলিব না। সহজাত কবিপ্রকৃতি কর্মসংগ্রামের কোলাহল এবং ধূলিলিপ্ততা হইতে কবিকে যে খানিকটা বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল সে কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কথাটিই সবখানি কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে সরিয়া দাঁড়াইলেন তাহা যথার্থ স্বদেশী-আন্দোলন হইতে নয়, তাহা কংগ্রেস-আন্দোলন হইতে; তাহার কারণও শুধু তাঁহার কর্মকোলাহল-বিমুখ কবিপ্রকৃতি নয়, তাহার কারণের ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়াছি— তাহা হইল জাতীয়-আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটাকে ছিনাইয়া লইবার সংগ্রামকে— শুধু প্রধান নয়— প্রায় একমাত্র করিয়া তুলিবার দুর্বার আগ্রহ। জাতীয়-আন্দোলনের এই রূপটাই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া প্রকটিত হইল, তখন রবীন্দ্রনাথের জাতীয়-আন্দোলনের উপরে অবিশ্বাসটাও ঘনীভূত হইয়া উঠিল— সবটা সত্য বুঝিতে হইলে এই কথাটাও নির্ভুলভাবে লক্ষণীয়।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে— তিনি যাঁহাকে শুধু ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে নয়, জগতের মধ্যে একজন মানুষ হিসাবে সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করিতেন সেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি যখন প্রকাশ্য বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেখানে দেখি, মহাত্মা গান্ধীর 'স্বরাজ'এর আদর্শটিই কবির মনঃপূত ছিল না; কবির আদর্শ ছিল মুক্তির আদর্শ। পূর্বেই দেখিয়াছি এ মুক্তি মুখ্যভাবে হইল চিত্তের মুক্তি, অজ্ঞতা হইতে জড়তা হইতে কুসংস্কার হইতে মুক্তি— যে মুক্তি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষকে আগাইয়া লইয়া চলিবে নিরন্তর মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে। কবি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দেশবাসীকে এই বিকাশের পথে আগাইয়া দিবার কাজেই ছিল তাঁহার স্বধর্ম, স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর হইতে এই স্বধর্মকেই তখন তিনি তাই বাছিয়া লইলেন।

একটা যুগে ভারতবর্ষের মহিমাখ্যাপনে কবি প্রায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ভিতরে এমন উক্তি বা মনোভাব আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয় যে ভারতবর্ষের প্রতি বিধাতার একটি বিশেষ করুণা রহিয়াছে, যাহার ফলে মানব-মহত্ত্বের এমন কতকগুলি দিক্ ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করিয়াছে যাহা অন্যত্র বিরল। কিন্তু ইহার পরে চলিল বিশ-পঁচিশ বছর ধরিয়া কবির কেবলই ভ্রমণের পালা। এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা— কোথাও বাকি রহিল না, দেশবিদেশে যে শুধু প্রচুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুলাভ ঘটিল

তাহা নয়, দেশবিদেশের বিচিত্রধরণের মানুষের সঙ্গে ঘটিতে লাগিল প্রত্যক্ষ এবং আন্তরিক পরিচয়। এই পরিচয় কবির স্বাজাত্যের মোহকে ভাঙিয়া দিল। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার সামনে দেখিতে পাইলেন নির্বিশেষ মানুষকে— যে মানুষের কোনো দেশগত বা কালগত পরিচয় নাই, যে মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ— অনাদি-অনন্তকালে নিরন্তর জায়মান মানুষ। এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার কবিতার মধ্যেও মাঝে মাঝে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে; কিন্তু তখন এই মানুষ ছিল কল্পনার সুদূর শূন্যে ঝিক্‌মিক্-করা নীহারিকাপুঞ্জ; তাহার একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ ছিল, বাস্তব রূপ ও মহিমা ছিল না। তাহাকে লইয়া একটা জীবনচর্যার আদর্শ গড়িয়া তোলা যায় নাই। ১৯১০ সনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বার বৎসরের একটি যুগে কবি নিজের মনের ভিতরকার 'মানুষে'র সহিত দেশে দেশে রক্তমাংসের ভিতরে দুঃখেসুখে ভালোমন্দে বিষয়ীকৃত মানুষের মিলটাকে ভালো করিয়া অনুভব করিলেন, 'ভাবের মানুষ' এবং 'ভবের মানুষে'র ভিতরকার ব্যবধানটা ঘুচিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের গান-কবিতার ভিতরেই অস্পষ্টভাবে একটি ভাবধারার প্রকাশ দেখিতে পাই যে, নিখিল সৃষ্টি কালে কালে তাহার সকল প্রবাহের ভিতর দিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে তাহার মর্মবাণী চেতন মানুষের অনন্ত বৈচিত্র্যময় এবং রহস্যময় প্রকাশের ভিতর দিয়া। এই ভাবধারা ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া যেখানে একটা ধ্রুবপদের মতন কবির মনে ও সুরে দেখা দিল তখন নিখিল মানবের বিবর্তন কবির মনে একটি নিরন্তর জায়মান 'ব্রহ্মকমলে'র রূপ পরিগ্রহ করিল। এই 'ব্রহ্মকমলে'র মহিমা কবির মনকে যখন সবটুকু অধিকার করিয়া বসিল তখন আর 'ভারতকমলে'র দিকে পৃথক্ করিয়া চাহিবার অবকাশ রহিল কোথায়? আর পূর্বেই বলিয়াছি, 'বঙ্গকমল' তো বহুদিন পূর্বেই 'ভারতকমলে'র মধ্যে তাহার মহিমা ও আকর্ষণকে সমর্পণ করিয়া দিয়া ব্যাপক ও গভীর অর্থ লাভ করিতে চাহিয়াছে। তখন কেবল চেষ্টা চলিয়াছে বাঙলার বুকেই 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিশ্বের 'একনীড়' করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

রাজনীতিঘেঁষা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু যোগাযোগ ছিল না ছিল সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম, কথা উঠিবে আর একটি দিক্ লইয়া, অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যে বাঙলার জাতীয়জীবন কি করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা লইয়া।

সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আমরা যখনই তুলি তখনই আমাদের মনের মধ্যে একটি বিশেষ বাসনা থাকে। আমরা জানি, নিখিল মানুষ দেশে দেশে কালে কালে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীতে বা সমাজে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই ভাগগুলিকে সাধারণভাবে বলিয়া থাকি জাতি। বিশেষ ধরণের একটা ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতত্ত্ব, জীবনযাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা-সাহিত্য, প্রথা-সংস্কার— সব লইয়া বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিচিত্র রঙ-রেখা জাগিয়া ওঠে। মনুষ্যসামান্যে জীবনের যে রঙ-রেখা তাহা অপেক্ষা জাতীয়জীবনের এই বিশেষ রঙ-রেখার প্রতি অনেক সময় আমাদের একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ থাকে। অনেকের সাহিত্যে এই উপাদানই যোগায় মধুর একটি স্বাদ, যেমন স্বাদ রহিয়াছে শরৎচন্দ্রের বিভূতিভূষণের তারাশঙ্করের অনেক গল্প-উপন্যাসে। কবি হিসাবে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক কালিদাস রায় প্রভৃতির কিছু কিছু কবিতার উল্লেখ করিতে পারি যেখানে বাঙালীত্বের নিজস্ব মাধুর্য আস্বাদনের মধ্যে একটা বিচিত্র মমতার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এই বাঙালীত্বের মমতা কোথাও বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে নাই। ইহার কারণও স্পষ্ট মনে হয়। বাঙালী জীবনের সকল আনাচে কানাচে ছড়ানো এই যে রঙ-রেখা-মাধুর্যের বিশেষ বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার এবং নিবিড়ভাবে যুক্ত হইবার সুযোগ তিনি পান নাই। নিজের কবিতায় নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে জীবনের বিচিত্র ঐকতানে সবখান হইতে যাহারা সুর মিশাইয়াছে তাহার সব স্তরে গিয়া তাঁহার দৃষ্টি পৌছায় নাই, দৃষ্টি পৌছায় নাই বলিয়াই আকর্ষণও বড় হইয়া ওঠে নাই। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত 'কাঙ্গালীচরণের মা', বিভূতিভূষণের 'ইন্দির ঠাকরুণ', তারাশঙ্করের 'শবলা', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুবের জেলে'— ইহাদের জন্য আমাদের মনে একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। বাঙালীজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ইহাদের পর্যন্ত গিয়া বিস্তৃতি লাভ করে নাই। উপরে উল্লেখিত লেখকেরা এইসব স্তরের বাঙালীজীবনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যেমনভাবে অনেকখানি এক হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ লাভ করেন নাই।

অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে রবীন্দ্রনাথের শতাধিক ছোটগল্পের কথা স্মরণে আসিবে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি অধিকাংশই সঙ্কেতধর্মী অথবা প্রতীকধর্মী, যেখানে তাহা নয় সেখানেও চরিত্রগুলি বিশেষ কোনো ভাবদ্বন্দ্বের বিগ্রহীভূত মূর্তি; এই কারণে এই চরিত্রগুলির বিশেষভাবে কোনো বাঙালী মাধুর্যে মোহ সৃষ্টি করিবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিতরকার চরিত্রগুলি মুখ্যতঃ নাগরিক, এ কথা রবীন্দ্র-উপন্যাস আলোচনাকারিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। নাগরিক জীবনে বাঙালীত্বের বিশেষ আকর্ষণ তেমনভাবে ফুটিয়া উঠিবার কথা নয়। কিন্তু ছোটগল্পগুলির শুধু অবলম্বনই বাঙলার পল্লীজীবন নয়— এগুলির প্রেরণাও বাঙলার পল্লীজীবন। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকের ভার লইয়া প্রথম পল্লীবাঙলায় চলিয়া আসিলেন। পল্লীবাঙলার সহিত কবির এইই সত্যকারের পরিচয়। প্রকৃতিকে জন্মাবধি ভালোবাসেন কবি, এখানে পাওয়া গেল জল-স্থল মিলিয়া প্রকৃতির এক সমগ্র রূপ— যে রূপের সমগ্রতার মধ্যে মানুষও আসিয়া অপর সকল কিছুর সঙ্গে নির্বিরোধে এক হইয়া যোগ দিল। কালিদাস একদিন তপোবনের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির একটি অখণ্ড রূপ— যেখানে চেতনে-অচেতনে কোথাও ছিল না বিরোধ— সমস্ত জুড়িয়া যেন একটি বিরাট্ রহস্যময় অস্তিত্ব। পদ্মাবক্ষে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির নূতন রকমের একটি সমগ্র রূপ; আকাশের চঞ্চল মেঘের খেলা, জলের কলপ্রবাহ, আর তীরে তীরে ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী— তাহার আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট কুটির, তাহারই ভিতরে জীবনের চঞ্চল কলস্রোত; কোথাও যেন ছেদ ছিল না, বিরোধ ছিল না— সব মিলিয়া এক।

কিন্তু প্রকৃতির এই সমগ্রতার ভিতর দিয়াও এই যুগে মানুষ কবিচিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দিল; মানুষের জীবন অমন করিয়া নাড়া দিল বলিয়াই ছোটগল্পের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ— শুধু কবিতায় চলিল না, কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সমানে ছোটগল্পে; প্রকৃতিতে মানুষে এখানে অচ্ছেদ্য ভাবে মেশামেশি আছে বলিয়া এ যুগের কবিতা এবং ছোটগল্পেও রহিয়াছে অপূর্ব মেশামিশি। বাঙালীর পল্লীজীবনকে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরিয়া নদীয়া-রাজশাহী-পাবনার একটা বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সত্যই দেখিলেন— শুধু কল্পনায় দেখা নয়— চোখে দেখা কানে শোনা— হৃদয় দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা। কিন্তু এ-দেখাও দেখিলেন

অনেকখানি নদীবক্ষ হইতে তীরভূমিকে দেখার মত করিয়া, দেখিলেন একটু দূর হইতে পদ্মাবক্ষের 'বোট' হইতে। যেখানে স্থলে নামিলেন সেখানেও দেখিলেন জমিদারী কাছারি হইতে— একটু ব্যবধান রাখিয়া, শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের ন্যায় পল্লীবাসীর সঙ্গে একেবারে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া নয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি হইতে আগে আসিয়াছিলেন, পল্লীর বাঙালী-জীবনে প্রবেশের পথ তিনি প্রথমে রচনা করিয়া দিলেন; ইহার পূর্বে বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এই পথের জাল বিছানো ছিল— আর ছিল গাঁথা-গীতিকাগুলির মধ্যে; বাঙলা উপন্যাস-ছোটগল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে পল্লীবাঙলার ছোটখাটো সুখদুঃখের মধ্যে এমন করিয়া প্রবেশের পথ আর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা-সাহিত্যে পল্লীজীবনে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত -জীবনে প্রবেশের পথ বাঁধিয়া দিলেন; সেই পথের সুযোগ পাইয়া শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর নানা আঁকাবাঁকা পথে সেই জীবনের অনেক দুর্গম এবং অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রাপদ্ধতি এত দুর্গম আনাচে-কানাচে প্রবেশ করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল না এইটাই সবটুকু সত্য নহে, তখনকার দিনে বাঙলা-সাহিত্যে তাহার কোনো রেওয়াজও ছিল না। মানিতে হইবে, রেওয়াজ রবীন্দ্রনাথই আনিলেন; তিনি নিজে সবটুকু দূরে অগ্রসর হইতে পারিলেন না; অতি স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছিতরূপে তাঁহার পরবর্তিগণ নিজের নিজের রুচিপ্রবণতা লইয়া আরও আরও অনেকদূরে আগাইয়া গেলেন। ইহা দ্বারা পরবর্তিগণের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনও বিরোধিতা সূচিত হইতেছে না, রবীন্দ্রনাথের কালসঙ্গত বিস্তারই সূচিত হইতেছে।

বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে আর-একটি জিনিস অত্যন্তভাবে লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, মধ্যবয়সের পরে মানুষ হিসাবে 'বাঙালী'-মানুষ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া আকর্ষণের সৃষ্টি করে নাই। যতদিন যাইতে লাগিল ততই নিখিল মানবযাত্রীর 'ব্রহ্মকমল' রূপটি তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। কিন্তু বাঙলা দেশের প্রতি— অর্থাৎ বাঙলার প্রকৃতির প্রতি যে তাঁহার একটা বিশেষ আকর্ষণ তাহা কোনও দিন হ্রাস পায় নাই— বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। একযুগে কবি গান করিয়াছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই যুগে কবি বাঙালীকেও ভালোবাসি— এ কথাও বলিয়াছেন; আমরা দেখিয়াছি— সে ভালোবাসার পরিধি ক্রমবিস্তৃতি লাভ করিয়া বিশ্বজনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'— এ কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোনো বিশেষ যুগের কথা নয়— এ কথা সমভাবে সমগ্রজীবনের কথা। ইহার প্রমাণ শুধু তাঁহার প্রথম দিককার স্বদেশী গানে নয়— ইহার প্রমাণ আছে তাঁহার সব যুগের গল্পে নাটকে কবিতায় গানে। বিদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়স হইতেই দেখিয়াছেন, অল্পবয়সের অনেক লেখায় এবং পত্রে তুলনায় বাঙলার প্রকৃতির প্রতি কবির বিশেষ টান প্রকাশ পাইয়াছে। তুলনায় সেই অধিক টান শেষজীবন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। মনের ছোট বড় তারগুলির সঙ্গে বঙ্গপ্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনের বিচিত্রতার সঙ্গে যেন একটা নিগূঢ় সুর বাঁধা ছিল; সেই সঙ্গতি কোনও যুগেই ব্যাহত হয় নাই, উত্তরোত্তর যেন আরও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া নিখুঁত হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিহাস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন সম্বন্ধে দুই দিক হইতেই কিছু কিছু আলোচনা করিলাম বটে, কিন্তু আলোচনার অন্তে মনে হইতেছে, 'এহ বাহ্য'। রবীন্দ্রনাথ কখন কোন্ জাতীয়

আন্দোলনের সঙ্গে কেন এবং কতটুকু যোগ দিয়াছিলেন না দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়-জীবনের ভিতরকার যোগ বুঝিতে সেইটাই বড় কথা নয়। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক শত বৎসর পরে যখন নিজেদের দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছি তখন দেখিতে পাইতেছি, যেখানে যেটুকু জাগিয়া উঠিয়াছি তাহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান রহিয়াছে, চিন্তার সচকিত বেদন রহিয়াছে, আর রহিয়াছে বিকাশকামী চিত্তের পাপড়িতে পাপড়িতে তাঁহার সুকুমার সুরের স্পর্শ। একটা জাতি যদি জীবন্ত জাতি হয় তবে কালের প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া জীবনের পথে তাহাকে চলিতেই হইবে, আর চলা থাকিলেই তাহার ভিতরে অনুস্যূত থাকিবে একটা গতিনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছেন আমাদের জাতীয়-জীবনে চলার সেই গতিনির্দেশের সঙ্কেত লইয়া। এই গতিনির্দেশের মধ্যেই জাগিয়া ওঠে জাতির সমগ্র শ্রেয়োবোধ— জীবন সম্বন্ধে তাহার চরম মূল্যবোধ। সেইখানে দাঁড়াইয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ নিয়ন্ত্রণের কাজ লইয়া— সে নিয়ন্ত্রণ সতত সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে তাঁহার মননে আচরণে— তাঁহার ছন্দে সুরে রঙে রেখায়। এই খানেই বাঙলা জাতীয়জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগের সর্বোত্তম পরিচয়।

রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ প্রথম জীবন

শ্রীসুকুমার সেন

প্রতিভা দিব্যজ্যোতির মত। মানুষকে আশ্রয় ক'রে সে জ্যোতির প্রকাশ। পার্থিব জ্যোতির প্রকাশের মাত্রা ও প্রকৃতি জ্যোতির্বস্তুর ও জ্যোতিঃপিণ্ডের আধার ও আধেয়ের উপর নির্ভর করে, দিব্যজ্যোতির প্রকাশের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ভর করে জন্মাবধি লব্ধ সংস্রব ও সংস্কার -জাত মানসিকতার উপর। সম্ভাবনার দিক দিয়ে প্রতিভার বিচারের বিশেষ কোনো মূল্য নেই, কেননা প্রতিভার পরিচয় তো প্রকাশে। অপ্রকাশিত প্রতিভার মূল্য অলিখিত কবিতার মতই, যা নাস্তি তার খোঁজ করা।

প্রতিভার মূল্য তার সৃষ্টির— সৃষ্টি এখানে ব্যাপক অর্থে নিতে হবে— অনুযায়ী। সৃষ্টির দুর্লভতা, তার বিচিত্রতা, তার বিপুলতা, তার ব্যাপকতা— এই তো প্রতিভার পরিমাণদণ্ড। বৃহৎ প্রতিভার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরীর পরিচয়ের মত, অন্তর্হিত হলে পরেই তবে তার স্বরূপ বোঝা যায়; আর যত দিন কাটতে থাকে ততই পালানো-পরীর মত প্রতিভাধরের সৃষ্টির মহার্ঘ্যতা বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে অতিবৃহৎ সাহিত্যপ্রতিভা দুটি জন্মেছে— কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। বাল্মীকি ও ব্যাসের নাম ইচ্ছা করেই বাদ দিলুম। বাল্মীকির লেখা আদিরামায়ণ যুগ যুগ আগেই হারিয়ে গেছে, অথবা তলিয়ে গেছে। সুতরাং কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি মানুষ রূপে বাল্মীকির কবিত্ববিচার সমীচীন মনে করি না। ব্যাস নামে কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক সুনির্দিষ্ট কালে আমাদের পরিচিত অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত রচনা করেছিলেন ব'লে মনে করতে আমার ঐতিহাসিক বোধে বাধে। তার উপর, ব্যাসের ব্যক্তিত্ব বাল্মীকির চেয়েও বেশি ধোঁয়াটে। সুতরাং বাল্মীকিকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের মহৎ কবিদের আলোচনায় ব্যাসকেও টেনে আনা যায় না।

প্রতিভার ক্ষেত্রপ্রসার বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ একাকী। এই একক প্রতিভার আধার যে মানুষটি তাঁর মানসিকতা ও চারিত্র্য সংসারের ও সমাজের পরিবেশে আর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের রঙে-বেরঙে ও আকর্ষণে-বিকর্ষণে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারই এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি। এই আলোচনার যা-কিছু বস্তু তা প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ নিজে জুগিয়ে গেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বিনয় সৌজন্য ও স্বাভাবিক সংকোচ হেতু অনেক বিষয়ে অল্পকথায় সেরেছেন, আর কোনো কোনো বিষয়ে মৌনী রয়ে গেছেন। সেসব বিষয় উপযুক্ত পারস্‌পেক্‌টিভে এনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির একটা *raison d'etre* অর্থাৎ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছি। আমাদের শাস্ত্রে বলে আদিত্যের হৃদয়ে এক হিরণ্ময় পুরুষ বাস করছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্তির কেন্দ্রস্থলে যে মানুষটির মন ক্রিয়াশীল ছিল তার সে মনের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। তবে আমরা আধ্যাত্মিক জাতি বলে সে কৌতূহলকে আমল দিই না। আমাদের কৌতূহল ইহলোকেরও মানুষের উপর ততটা নেই যতটা আছে পরলোকের ও দেবতার উপর। এখন, পরলোক ও দেবতার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি কালধর্মে লোপ পাচ্ছে। কিন্তু পরলোকে দেবতার স্থানে যা আসছে তারা আর যাই হোন বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ— ইংরেজিতে যাকে বলে common man, তা— নন। সুতরাং অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। আমরা

যতই কালপ্রবাহে এগিয়ে চলছি ততই পিছে-ফেলা অতীতের খ্যাত ব্যক্তিদের দেবতা বানিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে দৈবাৎ এক-আধ জন অত্যন্ত অসাধারণ। এই অসাধারণ মানুষ-দেবতাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন কলকাতার ধনী বাঙালী সংসারের ও সমাজের চালচলন ও ক্রিয়াকর্ম পাড়াগাঁয়ের জমিদার-ঘরের থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না। অন্তঃপুরের পরিবেশ অশনবসন ও কাজকারবার শহরে ও পাড়াগাঁয়ে প্রায় পুরাপুরি একরকম ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে অবশ্য তখন ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল করে ভাত রান্না হত না, বাজার থেকে কেনা হত অথবা জমিদারি থেকে চাল আসত। কিন্তু ঢেঁকির পাট তখনও একেবারে উঠে যায় নি। বাড়িতে ধানের মরাই ছিল না বটে, তবে গোলাবাড়ি তখনও ছিল। ঢেঁকিশালার মত একটা চালাঘর ছিল এবং সেখানে ঢেঁকিও ছিল। হয়তো পিঠাপরবে চালগুঁড়ি করা হত। ঠাকুরদের সংসারে পাড়াগাঁয়ের থেকে খুব কমবয়সী মেয়েদের বউ করে আনা হত, এবং সেই সূত্রে অনেক সময়ই বধূর আত্মীয় মহিলাও ঠাকুরপরিবারে স্থান পেতেন। বধূরা প্রায়ই একটি অঞ্চলের (যশোর-খুলনা) থেকে আসতেন, কেননা পিরালী ঘরে মেয়ে দিতে অনেকেই নারাজ ছিল। যাঁরা দিতেন তাঁরা আশা রাখতে সগোষ্ঠী-ভরণপোষণের। তেমনি, মেয়ে দিলেও জামাই পুষতে হ'ত। পাড়াগাঁয়ে সমান ঘরে কারবার তখন কলকাতার ধনীদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কলকাতার ধনী ঘরের সঙ্গে বাইরের সমান দরের ধনী ঘর বিবাহসম্বন্ধ করতে সাধারণত নারাজ হত। কারণ বোঝা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথেরা ধনে ছোট ছিলেন না, কলকাতার দেশি ও বিলিতি সমাজে মানে খুবই বড় ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁদের স্থান মোটেই উঁচুতে ছিল না। তাই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়দের তাঁদের পুষতে হত। এইসব কারণে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে তাঁদের অন্দরমহলে পুরানো একান্নবর্তিতার সঙ্গে শহুরে ভাবের অভাব স্পষ্টভাবে বিজড়িত ছিল। এমনটি সে সময়ের অন্য ধনী সংসারে ছিল কিনা তা জানি না এবং জানবার উপায়ও নেই।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম নিলেন তার অল্পকাল আগেই তাঁদের সংসার থেকে পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়েছিল। তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেখানে দুর্গাপূজা বন্ধ হলেও পাঠশালা বসত, যেমন বসত পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে।

যে পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সে পরিবার বৃহৎ, পুত্র-কন্যায় আত্মীয়-পরিজনে কর্মচারী-ভৃত্যে বৃহৎ। প্রায় সমবয়সী ভাই বোন ভাইপো ভাইঝি বোনপো বোনঝি— এই সবের মধ্যে শিশু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। দুগ্ধপোষ্যতা (infancy) কাটিয়ে ওঠবার পরে যখন বোধশক্তির সূক্ষ্মতা এবং স্মৃতিশক্তির প্রস্ফুটন হল তখন রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যে তাঁর সঙ্গী-সঙ্গিনীদের মত তাঁর শিশুসমাদর নেই। দিনের বেলায় তিনি মাতৃসদন থেকে চাকরদের মহলে নির্বাসিত। এই অনাদর-বোধ ও নির্বাসন-পীড়া রবীন্দ্রনাথের শিশুমানসের গঠনে খুব কাজ করেছে। জননী বহুপ্রসবিনী, তাঁর শরীর খুব পটু ছিল না। তাই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি তাঁর যে-পরিমাণ স্নেহাভিব্যক্তি অপেক্ষিত ছিল ততটা রবীন্দ্রনাথ পান নি। সমবয়সীরা তাদের মায়ের কাছে যে লালন পেত সে লালন, শিশু রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতেন। তা না পেয়ে তাঁর মনে ক্ষোভ রয়ে গিয়েছিল। বেশি বয়সেও এ ক্ষোভের রেশ তাঁর

মন থেকে মুছে যায় নি। তবে শিশু বয়সে সে ক্ষোভ তাঁর সজ্ঞান মনে সঞ্চারিত হয়ে নাড়া দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— অর্থাৎ অন্তর্মুখীনতা— সে বৈশিষ্ট্য তাঁর চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই জাগতে শুরু করেছিল। সে জাগার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়েছিল চাকরদের তাঁবেদারিতে থাকা। তান্ত্রিক যোগী যেমন নিজেকে চক্রমণ্ডলের অভ্যন্তরে রেখে যোগসাধনা করেন এও যেন সেই ধরণের একটা ব্যাপার। তান্ত্রিক-যোগী মণ্ডলচক্রের বেড়ি দিয়ে বহিরাক্রমণ থেকে, চিত্তবিক্ষেপের হেতু থেকে, নিজেকে ঠেকিয়ে রাখে, শিশু রবীন্দ্রনাথও যেন, ঠেকানো থাকতেন দু দিক থেকে— অন্তঃপুরের লালন থেকে আর বহিঃসংসারের আকর্ষণ থেকে। এই শিশুবন্দী-দশার যে সুমহৎ ফল ফলেছিল সে কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে প্রশান্তি, যে যোগিজনোচিত অক্ষোভ ছিল, যা তাঁর চারিত্র্যের একটা মুখ্য লক্ষণ ছিল তার শুরু এইখান থেকেই।[১] অক্ষোভ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে— ভালো-মন্দর কথা তুলব না— এই সংযম-সাধনার ফল অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল। লোভের বস্তু থেকে, এমনকি প্রাপ্য বস্তু থেকে, নিজেকে বঞ্চিত রাখা এবং সে বঞ্চনাকে সহজ ও স্বাভাবিক -ভাবে গ্রহণ করায় রবীন্দ্রনাথ তখন থেকেই অভ্যস্ত হতে থাকেন। অত্যন্ত আবশ্যকের বস্তুর জন্যেও তিনি হাত বাড়াতে কুণ্ঠিত হতে শিখলেন এই বয়স থেকেই।[২] তাই মাতৃস্নেহের ও অন্তঃপুর-লালনের অভিব্যক্তির অভাব অবোধভাবে অনুভূত হলেও রবীন্দ্রনাথের শিশুচিত্তকে আবিল করতে পারে নি। এ বড় সৌভাগ্যের কথা।

ভৃত্যশাসনের ফলে পরোক্ষ উপকার হয়েছিল দু'প্রকারে। এক, ঘরের কোণে জানালার ধারে গণ্ডীবদ্ধ থেকে শিশুমনকে বাইরের দিকে উধাও ছুটোতে পেরেছিলেন, দেহের নিগড় কল্পনাকে বাধামুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। দুই, প্রয়োজনের ও লোভের বস্তুর জন্যে হাত না বাড়ানোর অভ্যাস আপনিই হয়ে গিয়েছিল, আর আদর-অনাদর সম্বন্ধে মন অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে উঠছিল। পরোক্ষ অপকারও যে কিছু হয় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে বরাবরই একটু মুখচোরা, সংকোচশীল ভাব ছিল। সে ভাবের সূত্রপাত হল এই সময়ে— মাতৃলালনের অভাব আর ভৃত্যশাসনের প্রভাব থেকে। প্রত্যক্ষ উপকার হল এই যে, শিশু রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যশাসনতন্ত্রের দাক্ষিণ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহিত্যের রসের প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্যই উদ্‌ধৃত করছি।

> এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ মহাভারত

১ "এমনি করিয়া ত দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও তেমনই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মত পড়িত।"

২ শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে যার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই বহন করেছিলেন এবং নামও ভোলেন নি তার প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে তিনি যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করি। "তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত।··· আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে এই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত।···তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না।"

শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরও দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীরবালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল ;— কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল— অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

শুধু সাহিত্যরসের পেয় নয়, ধর্মতত্ত্বের খাদ্যের স্বাদও প্রথম এইখানেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তখনও তাঁর গায়ত্রী দীক্ষার ও উপনিষদ্ শিক্ষার প্রথম পাঠ নেবার অনেক দেরি।

কোনো কোনো দিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত।

কিশোরী চাটুয্যের কাছে ছড়া-পাঁচালীর ছন্দে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-দীক্ষা হয়েছিল।[৩] বালক রবীন্দ্রনাথের সুকণ্ঠের প্রশংসাও সর্বপ্রথম কিশোরী চাটুয্যের কাছে পাওয়া, দেশি গানে হাতেখড়িও তাঁর কাছে। এই ব্যক্তিটির প্রভাব রবীন্দ্র-মানস গঠনে কুমার ভৃত্য ঈশ্বরের পরেই উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের পরিচারকের কাজ করবার আগে কিশোরী চাটুয্যে পাঁচালির দলে গাইয়ে ছিল।

সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত— আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কি বলিব। শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত— পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে পাঁচটি গানের প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করেছেন। গানগুলি দাশরথি রায়ের পাঁচালির। (কিশোরী চাটুয্যে কি অল্প বয়সে দাশরথির পাঁচালির দলে ছিলেন এবং দাশরথির দল ভেঙে গেলে কি তিনি কলকাতায় এসে ঠাকুর-বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলেন ?) একটি গান, যেমন—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্ত-কারীরে, নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে,
তরল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে॥

---

৩ তার আগেও, ছড়ার বাগর্থরস একটুকুও নিংড়াবার সময় আসে নি, সেই অতিশৈশবেও বৃদ্ধ কৈলাস মুখুজ্জের ছড়া শিশু রবীন্দ্রনাথের মন ভুলিয়েছিল। কৈলাস মুখুজ্জে তাঁদের অনেককালের খাতাঞ্চি, আত্মীয়ের মত। অত্যন্ত রসিক লোক। "সেই কৈলাস মুখুজ্জে আমার শিশুকালে অতিদ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল।··· ···বালকের মত যে মাতিয়া উঠিত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দে দোলা।" কৈলাস মুখুজ্জে যা করেছিলেন তা ঠাকুরমা-দিদিমা-পিসি-মাসি-মায়ের কাজ।

মন, কিমর্থে এ মর্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্তি দুর্বৃত্তি করিলি,— কি হবে রে,
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে।
কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে॥

হিমালয় পর্যন্ত ঘুরে এসে বালক যখন অন্তঃপুরে মায়ের অভ্যর্থনা পেলেন তখন কিশোরী চাটুজ্যের কাছে শেখা এই গানগুলি খুব কাজে লেগেছিল। "এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নিউচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন সে সংসারের বাস্তোষ্পতি এবং শক্তিকেন্দ্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৈদিক অর্থে দম্পতি, সংস্কৃত অর্থে কুলপতি এবং লাটিন অর্থে *pater familias* ছিলেন। তাঁর চারিত্র্যের দৃঢ়তা ও মহিমা দেখিয়া দেশের শিক্ষিত লোকে মহর্ষি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল। সংস্কৃতির খোলা হাওয়াই বলি আর উপনিষদের দীপ্তাকাশই বলি— তা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপরিমণ্ডলের বিকিরণ। রবীন্দ্রনাথের চারিত্র্য গঠনে পিতা দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রভাব সব চেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রনাথ যেন সংসারে থেকেও থাকতেন না। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তিনি, বিষয়কর্মের, জমিদারির, নাড়ীনক্ষত্র বুঝতেন অথচ নিজেকে পরিচালনায় লিপ্ত রাখেন নি। জমিদারি চালনে শৈথিল্য ছিল না, কাঠিন্যও নয়। সংসারকর্মে এই অনুদাসীন নির্লিপ্ততার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহশীল ও প্রীতিমান ছিলেন অথচ কারো সঙ্গে মাখামাখি করতেন না। প্রীতির বিনিময়ে অকৃপণ হয়েও একটু দূরত্ব রেখে চলা রবীন্দ্রনাথের লোকব্যবহারে স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁর এ স্বভাব খানিকটা পিতৃসূত্রে সঞ্চারিত বলে মনে করি।

পিতার কাছেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছিল। পরিবারের মধ্যে কেবল তিনিই বৃহৎ সংসারের চোখ এড়ানো এই কনিষ্ঠতম বালককে অনাদরের অনালোক থেকে টেনে এনে নিজের দীপ্ত সংসর্গে মাসকতক রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যখন উপনয়ন হয় তখন তিনি ফিরিঙ্গি ইস্কুল বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে পড়েন। মুণ্ডিত মস্তকে সে ইস্কুলে যাওয়া অসম সাহসের কাজ। একেই রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল-গমনে অত্যন্ত নারাজ, তার উপর এখন নেড়া মাথা। এমন দুশ্চিন্তার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ আসন্ন দেখে, ছেলেকে দেশভ্রমণে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। যে পিতা জন্মের ঢের আগে থেকেই কলকাতা থেকে দূরে বাইরে বাইরে থাকতেন এবং যে পিতা বাল্যকালে তাঁর কাছে (তাঁর উক্তি অনুসারে) "অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়" সেই পিতার এখন যেন কোলে উঠলেন। পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দূর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন (ফাল্গুন ১২৭৯)। এই হল তাঁর প্রথম রেলে চড়া। এর আগে তিনি কলকাতার বাইরে একবার মাত্র গিয়েছিলেন (১৮৬৯), তাও দূরে নয়— কলকাতার উপকণ্ঠেই, পেনেটিতে।[৪] বাড়ির সদর দরজা রবীন্দ্রনাথ প্রথম পার হয়েছিলেন ছ-সাত বছর বয়সে, যখন কান্নাকাটি করে ইস্কুলে ভর্তি হন (১৮৬৮)। প্রথম ইস্কুলে যাওয়ার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই।"

৪ তখন পেনেটিকে কলকাতার উপকণ্ঠ বলা চলত না। বলা উচিত কলকাতার অল্প দূরে পাড়া গাঁ।

দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত রাশভারি ও কেতাদুরস্ত ছিলেন, কোনো কিছুতেই ঢিলেঢালা সহ্য করতে পারতেন না। "ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না।" পিতার সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে রবীন্দ্রনাথ ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার কিছু অধিকার প্রথম পেলেন। "যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না।" শুধু বেড়াবার স্বাধীনতা নয় কাজে ভার দিবার অছিলায়ও দেবেন্দ্রনাথ বালক পুত্রকে দায়িত্বের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন।

> আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন।···সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন।···
>
> ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

সংস্কৃত লেখা কপি করতে দিয়ে, সংস্কৃত ও বাংলা রচনা করতে উৎসাহ দিয়ে, ইংরেজি ও সংস্কৃত বই পড়িয়ে, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা থেকে শব্দরূপ মুখস্থ করিয়ে, আর বিজ্ঞানের (জ্যোতির্বিদ্যার) সূত্র মুখে মুখে ব'লে পিতা পুত্রকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। পাঠ্যতালিকার বাইরের এই বিদ্যা ও রচনা -শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশে খুব উপকার করেছিল। বিজ্ঞান-সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবর একটু টান ছিল। সে টানের সূত্রপাত না হলেও রজ্জুপাত এইখানেই। (সূত্রপাত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভের প্রবন্ধ পড়ে।)

> পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন।···একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনা কার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলট পালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে সেখানে যথেচ্ছা অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে এমন উচ্ছৃঙ্খলতায় পিতার ভৎর্সনা পান নি বলেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ব্যবহার নিছক বৈয়াকরণিক কুণ্ঠায় কখনো কুণ্ঠিত হয় নি।

> ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

বাংলা প্রবন্ধ লেখার বীজাঙ্কুর এই করেই দেখা দিয়েছিল।

পুত্রের দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের কিছুমাত্র অনবধান ছিল না। রাত্রির অন্ধকার দূর হবার আগেই বালককে শয্যাত্যাগ করতে হত। তার পর প্রাতর্ভ্রমণের পর বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হত। "ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না।" তার পর বড় এক বাটি দুধ খাওয়া। "দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল।"

প্রথমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তার পর আনন্দ। সেও উপেক্ষিত হয় নি।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে— আমি বেহাগে গান গাহিতেছি— "তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে। কে সহায় ভব-অন্ধকারে"— তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুইহাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন— সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে কৃতিত্বের প্রথম স্বীকৃতি ও পুরস্কার যে পিতার কাছ থেকেই পাওয়া তা এই প্রসঙ্গে তিনি জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সে তেরো-চোদ্দ বছর পরেকার (১২৯৩ সালের) কথা। এইখানেই বলে রাখি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।"

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের চারিত্র্য যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল আর সে চারিত্র্য তাঁর মনের গঠনে আদর্শের দাগা বুলিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন—

মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল— তা হিসাবের অঙ্কই হোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক বা অনুষ্ঠানের আয়োজন হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে হিমালয়যাত্রা প্রসঙ্গে শুধু কোনো এক বড়ো স্টেশনে[৫] টিকেট-কলেক্টরের আচরণ ও দেবেন্দ্রনাথের মৌন ক্রোধের উল্লেখমাত্র করেছেন।

তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ অনেক করিয়াছি— তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা

৫ সম্ভবত দানাপুরে অথবা মোগলসরাইয়ে।

আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না— তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।···যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

নৈবেদ্যের কোনো কোনো কবিতায় ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরকে রাজা ও পিতা -রূপে দেখেছেন তখন তাঁর সেই দৃষ্টিতে তাঁর পিতৃদেবের প্রতিচ্ছবি যেন প্রতিফলিত। ব্রহ্ম-উপাসনার একটি প্রধান মন্ত্র— উপনিষদের "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি"[৬]— রবীন্দ্রনাথ যেন নিজে পিতৃদেবের মূর্তিতে কিছু উপলব্ধি করেছিলেন।

সংসার পথে শত সংকট ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে,
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি অমর তরুচ্ছায়ে।
নিন্দা ও ক্ষতি, মৃত্যু বিরহ,
কত বিষবাণ উড়ে অহরহ—
স্থির যোগাসনে চির-আনন্দ, তাহার নাহিকো নাশ।

দেবেন্দ্রনাথের পক্ষেও এ বর্ণনা বেশ খাটে।

সকল সংসার বন্ধে বন্ধন বিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন।—

এ মুক্তির আদর্শ তো দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।—

এ পত্রগুলি নৈবেদ্যের উৎসর্গে[৭] থাকলেও কিছুমাত্র বেমানান হত না।

দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনে উপনিষদের প্রভাবের কথা আসে। আমরা সবাই মনে করি (এবং সেই মতো অনর্গল বলি ও অক্লান্ত লিখি) যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আসলে উপনিষদের উৎস থেকে উৎসারিত। এই ধারণা এখন ভালো করে বিবেচনা করবার সময় এসেছে। উপনিষদের রস বলে যা আমরা রবীন্দ্ররচনায় আস্বাদন করি সে রসের স্বাদ উপনিষদের মন্ত্র কানে যাবার ও উপনিষদ্ পড়বার

---

৬ 'তুমি আমাদের (সত্যকার) পিতা বটে, তুমি আমাদের (মানবজন্মের) পিতার মত হও।'

৭ "এই কাব্যগ্রন্থ পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।"

অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। সে হল আনন্দরস, বেঁচে থাকার এবং চারি দিকের জড় ও জীবন, বস্তু ও অবস্তু দেখে শুনে ভেবে কল্পনা করে নির্হেতু ভালো লাগা।[৮] উপনিষদের মন্ত্র পাবার পর যখন তা বোঝবার সময় এসেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে এ তো নতুন কথা নয়— তাঁরই মনের গোপন কথা—

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।

অর্থাৎ— 'যা কিছু প্রকাশ পায় (সবই) তা আনন্দরূপ এবং অমৃত।'

এই যা-কিছু প্রকাশ হচ্ছে তা প্রাণেরই প্রকাশ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুভবে আনন্দরূপমমৃতং হচ্ছে অনবচ্ছিন্ন প্রাণরস।

রামমোহন রায় উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত মনস্বীদের কাছে উপনিষদকে পরিচিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মত। শঙ্করাচার্যের কাছে যেমন রামমোহনের কাছেও তেমনি উপনিষদ বেদান্তসূত্রের যেন তুলা যুগিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ব্রহ্মউপাসনা স্বীকার করেছিলেন কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তকে পুরাপুরি মেনে নেন নি। রামমোহন উপনিষদকেই মূল বলে আশ্রয় করেছিলেন।[৯] রামমোহনের ব্রহ্ম প্রধানত সৎ ও চিৎ, আনন্দের প্রকাশ রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞানে খুব পরিস্ফুট নয়। ব্রহ্মের আলোচনায় তিনি আনন্দভাতির কথা তোলেনই নি। রামমোহনের সুফীশাস্ত্র পড়া ছিল, সম্ভবত সুফীতত্ত্বও ভালো করে জানা ছিল। তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান তাঁর অধ্যাত্মভাবনায় আনন্দের রঙ ফোটাতে পারে নি। রামমোহন, গীতার উক্তি অনুসারে, বুদ্ধিতেই শরণ ইচ্ছে করেছিলেন, অনুভবে নয়। দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনায় উপনিষদের সত্য ও আনন্দবোধের সঙ্গে সুফী-প্রেমবোধ বিজড়িত ছিল, তবে বৈষ্ণব-প্রেমভাবনার স্পর্শ ছিল না। তাই দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তায় ও অধ্যাত্মপ্রচেষ্টায় ইমোশনের প্রকাশ ছিল নিরুদ্ধ এবং আনন্দের অনুভব ছিল শুধু সৌন্দর্যবোধেই অবরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথের মত অতটা গভীরভাবে আত্মমুখী ও ধ্যানতন্ময় নয় তবে সে দৃষ্টি আত্ম-অনাত্মকে এক করে নিয়ে জীবনকে অনাদি-অনন্ত এবং অবিচ্ছিন্ন অনুভব ক'রে বুদ্ধিবিদ্যার ও দেশকালের সীমানা অতিক্রান্ত হয়েছে। সে দৃষ্টিতে প্রেমের যে রঙ লাগা তা সুফীর নয় বৈষ্ণবের। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরেও ভক্তি ছিল— সে ভক্তি শান্ত ও দাস্য রসের— বড় জোর সখ্য রসের। রবীন্দ্রনাথের অন্তর ভক্তিময়— সে ভক্তি বিশ্বব্যাপী মধুর রসের।

দেবেন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলে দুজনের চারিত্র্যপ্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের উপর সমধিক কার্যকর হয়েছিল। একজন তাঁর প্রথম সাহিত্যগুরু বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, আর একজন তাঁর সংগীতরসগুরু, পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ। দুজনেই আনন্দরসিক ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, দুজনেই অত্যন্ত সরলহৃদয় ও করুণচিত্ত।

৮ রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই এই ভালো লাগার স্বীকৃতি আছে,— "লাগল ভালো, মন ভুলাল,— এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই।"

৯ রামমোহনের বেশ বৈষ্ণব বিদ্বেষ ছিল। অথচ তাঁর পিতৃবংশ বৈষ্ণব, তাঁদের গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ। মাতৃবংশ ঘোর তান্ত্রিক। রামমোহনের আকর্ষণ ছিল তন্ত্রের দিকে। সেইজন্যে তিনি তন্ত্রকে বেদান্ত মতে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টার ফলেই বোধ করি মহানির্বাণ তন্ত্রের উৎপত্তি। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা ছিল তার বিরুদ্ধে রামমোহনের আপত্তি আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু চৈতন্যের প্রতি তাঁর বিরাগের হেতু বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ ভাগবত ছাড়া আর কোনো ভক্তিগ্রন্থ তাঁর পড়া ছিল না। রামমোহনের বৈষ্ণববিদ্বেষ কিছুপরিমাণে জ্ঞাতিবিরোধের অপরোক্ষ ফল হতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই পুত্র কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং দুই পুত্রেরই কবিত্বশক্তি অপর্যাপ্ত ও প্রাণপ্রচুর। মেঘদূতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ সে একদিন তাঁর বাল্যকালে বড়দাদার মুখে আবৃত্তি শুনেই প্রথম অনুভূত হয়েছিল। বড়দাদার কবিতার ভোজে রবীন্দ্রনাথ যখন যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স নিতান্ত কাঁচা। তবুও তাতে তাঁর যে উপকার হয়েছিল সে তাঁর নিজের কথাতেই বলি।

> বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন।…
>
> তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম।…স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম— তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছায়া রবীন্দ্র-রচনায়, গদ্যে ও পদ্যে আছে। বিশেষভাবে আছে ছড়া কবিতায় ও চিঠি লেখায়।

এই প্রসঙ্গে দাদাদের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের একটা মোটামুটি মন্তব্য করা যেতে পারে।

বড়দাদার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তি প্রায় পিতৃতুল্য ছিল। শেষকালেও তিনি বড়দাদাকে "শ্রীচরণেষু" বলে চিঠি আরম্ভ করতেন এবং সেইভাবে প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করতেন। বড়দাদা ও মেজদাদার মধ্যে বয়সের পার্থক্য দুবছরের বেশি নয়। কিন্তু মেজদাদাকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সখার মত অন্তরঙ্গভাবে দেখতেন। তাই মাঝবয়সের চিঠিতে তাঁকে সম্বোধন করতেন "ভাই মেজদাদা"। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর শিক্ষায় যে মোটা অংশটা স্বেচ্ছাগৃহীত তার মধ্যে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের হাত খানিকটা ছিল। কর্মসূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সহরে যখন যেখানে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। সত্যেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে বিলাতে নিয়ে যান আর পরের বারে বিলাত-গমনেও সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, তাঁর পত্নী ও শিশুপুত্র-কন্যার সাহচর্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে মনের গড়নে ও সাহিত্যের দৃষ্টিতে কার্যকর হয়েছিল। এ সব কথা পরে বলছি।

মোট কথা মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল বিমিশ্র— ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সৌহার্দ্য।

ভাইদের মধ্যে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বোধকরি সব চেয়ে অ-কবিমন ও প্র্যাক্‌টিক্যাল ছিলেন। ইনি বাড়ির ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষার যে সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা করেছিলেন তার সুফলের স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আছে। ন (অর্থাৎ চতুর্থ) দাদা বীরেন্দ্রনাথ যৌবনকালেই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলেন নি।

দাদাদের মধ্যে নতুন (অর্থাৎ পঞ্চম) দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে ঘনিষ্ঠতা ছিল সব চেয়ে বেশি। দুভাই পরস্পরকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তার মধ্যে দুতরফেই ছিল প্রীতি ও সৌহার্দ্য। দুভাইয়েরই সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রথম থেকে আর নাট্যচর্চা পরের দিকে, কিছুকাল ধরে সহযোগিতায় ও সমবায়ে চলেছিল। সে কথা জীবনস্মৃতিতে ভালো করে বলা আছে।

ছোটদাদা সোমেন্দ্রনাথ (যাঁকে তিনি জীবনস্মৃতিতে "দাদা" বলে উল্লেখ করেছেন—) তিনি রবীন্দ্রনাথের

চেয়ে দুবছরের বড় ছিলেন। দুভাই ছেলেবেলায় এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সোমেন্দ্রনাথের সমবয়সী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলিও ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এই তিন শৈশব ও বাল্যসঙ্গীর কথা আছে। কোন কোন গল্পের ভূমিকায়ও আভাস ইঙ্গিত আছে। ছোট ভাইয়ের কবিত্বগৌরবে সোমেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই গৌরববোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত কাব্য বনফুল তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। (বনফুল প্রকাশের কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী গ্রন্থাকারে বার হয়েছিল। প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ সোমেন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গের একজন ছিলেন। মনে হয় কবিকাহিনী প্রকাশেরও আসল উদ্যোক্তা সোমেন্দ্রনাথ।) প্রথম যৌবনেই শিরোরোগে পড়ায় সোমেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনের অন্তরঙ্গতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সোমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অল্প তবে যথোচিত কথা বলেছেন। তাতে দাদার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ধ্বনিত।

দিদিদের মধ্যে শুধু দুজনের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা জানা যায়। বড়দিদি সৌদামিনী ছিলেন "তিন সঙ্গী"র অন্যতম সত্যপ্রসাদের মা। মাতার মৃত্যুর পূর্বেও সৌদামিনী দেবীই পিতার বাড়িতে থাকলে তাঁর পরিচর্যার ভার বহন করতেন। মাতার মৃত্যুর পরে তিনি সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে ও ছোট বোনদের তত্ত্বাবধান করতেন। এঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তিপ্রীতির পরিচয় বউঠাকুরানীর হাটের উৎসর্গে পাওয়া যায়। সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ জামাতাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সব চেয়ে প্রীতি ও বিশ্বাস -ভাজন ছিলেন। এঁরই উপর দেবেন্দ্রনাথের জমিদারিতদারকের ভার ছিল। (রবীন্দ্রনাথের বিবাহদিনে সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তখন জমিদারির ভার প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর তার পর রবীন্দ্রনাথের উপর পরে।) রবীন্দ্রনাথের প্রথম যাকে বলা যায় officially প্রকাশিত বই সেই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশ করেছিলেন সারদাপ্রসাদ, সম্ভবত এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার রূপে।

ন-দিদি স্বর্ণকুমারী ভারতীর আসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন। এঁর সাহিত্য কৃতিত্ব সকলেরই জানা।

সোনার-তরীতে যে 'গানভঙ্গ' কবিতাটি আছে তাতে "বুড়া রাজা প্রতাপ রায়" দ্বিজেন্দ্রনাথের এবং গায়ক "বুড়া বরজলাল" শ্রীকণ্ঠ সিংহের মডেলে আঁকা। (কবিতার বিষয় স্বপ্নে পাওয়া—জুলাই ১৮৯২—এবং স্বপ্নেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভূমিকা অনুরূপ।)

শ্রীকণ্ঠ সিংহ তাঁর আনন্দ পরিবেশের মধ্যে এলে রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করেছিলেন বললে অন্যায় হয় না। এই আত্মসাৎ করা মানে আনন্দের অভিষেক। বালকের কবিতা শুনে গান শুনে শ্রীকণ্ঠবাবু বিস্ময়ে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের চারিত্র্যে একটি প্রধান প্রবণতা হ'ল জীবনকে ভালোমন্দ সবশুদ্ধ নিয়ে ভালোবাসা। সে ভালোবাসায় তৃপ্তির প্রশ্ন নেই, পর্যাপ্ততার সীমা নেই, শান্তির অগাধতা আছে, প্রণতির আত্মসংকোচন আছে। এ ভালোবাসার শিক্ষা শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে পাওয়া। "ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত-সমালোচক পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য।" "পরিচয় থাক আর নাই থাক, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে, কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না।" এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠবাবুর চরিত্রের একেবারেই মিল নেই। (রবীন্দ্রনাথ কখনোই উপযাচক হয়ে কারো সঙ্গে মিশতে পারতেন না।) সে কারণেও রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রতি আরো বেশি ক'রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। —ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল।...

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত।...ঝরনার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিত যে ব্যক্তিটি তাঁর সাহিত্যে সব চেয়ে বেশিবার আর সবচেয়ে গাঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে হল শ্রীকণ্ঠবাবু। বউঠাকুরানীর-হাটের বসন্ত রায়, চিরকুমার সভার রসিকদাদা, শারদোৎসবের সন্ন্যাসী— এইসব ভূমিকায় সাজ বদল ক'রে শ্রীকণ্ঠবাবুই উঁকি দিচ্ছেন।

এইবার ইস্কুলের কথায় আসা যাক। অত্যন্ত অল্প বয়সে— ছয় কিংবা সাতবছর বয়সে— রবীন্দ্রনাথ দাদাদের ইস্কুল যাওয়া দেখে জেদ করেই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই ইস্কুল তাঁর ভালো লাগে নি। ক্লাসে বন্দী হয়ে থাকাটাই যে শিশুর একমাত্র কষ্টের বিষয় ছিল তা নয়। নিজের বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকায় তো অভ্যাস ছিল। আসলে কষ্ট ছিল মন চালনায় স্বাধীনতা না থাকায়। মন দিতে হত বইয়ের পাতায় অথবা বোর্ডের আঁকায় কিংবা মাস্টারের কথায়। ইস্কুলে সহপাঠী ছেলেদের ব্যবহারও মোটেই ভালো লাগে নি। অনেক মাস্টারের ব্যবহারও খুব খারাপ লেগেছিল। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, অতি ভালো মানুষ লাজুক কাঁচা বয়স বিশেষ অভিজাত ঘরের ছেলে, বাইরের ছেলের সঙ্গে মেশার যার কোনো কালে অভ্যাস নেই এমন কোনো ছেলেকে সহপাঠী পেলে সাধারণ ছেলের দল কৌতূহলী হয়ে বিরূপ আচরণে বিরক্ত করবেই। কিন্তু কোনো কোনো শিক্ষকও যে অভদ্র, নীচ ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন তার তো কোনোই সমর্থন নেই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। সেখানে এক সেসনের বেশি ছিলেন না। তার পর যান নর্মাল স্কুলে। সেখানে গোড়ার দিকেই এক শিক্ষক এমন অপ্রত্যাশিত হৃদয়হীন ব্যবহার করেছিল যার ফলে এক শ্রেণীর ইস্কুল-শিক্ষকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মন চিরকালের জন্য বিরূপ হয়েছিল।[১০] এই কাহিনী তাঁর প্রথমদিকের একটি ছোট গল্পে লিপিবদ্ধ আছে। সে গল্পের নাম 'গিন্নি'। এই শিক্ষকের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।

---

১০ "পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমনকি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত এখনি অধ্যাপনাকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এইসকল লোকেরাই অন্য কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতী করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে— বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতি ক্ষুদ্র ঘটিবাটি চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।" (ডিটেক্‌টিভ্)

"শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ পক্ষপাতপরায়ণতা ছিল" তা ইস্কুলে যাবার অল্পকালের মধ্যেই বালক রবীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ইস্কুলে তিনি এমন শিক্ষকও পেয়েছিলেন যাঁরা বালক রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন।

এঁদের কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনে কখনো ভোলেন নি। তবে এঁরা অধিকাংশই তাঁর ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না, কেউ বা ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, কেউ বা মাঝে মাঝে ক্লাস নিতেন, কেউ বা দৈবাৎ দুই-একদিন অন্য শিক্ষকের একটিনি করেছিলেন। এমন দুজন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম পাব্‌লিক পৃষ্ঠপোষক বলে স্মরণীয়। একজন হলেন সাতকড়ি দত্ত। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন জানতে পেরে তিনি উৎসাহ দেবার জন্যে দু-এক ছত্র কবিতা দিয়ে তা বাড়িয়ে পূর্ণ কবিতা করে আনতে বলতেন। এমনি কবিতা পূরণের একটি জীবনস্মৃতি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন নর্মাল ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু, "ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটা-সোটা মানুষ"। ছেলেরা তাঁকে ভয় করত। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফরমাস করে নীতি-কবিতা লেখাতেন।

যাঁর কাছে নিয়মিত শিক্ষা পান নি, অথবা কবিতা লেখার ফরমাস কিংবা কবিতা লেখার জন্য প্রশংসাও পান নি এমন এক শিক্ষকের কদাচিৎ সান্নিধ্যটুকু বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্ত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়েন।

> সেণ্ট জেবিয়ার্সের একটি পবিত্র স্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকদের স্মৃতি।···কিন্তু তবু সেণ্ট জেবিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডি. পেনেরাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না;—বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডি. পেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ট্যাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই।"—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার

সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম— আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

গৃহশিক্ষকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উপকৃত তা জীবনস্মৃতিতে ভালো ক'রে বলা আছে, তার বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল একজনের সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। তিনি রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। রামসর্বস্ব পণ্ডিতের উদ্যোগেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য রচনা প্রথম সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] ইনি রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃতও পড়িয়েছিলেন।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের বাইরে দু ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। এ দুজন হচ্ছেন সে সময়ের দুই প্রধান মনীষী—বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। দুজনেই প্রচণ্ড পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা গোড়াথেকেই বিদ্যাসাগরের বই প'ড়ে—বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, আখ্যান মঞ্জরী, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চার হওয়ার তো কথা নয়, বিশেষ করে অল্পবয়সীর। বিদ্যাসাগরের বইয়ে মুখপত্রে তাঁর যে প্রতিকৃতি ছাপা থাকত (এবং এখনও থাকে) তাও তো মনোহারী নয়। রবীন্দ্রনাথদের সংসারে ও ও সমাজে বিদ্যাসাগরের আসাযাওয়া ছিল না। (বিদ্যাসাগর একবছর মাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার অনেক আগে।) সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মনে বিদ্যাসাগরের প্রতি যে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল তা ব্যক্তি সংস্পর্শ বিহীন, তা হল তাঁর গুণের জন্য, তাঁর চারিত্র্য দৃঢ়তার জন্য শ্রদ্ধা। তখনও বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীগ্রন্থ বার হয় নি, তাঁর "স্বরচিত জীবনচরিত" তো নয়ই। কিন্তু তাঁর জীবনের অনেক বৃত্তান্ত, তাঁর অনেক আচরণের কাহিনী দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে শোনার সূত্রেই যে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল তা মনে হয় না। আরও অনেক কারণ ছিল। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের পরিবারের জ্যেষ্ঠরা সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু ছিলেন, বালক রবীন্দ্রনাথ এই শ্রদ্ধার সৌরভে মানুষ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর বয়সের সংস্কৃত অধ্যাপক এবং তাঁর রচনার প্রথম প্রকাশক (মাসিক পত্রিকায়) রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের কাছে বিদ্যসাগরের মহৎ চারিত্র্যের ও মহৎ হৃদয়ের অনেক কথা শুনে থাকবেন। বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ের (মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের) প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ইনি, বিদ্যাসাগরের পরিচিত ব্যক্তি।[১২] ইনিই বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বিদ্যাসাগর-দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।··· পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু

১১ ইনি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদক হলে পরেই রবীন্দ্রনাথের রচনা-সে পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

১২ এই বিদ্যালয়ের আরও কোনো কোনো শিক্ষক কখনো না কখনো রবীন্দ্রনাথদের গৃহশিক্ষকতা করেছিলেন। যেমন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্রজবাবু (? ব্রজনাথ দে) তখনকার দিনে গভর্নমেণ্ট স্কুল-কলেজের বাইরে ভালো শিক্ষক বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়েই মিলত।

করিতেছিল ; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই ; অতএব এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।

অনেককাল পরে যখন দ্বিতীয়বার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ নিয়ে ফেরেন নি, সত্য শিক্ষা নিয়ে ফিরেছিলেন। তবে সে সত্যশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হয়েছিল। সে ব্যাপার হ'ল সাহিত্যের সভা স্থাপন নিয়ে (১৮৮২)।

···বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।···যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো— হোমরাচোমরাদের লইয়া কোন কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না।···

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল— হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

বিদ্যাসাগর-চারিত্র্যের দৃঢ়তা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। এমন কোমল কঠিন মানুষ তিনি এ দেশের মাটিতে আর দ্বিতীয়টি জন্মাতে দেখেন নি। বিদ্যাসাগর মানুষটির যে মূল্য আমরা এখন দিই তা আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি আধুনিক কালের দুটি বাঙালীকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। একজন তাঁর অদেখা— রামমোহন রায়। আর একজন তাঁর দেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর যেমন পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচর্চার গুরু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তেমনি অ-পাঠ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর মনশ্চর্যার গুরু।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারি মধ্যে ছিল। সেটা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া···তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

সাহিত্যের সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ নিয়ে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই প্রথম পরিচয়েই এই বিখ্যাত পণ্ডিত ও দুর্ধর্ষ বাগ্মীর ব্যবহারে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

···রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।

পরিচয়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই রাজেন্দ্রলালের কাছে যখন তখন যেতেন—

> আমি সকালে যাইতাম— দেখিতাম, তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনাবশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেনসিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক-একদিন সেইরূপ কোনো একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম।

বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। তিনি রবীন্দ্রনাথেরও ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের গুরু।

প্রাচীন ভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে সজাগ কৌতূহল ছিল তা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে এসেই ভালো ক'রে জেগেছিল। রাজেন্দ্রলাল আমাদের দেশে বৌদ্ধবিদ্যার পথপ্রদর্শক। ইনি প্রত্নবিদ্যায়ও বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের মহাগুরু। বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলিতে কেউ যদি থাকে তো রবীন্দ্রনাথ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত রাজেন্দ্রলাল-শিষ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি, কি এদেশে কি বিদেশে। সুতরাং 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও প্রাপ্য।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের সাহিত্যের সঙ্গী বলে উল্লেখ ও ইঙ্গিত করেছেন তাঁদের দ্বারাও রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী সর্বাগ্রে গণনীয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-আসর পেতেছিলেন সে আসরে প্রবেশের অধিকার পাবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখকজীবনের সত্যকার যাত্রারম্ভ। গান রচনা, সুর তৈয়ারি, নাটক বিচার ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য অকুণ্ঠভাবে নিতেন এবং তাঁর সঙ্গে সমবয়সীর মতোই ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথের career যে আর-পাঁচজনের ভদ্র বাঙালী ছেলের মত ইস্কুল-কলেজের বেড়া ডিঙিয়ে পাস-ফেলের তুফান কাটিয়ে চাকুরিতে অথবা আইন-ব্যবসায়ে এসে উত্তীর্ণ হয় নি তার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাগ অনেক অংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষা

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, এ কথা সকলেই জানেন। সেই সময়ে আশ্রমের আদর্শ ও শিক্ষার বিষয়ে যে-সকল আপত্তি উঠেছিল বা উঠতে পারত— রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নানাস্থানে তার উল্লেখ করে যথাবিহিত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী-কালেও রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সমালোচকগণ এই জাতীয় আপত্তির আলোচনা করেছেন। তাই থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আশ্রম-শিক্ষার বিরোধী মতবাদ স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে বরাবরই বর্তমান ছিল। আধুনিককালে এই মতবাদ নানাক্ষেত্রে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রশ্ন উঠেছে এই আশ্রমের শিক্ষা ও আদর্শ বর্তমানকালের উপযোগী কি না। ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবের উপলক্ষে সর্দার পাণিক্করের অভিভাষণে এই মৌলিক প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল, এবং প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বভারতীর সমালোচনা না ঘটে থাকলেও পরোক্ষভাবে তার কয়েকটি চিরাচরিত মূল আদর্শের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সমসাময়িক কাগজে-পত্রে এই সূত্রে কিছু বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে এমনও যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আশ্রমের আদর্শকে বহুকাল ত্যাগ করেছিলেন এবং তদনুসারে আদর্শ ও কার্যকলাপে শান্তিনিকেতনের প্রাচীন রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আশ্রমের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে সত্যই পরিত্যাগ করেছিলেন কি না, এই আদর্শ তাঁকে কেন আকৃষ্ট করেছিল এবং তার সমর্থনে তিনি কী যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, এবং বর্তমান কালের ও আধুনিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদর্শ ও যুক্তিগুলির মূল্য কী— এই প্রশ্নগুলিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই প্রশ্নগুলির পুনর্বিচারের নানা দিক থেকে প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের কয়েকটি মূল আদর্শের সত্যাসত্য নিরূপণ ও মূল্যায়ন এর উপর নির্ভর করছে। সেই সূত্রে শান্তিনিকেতনের ও বিশ্বভারতীর স্বরূপ ও সার্থকতার দিঙ্‌নির্ণয় সম্ভব হবে। পরিশেষে, এই প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের কয়েকটি প্রয়োজনীয় সমস্যার সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যার মূল্য কেবল ভারতের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়।

২

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে আদিম সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রমকে বৈদিককালের তপোবনের হুবহু অনুকরণে পরিণত করার বিরোধী ছিলেন ; এবং এ বিষয়ে নানাস্থানে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন : "ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র।" —'শিক্ষাসমস্যা'। তাই প্রাচীন তপোবনের মূল আদর্শগুলির বর্তমানকালের পটভূমিকায় অবতারণা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। "প্রাচীনের নকল হবে না, অনেক বৈসাদৃশ্য থাকবে, এমনকি অনেক কিছু উল্টোও থাকবে— কিন্তু মূল আদর্শটি অক্ষুন্ন থাকবে।" —'প্রাক্তনী', পৃ. ১৩। এই কথাই অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন : "the spirit of the tapovana in the purity of its original shape would be a fantastic anachronism in the present age. Therefore, in order to be real, it

must find its reincarnation under modern conditions of life and be the same in truth, not merely identical in fact." —*A Poet's School.*

কিন্তু সেই সঙ্গেই সমান প্রত্যয়ের সহিত তিনি বলেছিলেন যে প্রাচীন তপোবনের আদর্শের অনেকখানিই বর্তমান কালেও প্রযোজ্য, কারণ তার মধ্যে সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যের উপাদান আছে। "তপোবনের যুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু তখনকার কালে যে আদর্শ সক্রিয় ছিল তা সত্য, তা বিশেষ কালে আবদ্ধ নয়।" —'প্রাক্তনী', পৃ. ১৩। এই তপোবন-শিক্ষার প্রসঙ্গেই কবি দ্বিধাহীন ভাষায় অন্যত্র বলেছেন, "কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া যাক এই শিক্ষা-নিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ, এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।" —'শিক্ষাসমস্যা'।

যাঁদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে আশ্রমের আদর্শকে প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। শান্তিনিকেতনের সূচনা থেকে বিশ্বভারতীপর্বে তাঁর জীবিতকালের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত উভয় বিদ্যায়তনকেই তিনি 'আশ্রম' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। ৮ই শ্রাবণ ১৩৪৭ সালে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে 'আশ্রমের আদর্শ' শীর্ষক তাঁর সর্বশেষ অভিভাষণটিতে তার সাক্ষ্য আছে। ১৯৩৬ সালে 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে আশ্রম-শিক্ষার সনাতন আদর্শগুলিকে তিনি পুনরায় সকলের সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইংরাজী বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র শীত-সংখ্যায় এই প্রবন্ধের একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় -কৃত এই অনুবাদটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই তথ্য থেকে এও প্রমাণিত হয় যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক কালেও এই আশ্রম-শিক্ষার আদর্শের মর্যাদাকে স্বীকার ও প্রচার করেছেন। পরিশেষে, শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি শেষ রচনা, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আষাঢ়, ১৩৪৮), নামে ও মর্মে এই আশ্রম-শিক্ষার আদর্শ ও সুরকেই প্রচার করেছে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে শান্তিনিকেতনের প্রাথমিক পর্বে ব্রহ্মবান্ধবের আমলে কিংবা তার কিছুকাল পরেও তার যা আকৃতি ও পরিবেশ ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের মধ্যেই তার প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল, যার অনেকটাই কবি বর্তমানকালের প্রয়োজনে এবং তাগিদে কিছুটা স্বেচ্ছায় এবং কিছুটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাও স্মরণীয় যে এ বিষয়ে তাঁর নানা আশঙ্কাও জেগে উঠেছিল এবং এই আশঙ্কা ও আক্ষেপ ক্রমশঃই তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যে মূল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উত্তরকালের নানা বৃদ্ধি ও প্রসারের মধ্যে সেই আদর্শগুলি আচ্ছন্ন ও বিস্মৃত না হয়ে যায় এ বিষয়ে তিনি বারংবার সতর্কতার বাণী উচ্চারিত করেছিলেন। অতএব এ কথা বলা ভুল হবে যে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে আশ্রমের আদর্শকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন।

৩

আশ্রমের শিক্ষার যে-সকল লক্ষণ ও আদর্শ নানাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন এবং তাদের সমর্থনে যে-সব যুক্তি দেখিয়েছেন রবীন্দ্র-শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তা সুপরিচিত। তবে অতি পরিচয়ের অসুবিধা এই যে তা থেকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতি জন্মাবারও সম্ভাবনা। তা ছাড়া, সাধারণের অনেকেরই হয়তো এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই তার সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন হবে না। মতামতগুলির একত্র সমাবেশ ও তাদের সমালোচনাত্মক বিচারেরও স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার অনেকটাই যে অনুমানাত্মক তা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন : "অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যেকালে এই সকল আশ্রম সত্য ছিল সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না।" —'শিক্ষাসমস্যা'। অন্যত্রও বলেছেন, "প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়।" —'আশ্রমের শিক্ষা'। তাই 'তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার' আগ্রহ ও প্রয়াস তিনি করেছিলেন। 'তপোবন' প্রবন্ধেও কবি প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে বর্ণনা করেছেন তারও ভিত্তি মূলতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য।

যদিও ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌, সূত্র, পাণিনি, কৌটিল্য, পুরাণ ও দর্শন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তবুও অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়, "unfortunately, the evidence on the subject is comparatively meagre and not given in any one place in any of the numerous works to be studied for it. One can only find bits of evidence here and there and piece together the scattered bits for constructing a system that may be understood." —*Ancient Indian Education*, Macmillan, 1947, p. 71।

তপোবন-আশ্রমের প্রথম লক্ষণ: তা সাধারণ লোকালয় থেকে দূরে, সহরের বাইরে, অবস্থিত। এই অবস্থিতি বালকের সত্যকার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন, কারণ, "সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি— সেখানে এমন অনুকূল-অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে।" —'শিক্ষাসমস্যা'। "সংসারে কৃত্রিম জীবন-যাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে," সেখানে সুকুমারমতি শিশুদের "সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।" —'শিক্ষাসমস্যা'।

এই অবস্থিতির মধ্যে বাল্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্যপালন আশ্রম-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মচর্যপালনের অর্থ— কৃচ্ছ্রসাধন নয়। "প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।" —'শিক্ষাসমস্যা'। স্বভাবের নিয়মে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর দেহমনের পূর্ণ-বিকাশের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। জীববিজ্ঞান থেকে সুন্দর যুক্তি আহরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়।··· প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে— বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না ; এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না। ছাত্রদের শিক্ষাকালেও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে— ইহাই স্বাভাবিক বিধান।" —'শিক্ষাসমস্যা'। বাল্য থেকে যৌবনে বিকাশের অবস্থায় মনুষ্য-সমাজের নানা বিক্ষোভ, বিকৃতি ও পাপের আঘাত থেকে বালককে রক্ষা করার এই নঙাত্মক প্রক্রিয়াকেই রুসো

'নেগেটিভ্ এডুকেশন' আখ্যা দিয়েছেন এবং এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা বলে প্রচার করেছেন। "The first education, then, should be purely negative. It consists, not in teaching the principles of virtue or truth, but in guarding the heart against vice and the mind against error"—*Emile*, Book II— রুসোর এই অধুনা-সুবিদিত উক্তি রবীন্দ্রাথের ব্যাখ্যায় গভীর ও প্রতীতিজনক সমর্থন পেয়েছে— যদিও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষার আদর্শ রুসোর মতো সম্পূর্ণ নঙাত্মক নয়, তাকে পূর্ণতা দেবার অন্যান্য নানা উপাদানের কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তার বিশদ আলোচনা এখানে অবান্তর। এই প্রসঙ্গে রুসো ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদে আর-একটি মিল পাওয়া যায়। উভয়েরই মতে— বাল্যাবস্থায় নিয়মিত নীতিপাঠ ও নীতি-উপদেশ সত্যকার নৈতিক শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত প্রণালী নয়। রুসো যেমন এই সময়ে 'teaching the principles of virtue of truth'এর পক্ষপাতী নন, 'negative education'এর সাহায্যেই বালকের নৈতিক চরিত্রকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতে 'নীতি-উপদেশ জিনিষটা একটা বিরোধ· ·ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভাণের সৃষ্টি হয়' এবং 'নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম' তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং 'ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া'ই নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। —'শিক্ষাসমস্যা'।

এই তপোবন-শিক্ষার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ-প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষার মহৎ আদর্শের অবতারণা করেছেন যা রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের একটি মুখ্য তত্ত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের বিশদ আলোচনা স্বতন্ত্র অবকাশ-সাপেক্ষ। এ স্থানে তার মূল কথাগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শুধু এই ব্রহ্মচর্য পালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই।" —'শিক্ষাসমস্যা'। সহর মানবসন্তানের স্বাভাবিক আবাস নয়, 'সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষেই' তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। নিসর্গ-প্রকৃতির নানা অঙ্গের সহিত মানবশিশুর সম্বন্ধ জৈবিক ও আদিম, তার মজ্জায় মজ্জায় তাদের প্রতি আকর্ষণ, তাই তাদের সাহচর্যে তার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। এই আনন্দ তার জীবনে জীবনী-রসের সঞ্চার করে। দেহমনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে শিশুর চারি দিকে বৃহৎ অবকাশের প্রয়োজন। "বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান।" —'শিক্ষাসমস্যা'। দেহের শিক্ষার জন্যে 'মাটি-জল-বাতাস-আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ' থাকা আবশ্যক। মনের শিক্ষার জন্যেও প্রকৃতির রাজ্যের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় অসংখ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, নয়তো বইপড়া যান্ত্রিক শিক্ষায় 'জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি' নষ্ট হয়ে যায়।—'আবরণ'। 'বিশ্বসংসারের যে-সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন' ('বিশ্বভারতী' ১৩৫৮, পৃ. ৪৬), প্রকৃতির বিদ্যালয়েই তাঁরা কাজ করে থাকেন। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা ও জ্ঞানের শিক্ষার উপরেও যে-শিক্ষা, অর্থাৎ 'বোধের শিক্ষা', তাও পেতে হবে 'তপোবনে— প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে।' —'তপোবন'। এই বোধের শিক্ষার অর্থ বিশ্বচেতনা; 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ।' —'তপোবন'। এই শিক্ষাকেই রবীন্দ্রনাথ 'যথার্থ শিক্ষা' বলেছেন। জলস্থল আকাশের আনন্দময় অপরিমেয় রূপরাশির মধ্যেই এই বিশ্বানুভূতি সম্ভব। সে অনুভূতি একদা ঘটেছিল ভারতের প্রাচীন আরণ্যক ঋষিদের। এই সব বিবিধ কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার

প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।" —'শিক্ষাসমস্যা'। নিসর্গ-প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষাদানের নীতির সমর্থনে আজকের দিনে নতুন কিছু বলা বাহুল্য। রুসো-কর্তৃক প্রকৃতিশিক্ষা-দর্শনের প্রচারের পর আধুনিক কালের শিক্ষাজগৎ কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে না হোক অন্ততঃ তত্ত্বের দিক থেকে এই নীতিকে মেনে নিয়েছে। কেবল এইটুকু বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিশিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে রুসোর উত্তরসূরী হলেও চিন্তার গভীরতায় ও সত্যতায়, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় প্রসারে ও প্রাবল্যে, এবং ভাবপ্রকাশের অনুপম সৌন্দর্যে সামগ্রিক বিচারে এই বিষয়ে রুসোকেও অতিক্রম করে গেছেন, এবং উক্ত বিষয়ে শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান অধিকার করেছেন।

আশ্রমশিক্ষার আর-একটি প্রধান অঙ্গ বালকদের স্বজন থেকে দূরে গুরুগৃহে বাস। গৃহশিক্ষা ও বিদ্যালয়শিক্ষার আপেক্ষিক উৎকর্ষ শিক্ষাশাস্ত্রের একটি জটিল বিতর্কমূলক সমস্যা। যদিও লক্, হেরবার্ট ও আধুনিককালে প্রখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতি মনীষিগণ গৃহশিক্ষার তরফে রায় দিয়েছেন, অন্যদিকে প্লেটো, অ্যারিস্‌টট্‌ল্, কুইন্‌টিলিয়ান্ প্রভৃতি প্রাচীন চিন্তানায়ক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বহু শিক্ষাশাস্ত্রী গৃহশিক্ষার নানা অপূর্ণতা ও অক্ষমতার নজির দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তির অধিকাংশই বর্তমান যুগের গৃহ ও 'ডে-স্কুলের' পরস্পর সহযোগিতায় সমাধানিত হয়। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শানুযায়ী 'পাব্‌লিক স্কুল' বা বোর্ডিং-স্কুলের যে-জাতীয় আবাসিক শিক্ষার সঙ্গে আমরা পরিচিত, বিদ্যালয়শিক্ষার তা একটি চূড়ান্ত সংস্করণ হলেও বিশেষ বিশেষ অনিবার্য ক্ষেত্র ছাড়া সেখানেও গৃহের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না, বৎসরে স্বল্পকালের জন্যেও বালকের গৃহের সংস্পর্শলাভ ঘটে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমধর্ম-অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালকের আযৌবন সম্পূর্ণভাবে গৃহসম্পর্কবিচ্যুত হয়ে গুরুগৃহে বাসের প্রথা ছিল। এই নীতিকেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মৌলিক ও চিন্তা-পূর্ণ যুক্তির সহিত সমর্থন করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো তিনিও একস্থানে বলেছেন, "নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তো কথাই নেই।··· এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।" —'ধর্মশিক্ষা'। "শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।" —'শিক্ষাসমস্যা'। কিন্তু এ উক্তি সত্ত্বেও তিনি গৃহশিক্ষার বিপক্ষে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এ বিষয়ে তিনি মৌলিক অনিবার্য বাধা অনুভব করেছেন। তাঁর মতে সাধারণ ভদ্র গৃহের পরিবেশেও আদর্শশিক্ষা সম্ভব নয়। কারণ, "সংসারে কেহ বা বণিক্, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটি ছাপ পাইতে থাকে।" —'শিক্ষাসমস্যা'। বালকের স্বাভাবিক স্বকীয় বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ হওয়ার পূর্বেই গৃহের এই বিশিষ্ট ব্যবহারিক ছাপ পড়া রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শশিক্ষার প্রতিকূল, কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, কোনো বিশিষ্ট নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বা সামাজিক ভূমিকার জন্যে পূর্বে থেকেই প্রস্তুত করে তোলা নয়। ধনীর সন্তানের উদাহরণ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়।" —'শিক্ষা-সমস্যা'। আধুনিক গণতন্ত্রবাদ এবং মনোবিজ্ঞান উভয়েরই মূলনীতি ব্যক্তিত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

ব্যক্তির উৎকর্ষসাধন ; পূর্ব-নির্দিষ্ট বাঁধাধরা কোনো পথে অল্পবিস্তর জবরদস্তির দ্বারা শিশুকে প্রভাবিত বা পরিচালিত করা উভয়েরই মূলনীতির বিরুদ্ধ। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এই মূল তত্ত্বটি এমন গভীর প্রত্যয় ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এটা বিস্ময়ের কথা।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুগৃহে বাস যে সার্বজনিক অবশ্য কর্তব্য ছিল তা নয়। ছাত্রদের গুরুগৃহে 'অন্তেবাসী' হয়ে থাকা এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যপালনের পর পিতৃগৃহে 'সমাবর্তনে'র অনেক তথ্য ও কাহিনী বেদে ও উপনিষদে পাওয়া যায় বটে, তথাপি বহু 'গুরুকুল' লোকালয়ের মধ্যেই অবস্থিত ছিল, এবং অনেকক্ষেত্রে ছাত্রগণ পিতৃগৃহ থেকেই— আধুনিক 'ডে-স্কুল' প্রথা অনুযায়ী গুরুকুলে যাতায়াত করত। বাইরে গুরুকুলে পাঠাবার বয়সের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। বৌদ্ধজাতকে জানা যায়, উপনয়নের বেশ কিছুকাল পরে, চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে, অনেকটা সক্ষম অবস্থায় ছাত্রকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। এ অবস্থায় গৃহশিক্ষার গুরুত্বও কম ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে পিতাই পুত্রকে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করে বেদের অধ্যাপনা করেছেন দেখা যায়। তা ছাড়া প্রাচীন বর্ণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী আপন বর্ণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গৃহেই প্রাপ্ত হওয়ার প্রথাও বিরল ছিল না। সে-সময়ে গার্হস্থধর্মের আদর্শও উচ্চ ছিল, সমস্ত সমাজে মহৎ ভাবের ও আকাঙ্ক্ষার পরিবেশ ছিল। তাই গৃহশিক্ষার স্বাভাবিক অপূর্ণতার অনেক পরিমাণে উপশম ঘটতে পারত। এ সত্ত্বেও গুরুগৃহে বাসের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল, কারণ গুরুর নিরন্তর সান্নিধ্য ও ব্যক্তিগত মনোযোগ, সচ্চরিত্র মহদাদর্শ সতীর্থদের সাহচর্য, এবং আশ্রমের পবিত্র উন্নত পরিবেশের গভীর প্রভাবের মূল্য-বিষয়ে সচেতনতা সমাজে প্রবল ছিল। আমাদের বর্তমান সমাজে "অনেকদিন হইতেই সে-আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ আদর্শই গ্রহণ করি নাই"। এ অবস্থায় গৃহের ও লোকসমাজের পরিবেশ পূর্বাপেক্ষা অনেক ক্ষতিকর, এবং সেই কারণে শিশুকে বাল্যকালেই সেই পরিবেশ থেকে দূরে রাখাই কর্তব্য।

দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাসের প্রথার সূত্রেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের কথা এসে পড়ে যা আশ্রম-শিক্ষার একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য বোর্ডিংস্কুলকে অনেকে home-substitute বলে থাকেন। কথাটি আংশিকভাবে সত্য হলেও এই দিক থেকে প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শ ও ঐতিহ্য আরো উৎকৃষ্ট ছিল। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরু সপরিবারে বাস করতেন এবং শিষ্যেরা সেই পরিবারের সন্তানের মতো প্রতিপালিত হত ; গুরু ও গুরুপত্নীর স্নেহসতর্ক লালন পিতামাতার স্থান অধিকার করত ; শিষ্যেরাও আপন পিতা-মাতার ন্যায়, এমনকি তদপেক্ষাও শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁদের সেবা করত। মাতৃক্রোড়চ্যুত হওয়ার পর শিক্ষাকালে গুরুর এই অনাবিল স্নেহ ও ভালোবাসা বালকের ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টির জন্যে কতখানি প্রয়োজন তার গভীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ *My School* প্রবন্ধে করেছেন। এই স্নেহের মাধ্যমেই বাস্তব জগতের রূঢ় সত্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন সহজে ঘটে, এই তাঁর মত। প্রাচীন শিক্ষায় গুরুর স্থান ছিল 'তপোবনের কেন্দ্রস্থলে'। তাঁদের আদর্শ চরিত্র ও জ্ঞানের তপস্যা স্বতঃই শিষ্যের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করত, এবং এই আন্তরিক শ্রদ্ধার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুরুর পবিত্র প্রভাব শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হত। "শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান।" —'আশ্রমের শিক্ষা'। পিতা সন্তানের জনক ; কিন্তু গুরুও শিষ্যকে নবজন্ম দান করেন, যার ফলে তার 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্তি ঘটে ; এই বিচারে গুরুও পিতৃতুল্য। শতপথ ব্রাহ্মণে

উপনয়ন-সংস্কারের বর্ণনায় গুরুর কর্তব্যের এই ব্যাখ্যাটি সত্যই মহত্বপূর্ণ। গুরুশিষ্যের এই সম্বন্ধটির বিশেষ মূল্য বর্তমানকালে আমরা নানা দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যে উপলব্ধি করছি। এই সম্বন্ধ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে নানা গ্লানির সৃষ্টি হয়েছে, ছাত্রশাসন-সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর আকার ধারণ করছে, এ কথা সকলেই একবাক্যে বলছেন। রাধাকৃষ্ণণ ও মুডালিয়ার -কমিশনের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অতএব আশ্রম-শিক্ষার এই প্রধান একটি আদর্শের সুগভীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

প্রাচীন ভারতের আদর্শে গুরুশিষ্যের এই নিরবচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের একটি বিশেষ দিক ছিল উভয়ের সমবেত জ্ঞান-সাধনা ও সত্যানুসন্ধান, পরমতত্ত্বের উপলব্ধি-কল্পে সমবেত তপস্যা। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই একাত্মতা সুন্দর ও মহৎ রূপ পেয়েছে উপনিষদের প্রার্থনায়: "ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ"। রবীন্দ্রাথ বহুস্থানে এই বিশেষ দিকটির উল্লেখ করেছেন। গুরুর জীবনে জ্ঞান-তপস্যার অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত, তাই তা শিষ্যের চিত্তে ও জীবনেও সেই অগ্নিশিখাকে জ্বালাতে সক্ষম। গুরুদের সাধনা ছিল: "to see the world in God and to realise their own life in him." তাঁদের সাহচর্যে শিষ্যেরাও "grew up in an intimate vision of eternal life", "in an atmosphere of living aspiration" —*My School*। এই মহোন্নত পরিবেশই সত্যকার জ্ঞানসাধনার প্রকৃত প্রেরণা ও পথ, এবং আশ্রমের পবিত্র স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে এই সাধনা যতখানি সহজ ও নিবিড় হতে পারে সাধারণ বিদ্যায়তনের বিশ্লিষ্ট পরিবেশে তা ততখানি সম্ভব হতে পারে না, এ কথা বোঝা কঠিন নয়। বস্তুতঃ, যে সকল বিদ্যায়তনে, তা সে আমাদের দেশেই হোক বা অন্য দেশেই হোক, জ্ঞানের সাধনা প্রবল ও বেগবান, সেখানে গুরুশিষ্যের এই সমবেত জ্ঞানানুশীলনের রূপটি সুস্পষ্ট, আশ্রমের বাহ্যিক রূপটি না থাকলেও, তার এই বিশেষ আদর্শটি সেখানে সজীব ও বাস্তব হয়ে উঠেছে বলতে হবে। আমাদের দেশেও আধুনিককালে আচার্য জগদীশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মনীষী রমণ প্রভৃতি বিজ্ঞানসাধকদের জীবনেও এই আদর্শের জীবন্ত রূপ ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুক্ষেত্রে নানাকারণে সেই আদর্শের শোচনীয় বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে বলে অনেকেই আক্ষেপ করে থাকেন। অতএব সেই আদর্শ আজ আমাদের নতুনভাবে স্মরণীয়।

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রম-শিক্ষার আর-একটি প্রধান দিকের উল্লেখ করেছেন— 'আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা'। স্কুলের চারদেয়ালের খাঁচায় বদ্ধ না থেকে আশ্রমজীবনের সহজ স্বাধীন উন্মুক্ত ক্ষেত্রে জীবনের অসংখ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অফুরন্ত অবকাশ থাকে। চিত্তকে তা নিরন্তর সজীব ও ঔৎসুক্যময় করে রাখে। এই ঔৎসুক্যই জ্ঞানের উৎস, জীবনগঠনের পাথেয়। মনীষী বার্টরাণ্ড রাসেল তাই 'curiosity'কে শিক্ষার চারিটি প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, "আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের অব্যবহিত সম্পর্কলাভে উৎসুক হয়ে থাকবে—সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।" —'আশ্রমের শিক্ষা'। এই তত্ত্বেরই অনেকটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মুডালিয়র কমিশনের এই উক্তিতে: "the intelligent and wide awake teacher has numerous opportunities to kindle new interest, to expand and

strengthen existing ones and to satisfy their innate desire to touch life at many points." বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষকদের মধ্যে এবং অনেকটা সেইকারণে ছাত্রদের মধ্যেও, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের অভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে বলেছেন। সাম্প্রতিককালে এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়েছে, এ কথা আমাদের অবিদিত নয়। সেই কারণে প্রাচীন আশ্রম-শিক্ষার এই মূল্যবান্ তত্ত্বটিকে আমাদের শিক্ষায় যথার্থভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন ঘটেছে।

আশ্রম-শিক্ষার আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন: "সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ।"—'আশ্রমের শিক্ষা'। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জী. এইচ. টম্‌সনের একটি মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক কিল্‌প্যাট্রিকের একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন যে যদিও সাধারণের ধারণা এই যে বিদ্যাশিক্ষা হয় বিদ্যালয়ে এবং চরিত্রশিক্ষা হয় গৃহে ও অভ্যস্ত সামাজিক পরিবেশে, এবং প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় একথা যথার্থও ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানকালের জীবনধারার পরিবর্তন অনুসারে চরিত্রশিক্ষণের অনেকখানি দায়িত্বও স্কুলের ওপর এসে পড়েছে। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় পরিবারের ও সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর গণ্ডীতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই দৈনন্দিন জীবনে একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য ছিল, পারিবারিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমবেত জীবনযাত্রায় প্রত্যেকেরই একটি সুস্পষ্ট দান ছিল, এবং প্রত্যেকেই তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে আপন আপন দায়িত্বও সার্থকতাকে অনুভব করতে পারত। অধ্যাপক টম্‌সন বলেন, "Such a life taught self-help combined with co-operation, brought its own rewards, and punishments if it was not lived properly, and could be learned by simple participation on the part of the young, for whom it was never necessary to make artificial tasks, for an abundance, easily understood by them, and seen by them to be necessary and within their powers, arose in the daily communal life." —*A Modern Philosophy of Education*, George Allen and Unwin 1947, pp. 47-48। বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিকতায় ও জটিলতায় জীবনযাত্রার সেই সব সহযোগিতামূলক ব্যক্তিগত বহু কাজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে এবং বিরাট কারখানার অদৃশ্যগর্ভে অলক্ষ্যে সম্পাদিত হচ্ছে; সেই কারণে সামাজিক জীবনে সহযোগিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ক্ষেত্রও বিরল হয়ে গেছে। অতএব এখন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে 'সহযোগিতার সুসভ্য নীতিকে সচেতন করে তোলা।' প্রাচীন ভারতের আশ্রমজীবনে এই শিক্ষা নানাভাবে সুসম্পন্ন হত, রবীন্দ্রনাথ এই কথা সুন্দরভাবে বলেছেন। আশ্রমজীবনে জটিল যান্ত্রিকতার স্থান নেই, তার জীবনযাত্রার ছাঁদটি সরল ও অনেকটা আদিম, তাই সেখানে সকলের সহযোগিতা অপরিহার্য। আশ্রম একটি বৃহৎ পরিবার, তাই পারিবারিক জীবনযাত্রার মুখ্য উপাদান, পরস্পরের সম্বন্ধে সহানুভূতি ও সহযোগিতা, এই জীবনের অবকাশে প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে।

এই সহযোগিতামূলক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আর-একটি মূল্যবান দিক আছে, তা হচ্ছে উদ্যোগশিক্ষা ও বাস্তবশিক্ষা। প্রাচীন তপোবনে 'গোরু-চরানো, গো-দোহন, সমিধ-কুশ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা' প্রভৃতি দিনকৃত্যের মাধ্যমে এই শিক্ষার অব্যাহত অবসর ছিল। বর্তমানযুগের আশ্রম-

জীবনে ঠিক এই কৃত্যগুলির ক্ষেত্র না থাকলেও ঐ জাতীয় অনেক কর্মের অনিবার্য অবসর ঘটতে পারে। পশুচর্যা, কৃষিকার্য, উদ্যান-রচনা, আবাস-সম্মার্জনা, উৎসবানুষ্ঠান, পল্লীসেবা, আশ্রমবাসী গুরু ও সহপাঠীদের সেবা-শুশ্রূষা, অতিথি-সৎকার ইত্যাদি বহুবিধ কাজের দ্বারা ব্যবহারিক ও বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা ও কুশলতা এবং সামগ্রিকভাবে আত্মকর্তৃত্বচর্চার প্রচুর অবকাশ সেখানে আছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমজীবনের 'সতত উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা'কে অন্তরের সঙ্গে কামনা করেছিলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষায় বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থায় এই আদর্শকেই বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনা সূত্রে মুডালিয়র কমিশনের প্রতিবেদনেও এই 'co-operative work, willingly undertaken and efficiently completed'-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এবং বিদ্যালয়ের জীবনে এই শিক্ষার ক্ষেত্রকে সুপ্রসারিত করে দেবার জন্যে আবেদন করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, আশ্রমের জীবন সরল, অনাড়ম্বর, বিলাস-ব্যসন-বর্জিত, আসবাব-উপকরণ-বিহীন। শান্তিনিকেতন আশ্রম -স্থাপনার অনেক পূর্বে থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই সরলতার আদর্শের গুণগান করে এসেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নানা বিষময় ফলের আলোচনা করে ভারতের এই সনাতন আদর্শকে তিনি বহু দিক থেকে বিচার করে বহুবার জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের ও শিক্ষাদর্শনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে একে ধরে নেওয়া যেতে পারে। উপকরণবহুল বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ ও সতর্কতার বাণী কেবল আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাস্কিন, টলস্টয় প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারায় উচ্চারিত হয়ে আসছে। এমনকি ঘোর জীবনবাদী রাসেল সাহেবেরও শান্ত সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শের স্বপক্ষে নানা উক্তি আছে: যথা—"A happy life must be to a great extent a quiet life, for it is only in an atmosphere of quiet that true joy can live." —*Conquest of Happiness*; অথবা—"With these changes there would come a quieter manner of life—less fever and hustle, fewer material changes, more leisure for meditation, less cleverness and more wisdom."—*Prospects of Industrial Civilization.* কিন্তু এই সরলতার আদর্শকে অনেকে আধুনিক কালের উপযোগী বলে মনে করেন না। সর্দার পাণিক্কর তাঁর ১৯৫৫ সালের বিশ্বভারতীর অভিভাষণে এই সরলতার আদর্শের প্রতিবাদ করে বলেছেন, "The doctrine of the simple life which is presumed to encourage high thinking is but the worship of poverty." তাই তিনি 'poverty as a national ideal' সমর্থন করতে চান নি। কিন্তু অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন দারিদ্র্যের পূজা করেন নি, বরং তার প্রতিবাদই করেছেন। তিনি বলেছেন, "একথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে।"—'শিক্ষার মিলন'। *My School* প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন, "There are men who think that by the simplicity of living, introduced in my school, I preach the idealization of poverty which prevailed in the mediæval age."—*Personality*, p. 121. এবং সেই প্রসঙ্গেই

তিনি বলেছেন যে দারিদ্র্য-পূজার উদ্দেশ্যে নয়, উপকরণ-বিরলতার ও সরলতার অন্তর্নিহিত যে গভীর শিক্ষার তাৎপর্য আছে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই আদর্শের অনুরাগী। অনাবশ্যক উপকরণ মানুষের প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পঙ্গু ও অপরিণত করে রাখে, জীবনের মূল রসাস্বাদে বাধা আনে, 'বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীনশক্তির মাঝখানে··· অনেকগুলো বেড়া' তুলে দেয়। তাই আত্মকর্তৃত্বচর্চা ও পূর্ণতার সাধনার জন্যে চাই উপকরণহীন সরলতার পবিত্র স্বাধীন পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সরলতার আদর্শ ভারতবর্ষের একটি সনাতন আদর্শ। কিন্তু সর্দার পাণিক্কর বলেছেন, "At no time in India was this preached as an ideal.··· The idea that the Hindu religion supports the doctrine of simple living seems to me to be wholly untrue." প্রাচীন ভারতে জীবনের সর্বতোমুখী পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধির সাধনা ছিল এ কথা অবশ্য সুবিদিত। কিন্তু সরলতার আদর্শের মধ্যে সংযম ও ত্যাগের যে-অভিব্যক্তি আছে, সকল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যেও প্রাচীন ভারত তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন: "সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জা বোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে··· ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব"—'তপোবন'। যে-সভ্যতার আদর্শে জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্ম, সাধারণ গৃহস্থ থেকে শ্রেষ্ঠ নরপতি পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তি এক অখণ্ড ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত, এবং সকলের জীবনের শেষ পরিণতি বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, যে-সমাজে সংযম ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত—সে-সভ্যতার সে-সমাজের লক্ষ্য কোন্ দিকে তা বোঝা কঠিন নয়। অতএব আশ্রমজীবনের যে সরলতার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রচার করে এসেছেন তার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। নেহরু, আজাদ, রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দ বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে নানা ভাষণে বিশেষ করে এই আদর্শের জয়গান করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আশ্রম-সুলভ সরলতার এই আদর্শ স্বাধীন ভারতের শিক্ষার আদর্শরূপে দেশের সম্মুখে এখনো জাগ্রত আছে।

পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথের মতে আশ্রম-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ও সর্বোৎকৃষ্ট অমৃতফল, গভীর ও নিবিড় অধ্যাত্মচেতনা। আশ্রমের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে 'জগতের অন্তরতম রহস্যলোক আবিষ্কারের', বিশ্বসৃষ্টির মূল প্রস্রবণ 'একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের' সহজ অনুভবের অব্যাহত অবকাশ আছে। নিখিলচরাচরের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও একাত্মতার উপলব্ধিই ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সাধনা, এবং সে-সাধনা আশ্রমের পবিত্র সুন্দর প্রাণময় পরিবেশেই স্বাভাবিক ও সুন্দর। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যে তপোবন তপস্যা ও ত্যাগের প্রতীক। বর্তমানকালেও এই তপস্যা ও ত্যাগের যথার্থ রূপ আশ্রমজীবনের বিলাস-বাহুল্যবর্জিত সরলতার মধ্যেই ফুটে উঠতে পারে। অপর দিকে, প্রাচীন ভারতের আদর্শে 'তপোবন শান্তরসাস্পদ'। এই শান্ত রসে সকল রসের পূর্ণতা। এই পূর্ণতার উপলব্ধি ও সাধনার ক্ষেত্র আশ্রমজীবনে প্রশস্ত। তাই আশ্রমের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলরূপেই এই আধ্যাত্মিক চেতনা ও সাধনাকে পাওয়া যাবে।

বস্তুতঃ, বাহ্যিকভাবে নীতিশিক্ষা বা ধর্মশিক্ষা দেওয়ার সব প্রয়াসই নিষ্ফল হতে বাধ্য। যথার্থ ধর্মবোধ আশ্রমের স্বাভাবিক উন্নত আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। বিশ্বভুবনের মূলগত এই একাত্মতার অনুভূতির সাহায্যেই যথার্থ বিশ্বজাগতিকতার শিক্ষালাভ ঘটে। পৃথিবীর সকল মনুষ্য, সকল জাতিকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা এক জানাই যথেষ্ট নয়, বোধের দ্বারাও জানা প্রয়োজন। আশ্রমেই এই বোধের সাধনার প্রকৃত ক্ষেত্র। আশ্রম-শিক্ষার অঙ্গীভূত এই আধ্যাত্মিকতার সুরকে অনেকে আধুনিক কালের উপযোগী বলে মনে করেন না। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, দুই-মহাযুদ্ধ-বিপর্যস্ত পাশ্চাত্য জগৎ নানাভাবে ভারতের মুখাপেক্ষী হয়েছে শান্তি ও মৈত্রীর বাণীর জন্যে। এই শান্তি ও মৈত্রীর বাণী আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ বাণী। অধ্যাত্ম-শিক্ষার বিপক্ষেও যে-মত প্রকাশ করা হয়েছে আধুনিক শিক্ষাজগতের চিন্তাধারায় তার সম্পূর্ণ সায় মেলে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা যে জ্ঞানসর্বস্ব এবং অধ্যাত্মশিক্ষার অভাবে যে তার মধ্যে গভীর ফাঁক রয়ে গেছে, এ কথা অনেকদিন থেকেই অনেক সূত্রে বলা হয়ে আসছে। ১৯১৭ সালে স্যাড্‌লার কমিশনের প্রতিবেদনে আক্ষেপ করা হয়েছিল, "The mass of new knowledge which now claims a place in schemes of education has not yet found a synthesis. It has not yet been unified intellectually. Still less has it been co-ordinated with spiritual belief." সার রিচার্ড লিভিংস্টন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ আক্ষেপ করে ১৯৪৭ সালে বলেছেন যে পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তার কোনো অবকাশ সে-শিক্ষায় নেই।—*Some thoughts on University Education.* Prof. Brubacher-ও বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের শিক্ষানায়কগণ অনুভব করেন যে মাত্র চরিত্র-শিক্ষার দ্বারা বর্তমান যুগের সংকটের প্রতিরোধ সম্ভব হবে না ; "they thought that moral and character education could not fully succeed so long as the public school neglected religious or spiritual values". তাই তাঁর মতে, "the reversion to an emphasis on religious education was a more significant event than might appear on the surface." —*A History of the Problems of Education.* আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তায় এবং বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণণ-শিক্ষা-প্রতিবেদনে ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যে আবেদন যে সুস্পষ্ট. এ কথা সকলেই জানেন। অতএব আশ্রম-শিক্ষার আদর্শে অধ্যাত্মশিক্ষার যে মূল অংশ আছে তাকে একালের অনুপযোগী ও অপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করলে ঠিক বলা হবে না।

৪

আশ্রম-শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শের সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন ও আপত্তি উঠতে পারে বা উঠেছে স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখন সামগ্রিকভাবে দু-একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন।

একটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং করেছেন: "এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যা শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে।"—'ধর্মশিক্ষা'। আলোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে যথার্থ সামাজিক পরিবেশ ও তার মাধ্যমে

সামাজিক শিক্ষা যে শহরেই সুলভ তা ঠিক নয়। বরঞ্চ বিশাল নগরীর জনময় নির্জনতায় সত্যকার সামাজিক জীবন দুর্লভ; সেখানে সকলেই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন; সামাজিক জীবনের সুসংবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত রূপ সেখানে অস্পষ্ট। অন্যদিকে, আশ্রমজীবনে "একশো দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জনবাস বলা চলে না।" —'ধর্মশিক্ষা'। সেখানে সকলেই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত, এবং সমবেত দায়িত্ব-নীতির দ্বারা বদ্ধ। এই রকম স্থানেই সত্যকার সামাজিক চেতনা ও সামাজিক শিক্ষা সম্ভব।

আশ্রমের অতিমাত্রায় পবিত্র পরিবেশে সাধারণ সংসারের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের তরঙ্গাঘাত প্রবেশ করতে পারে না; অতএব এদিক থেকেও আশ্রমের শিক্ষা অসম্পূর্ণ— এই অভিযোগের উত্তরেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আশ্রমের এই বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক। কারণ, এতগুলি লোককে নিয়ে যে মনুষ্যসমাজ সেখানে সকলেই দেবতা নন, মানবচরিত্রের প্রকৃতিগত নানা বিকৃতির লীলা সেখানেও দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের উন্নত বায়ুতেও 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' হবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব বাস্তব আশ্রমে 'লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে'। এমনকি আশ্রমের পরিমিত ও পবিত্র অবকাশে মন্দের আবির্ভাবগুলি সহরের অপেক্ষা তীব্রতররূপেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে: তা হলে আশ্রমের স্বকীয়তা কী রইল, সাধারণ মনুষ্য-সমাজের তুলনায় তার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর স্থূলভাবে দেওয়া যাবে না, সে-কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে আশ্রমের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা খুঁজতে হবে তার স্থূলদেহে নয়, সূক্ষ্ম জায়গাটিতে। সেখানে তার একটি নিজস্ব আদর্শ বিরাজ করছে, সে-আদর্শের নিরন্তর লক্ষ্য সাধনার দিকে, ভূমার দিকে, পূর্ণ জীবনের দিকে। নানা ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যেও এই আদর্শেই আশ্রমের যথার্থ পরিচয় ও সত্য নিহিত।

পরিশেষে, এত আলোচনা সত্ত্বেও হয়তো আধুনিক মন আশ্রমের নামেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে পারে, জীবন-বিমুখ কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ পলায়নধর্মী কোনো সেকেলে আদর্শের কল্পনায় বিরূপ ভাব আশ্রয় করতে পারে। বলা বাহুল্য আশ্রম কথাটির সম্বন্ধেই আমাদের একটা সংস্কার জন্মে গেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে, এই 'স্পুটনিক্-যুগে', আশ্রমের চিন্তা করাটা নিতান্তই অতীতপূজা বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতের আশ্রম-শিক্ষার আদর্শের মধ্যে এমন-সব সর্বজনীন সর্বকালীন উপাদান আছে যা শুধু আধুনিক কালের উপযোগীই নয়, বিশেষভাবে প্রয়োজন। আবাসিক শিক্ষা, ব্রহ্মচর্যপালন, গুরুশিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, প্রকৃতির পরিবেশ, সরল জীবনযাত্রা, সদাজাগ্রত ঔৎসুক্যের অনুশীলন, সহযোগনীতি, সমবেত জ্ঞানসাধনা, এবং অধ্যাত্ম-চেতনা ও বিশ্ববোধ— আশ্রম-শিক্ষার এই সব মূল আদর্শগুলির কোন্‌টি বর্তমান যুগের শিক্ষায় নিষ্প্রয়োজন বা অচল? উপরের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্যই এই যে, বর্তমানকালের জীবনযাত্রায় ও শিক্ষাসংগঠনে এর প্রত্যেকটিরই বিশিষ্ট স্থান ও মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব, মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে, তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।" —'ধর্মশিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন:

"বর্তমানকালে এখনি দেশে এই রকম তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে।" —'তপোবন'। ঠিক শান্তিনিকেতনের মতো বিদ্যাশ্রম জাতীয় পরিমাপে সারা ভারতবর্ষে বহুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু পূর্ণশিক্ষার আদর্শ হিসাবে এই ধরণের বিদ্যালয় স্থানে স্থানে থাকা প্রয়োজন। সুশিক্ষার অপরিহার্য আদর্শগুলি সেখানে সুষ্ঠুভাবে অনুশীলিত হবে এবং সমগ্র শিক্ষাজগতকে আদর্শের আলোক প্রদর্শন করবে। ডিউইর 'ল্যাবরেটরী স্কুলে'র মতো এই স্বল্পসংখ্যক বিদ্যাশ্রমগুলিও আদর্শ শিক্ষানীতির জীবন্ত প্রয়োগশালা হিসাবে গণ্য হবে এবং দেশের ও বিদেশের অন্যান্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রেরণা জোগাবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির অনেকগুলিই আবাসিক; তাদের পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় আশ্রমসুলভ সৌন্দর্য, সরলতা ও শান্তি বিরাজমান; সেখানেও শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক স্নেহপ্রীতিবিজড়িত ও অন্তরঙ্গ; তাদের অনেকগুলিতে আন্তর্জাতিক আদর্শ সক্রিয়; স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা ও সহযোগনীতি তাদের জীবনযাত্রাকে আনন্দময় ও সার্থক করে তোলে। প্রগতিশীল শিক্ষাজগতে আজও এই বিদ্যালয়গুলিকে অনেকাংশে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা হয়। অতএব আশ্রমশিক্ষার এই মূলগত আদর্শগুলি এখনও বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন্ত আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ সেগুলিকে বর্তমান যুগের অনুপযোগী জ্ঞানে অবজ্ঞা করাটা সত্যের অপলাপ হবে; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাসাধনার একটি প্রধান অঙ্গকেও অমর্যাদা দেখানো হবে। দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাবিধান এবং শিক্ষাচিন্তা সমৃদ্ধি ও সার্থকতার দিক থেকে তা অকল্যাণকর।

‘অর্ঘ্যাভিহরণ’

গত সংখ্যায় আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম ও ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কবিসংবর্ধনার বিবরণ প্রকাশ করেছি।

বর্তমান সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসবে অর্ঘ্যাভিহরণ” সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করা হল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিবৃন্দ “শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাধিপতি পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি” -উৎসব উদ্‌যাপিত করেন। এই উৎসবের দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানপত্রটির প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হল।

‘রাজা’-অভিনয়

১৩১৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ‘রাজা’ প্রকাশিত হয়। “প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে ৫ চৈত্র ১৩১৭।”[১] এই অভিনয় সম্বন্ধে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ‘চিঠিপত্র’ তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত আছে, তার কিয়দংশ এই—

> বৌমা, এই কয় দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে এসেছিলেন— তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আট জন ও পুরুষ নয়-দশ জন এসেছিলেন।· ·পর্শু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল— তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল।· ·আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন[২] সেজেছিল রাণী— বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল— অন্তত তার চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল— তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি।· ·

শান্তিনিকেতনে রাজার পরবর্তী অভিনয় হয় রবীন্দ্রনাথের “শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে” উক্ত জন্মতিথি-উৎসবের পূর্বদিন— ২৪ বৈশাখ ১৩১৮।

এবারকার অভিনয়ে রাণীর (সুদর্শনা) ভূমিকাভিনয় করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানসূচীর প্রতিলিপি ও তৎসহ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত করা হল।

১ রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ২৬১

২ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
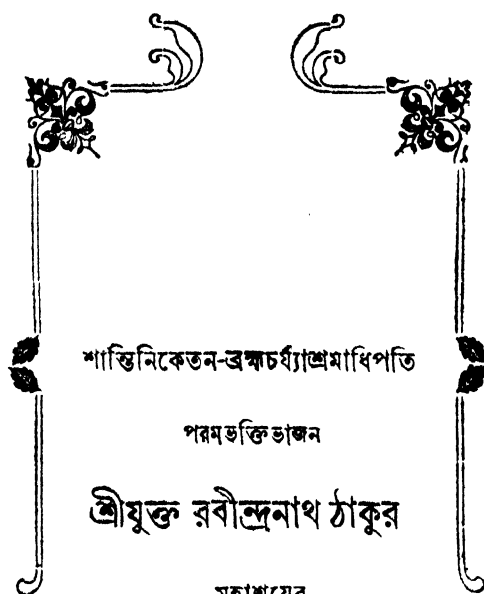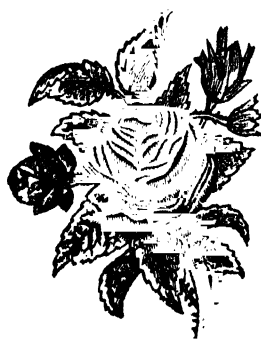
শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাধিপতি

পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের

পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসবে

অর্ঘ্যাভিহরণ

Printed by S. C. Chosh, at the LAKSHMI PRINTINC WORKS,
64-1 & 64-2, Sukea's Street, CALCUTTA.

মঙ্গলগীতি

शं नो वातः पवतां मातरिश्वा, शं नः तपतु सूर्यः।
अहानि शं भवन्तु नः, शं रात्रिः प्रतिधीयताम् ॥
शमुषा नो व्युच्छतु, शमादित्य उदेतु नः।
शिवा नः शन्तमा भव सुमृडीका सरस्वति ॥
(তৈ. আ. ৩. ৪২. ১—২।)

গগনসঞ্চারী পবন আমাদের কল্যাণকর হইয়া প্রবাহিত হউক! সূর্য্য আমাদের কল্যাণকর হইয়া তাপ প্রদান করুক! দিবসসমূহ আমাদের কল্যাণকর হউক! রাত্রিসমূহ আমাদের কল্যাণপ্রদ হইয়া প্রতিষ্ঠাপিত হউক! উষা আমাদের কল্যাণদায়িনী হইয়া প্রভাতা হউক! সূর্য্য আমাদের কল্যাণকর হইয়া উদিত হউক! এবং হে সরস্বতী, আপনি আমাদের শিবদায়িনী, কল্যাণদায়িনী ও সুখদায়িনী হউন!

আবাহন

नमस्तेऽस्तु। (বা. স. ৩.৬৩)।
कविः सीद नि बर्हिषि। (ঋ. স. ৮.৭৫.৩)।
कविं सम्राजमतिथिं जनानाम् (ঋ.স.৬.৩.১),
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे,
प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे,
निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। (বা.স.২৩.১৯)।
तव व्रते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त
(ঋ.স. ১.৩১.১);
पश्चात् पुरस्तादधरादुदक्तात् कविः काव्येन
परिपाहि राजन्। (ঋ. স. ১০.৮৭.২১)।
महान् कविर्निवचनानि शंसन्,
(ঋ.স.৯.৯৭.২),
स जीव शरदः शतम्। (শত.ব্রা.১৪.৯.৪.২৬)।

আপনাকে নমস্কার!

হে কবি, আপনি কুশাসনে উপবেশন করুন!

আপনি সম্রাট্-কবি, আপনি জনসমূহের অতিথি—সৎকারের যোগ্য পাত্র,

'আপনি জনগণের নায়ক, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনি প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয়, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনি সমস্ত নিধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনার ব্রত অনুসরণ করিয়া অনেক বিজ্ঞ কবি উৎপন্ন হইয়াছেন;

হে শোভমান কবি, আপনি সম্মুখ-পশ্চাৎ ও উচ্চ-নীচ সর্ব্বত্রই কাব্যদ্বারা (লোককে) রক্ষা করুন!

হে মহাকবি, আপনি আপনার সুভাষিতসমূহ উচ্চারণ করিয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকুন!

অর্ঘ্যাভিহরণ

एतच्चन्दनमत्र शीलमिव ते चन्द्रोज्ज्वलं शीतलं,
दीपोऽयं प्रतिभाप्रभाव इव ते कान्तस्थिरं दीप्यते,
धूपोऽयं तव कीर्त्तिसञ्चय इवामोदैर्दिशि व्यश्नुते,
माल्यं निर्मलकोमलं तव मनस्तुल्यं तवेदं
स्थितम् ॥
एतच्चामरयुग्मकं सुविशदं काव्यं त्वदीयं यथा,
पुष्पश्रेणिरियं गुणावलिरिव ते पश्यज्जनाकर्षिणी।
अर्घ्यं तावदिदं कृतं तव कृते दूर्वाङ्कुराद्यन्वितं
प्रीत्या नः प्रतिगृह्यतां सकृपया, स्वस्त्यस्तु ते
शाश्वतम् ॥

এই চন্দ্রোজ্জ্বল চন্দন আপনার শীলের ন্যায় শীতল; আপনার প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ সুন্দর ও স্থিরভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে; এই ধূপ আপনার যশোরাশির ন্যায় সৌরভে দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত করিতেছে; এবং আপনার মনের ন্যায় কোমল ও নির্ম্মল এই মাল্যখানি এখানে অবস্থিত রহিয়াছে। আবার এই চামরযুগল আপনার কাব্যের ন্যায় সুবিশদ, এবং এই কুসুমশ্রেণী আপনার গুণাবলীর ন্যায় দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতেছে। দূর্ব্বাঙ্কুরপ্রভৃতি দ্বারা আমরা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রীতি ও করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন! আপনার শাশ্বত স্বস্তি হউক প্রার্থনা করি!

শান্তি.

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः
शान्तिः शान्तिभिः।
ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमयामोऽहं
यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं
तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः ॥
অথ. স. ১৯.৯.১৪।

পৃথিবী শান্তিময় হউক, অন্তরিক্ষ শান্তিময় হউক, দ্যুলোক শান্তিময় হউক, জল শান্তিময় হউক, ওষধিসমূহ শান্তিময় হউক, বিশ্বদেবগণ আমার সম্বন্ধে সমস্ত শান্তির দ্বারা শান্তিময় হউন!

এখানে যাহা কিছু ভয়ানক রহিয়াছে, যাহা কিছু ক্রূর রহিয়াছে, যাহা কিছু পাপ রহিয়াছে, আমরা তাহা সেই শান্তিসমূহের দ্বারা সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করিতেছি; তাহা শান্ত হউক, তাহা শিব হউক! সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর,
২৩শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

ভক্তিপ্রণত
আশ্রমবাসিবৃন্দ।

ওঁ
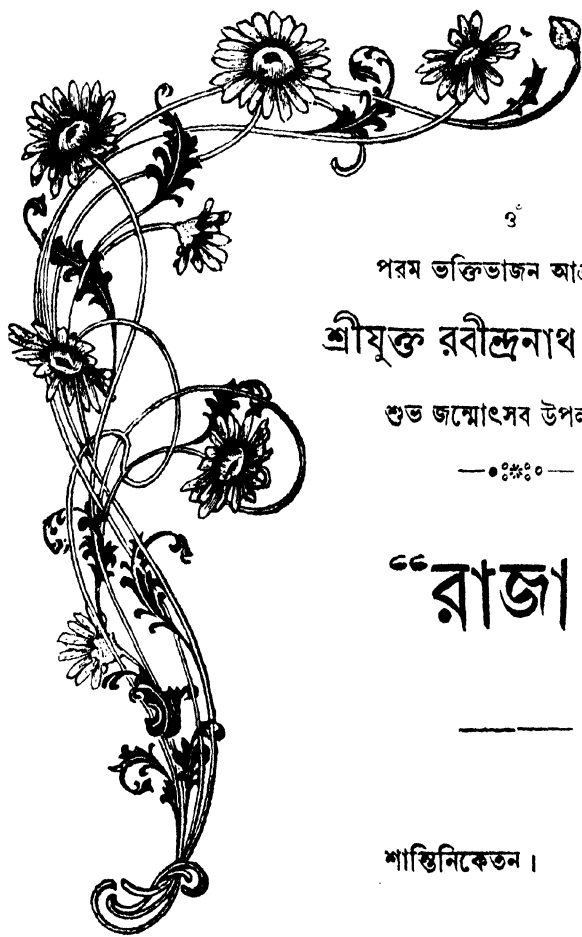
পরম ভক্তিভাজন আশ্রমগুরু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে—

—•:*:•—

"রাজা।"

শান্তিনিকেতন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর—

২৪শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

কৃষ্ণ প্রেস ১৯৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ঠাকুরদা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনজন পথিক

জনার্দ্দন—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

ভবদত্ত—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

কৌণ্ডিল্য—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রহরী—শ্রীকালিদাস বসু

নাগরিক-দল :

প্রথম—শ্রীহীরালাল সেন

বিরূপাক্ষ—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

বিশ্ববসু—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

বালকগণ

শ্রীহৃষীকেশ মুস্তফী, শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরকুমার সেন, শ্রীঅমিয় চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমুরলীধর পাল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেন

পদাতিক—শ্রীকালিদাস বসু

মাধব—শ্রীহীরালাল সেন

কুম্ভ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভদ্রসেন—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রাজবেশী—শ্রীঅন্নদাচরণ বর্দ্ধন

পাগল—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঞ্চীরাজ—শ্রীজগদানন্দ রায়

কোশলরাজ—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাউল

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, শ্রীহীরালাল সেন, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

কান্যকুব্জরাজ—শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্ত্রী—শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়

মালীদ্বয়

শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীবিলাস রায়

দূত—শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়

বিদর্ভরাজ—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিঙ্গরাজ—শ্রীঅবনীনাথ রায়

পাঞ্চালরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

বিরাটরাজ—শ্রীসুধাকান্ত রায়

স্ত্রীগণ

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—সুদর্শনা

শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী—সুরঙ্গমা

শ্রীঅবনীনাথ রায়—রোহিণী

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ২৪শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল.

ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ

বিনয় ঘোষ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর গৃহপ্রবেশ উৎসবের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর 'অনেক অনেক ভাগ্যবান' সাহেব-বিবিদের নিমন্ত্রণ করে এনে 'চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য' ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কলকাতা শহরের বাঙালী ভাগ্যবানেরাও উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদের সংখ্যা পাথুরিয়াঘাটা শোভাবাজার বাগবাজার হাতীবাগান কুমোরটুলি বৌবাজার অঞ্চলে তখন খুব কম ছিল না। বড় বড় দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দী ব্যবসায়ী, নিমকমহল ও হাটবাজারের ইজারাদার ও রাজামহারাজা খেতাবধারীদের সমাগম হয়েছিল উৎসবে। দ্বারকানাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী রামমোহন রায়েরও তখন (১৮২৩ সনে) কলকাতায় থাকার কথা, যদিও 'ব্রাহ্ম সমাজ' তখনও স্থাপিত হয়নি এবং 'ইউনিটেরিয়ান সভা' নিয়ে তিনি ব্যস্ত। উৎসবে রামমোহনও আসতে পারেন, তবে তিনি এসেছিলেন কি না সে-খবর তখনকার কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। একদিকে সাহেব-বিবিদের, আর-একদিকে অভিজাত বাঙালীদের ট্রাউজার-জ্যাকেট-টুপি এবং চোগা-চাপকান-শিরস্ত্রাণাদি সাজসজ্জার বাহারে উৎসব-সভা যে কী বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল তাও আজ মানসনেত্রে দেখা ছাড়া উপায় নেই, কারণ কোনো শিল্পী তৈলচিত্রে তা রূপায়িত করেননি, এবং আলোকচিত্রেও তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। স্বচ্ছন্দে কল্পনা করা যেতে পারে যে সেদিন চিৎপুর-অঞ্চল ল্যাণ্ডো-ফিটন-ব্রউহাম-পাল্কী গাড়ি ও ঘোড়ার ভিড়ে দুর্গম হয়ে উঠেছিল এবং সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও, বিচিত্র বেশধারী কোচওয়ান সহিস খিদ্‌মৎগার মশাল্‌চিদের সমাবেশেই জোড়াসাঁকো সরগরম হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটা সাধারণ নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব।

উৎসবের দিন ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩০ সাল, ইংরেজী ১৮২৩ সনের ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। উৎসবের সময় সন্ধ্যার পরে। আলোকসজ্জা ও আতসবাজীর জন্য সন্ধ্যার পরই প্রশস্ত সময়। সাহেবী, বাঙালী ইত্যাদি খানার 'চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্যের' বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। শুধু এইটুকু জানা যায় যে ভোজনান্তে উত্তম গান, ইংরেজী বাদ্য ও নৃত্য হয়েছিল। তারপর ভাঁড়েরা সং সেজে উপস্থিত সাহেবলোক ও বাবুদের প্রচুর আমোদ বিতরণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন গো-বেশ ধারণ করে ঘাস চর্বণ করাতে আমন্ত্রিতদের আহ্লাদের আর সীমা ছিল না।[১]

জোড়াসাঁকোর নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করার আগে দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষরা কলকাতার আরও অনেক গৃহে প্রবেশ ও বাস করেছিলেন। কেবল চিৎপুরে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে নয়,

---

১ সম্পূর্ণ সংবাদটি এই: "নূতনগৃহ সঞ্চার।— মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।"— সমাচার দর্পণ, ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

তার বাইরে বর্তমান ধর্মতলা এসপ্লানেড ও ময়দান অঞ্চলে, যখন ময়দানের নতুন কেল্লা জুড়ে গঙ্গার তীর ধরে ছিল অধুনালুপ্ত গোবিন্দপুর গ্রাম। জব চার্ণক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন গঙ্গার পূর্বতীরে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। তার আগেই অবশ্য বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা আরও উত্তরে বড়বাজারের কাছে সুতাবস্ত্রের হাট বসিয়েছিলেন, যার জন্য অঞ্চলটার নামই 'সুতানুটি' হয়েছিল। পশ্চিমতীরে পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত বেতোড়ের হাট, পূর্বতীরে শেঠ-বসাকদের সুতানুটি হাট, কাজেই চার্ণকের পক্ষে কুঠির জন্য পূর্বতীর বেছে নেওয়া ভুল হয়নি। গোবিন্দপুর গ্রাম তারও আগে থেকে ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না। মনে হয় পূর্বতীরে সুতানুটি হাট আর চার্ণকের কুঠি স্থাপিত হবার পর থেকে ভাগ্যান্বেষী বাঙালিরা কিঞ্চিৎ অর্থের ধান্ধায় পাশাপাশি গ্রাম থেকে এসে গঙ্গাতীরেই বাসা বেঁধেছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি বসতির সমাবেশে সেখানে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের গ্রামের বসতি সাধারণত কোন দেবতা ও দেবালয় কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হয়, তাই গ্রামদেবতা গোবিন্দের নামে গ্রামের নাম হয় গোবিন্দপুর।

কলকাতা মহানগর তখন এইরকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গ্রামের গর্ভে অঙ্কুরাবস্থায় ছিল। ইংরেজ বণিকের আগমনের ফলে তার ভবিষ্যৎ রূপ যাঁরা সেদিন মনশ্চক্ষুতে কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'ব্ল্যাক-জমিদার' বলে খ্যাত গোবিন্দরাম মিত্র, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পিতা দেওয়ান রামচন্দ্র দেব প্রভৃতি অন্যতম। জোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে তিনিও আরও অনেকের মত বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছিলেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে ইংরেজের বাণিজ্যকুঠির অদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। তারপর বংশানুক্রমে অনেক বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন, কত চাকরি আর কতরকমের বাণিজ্য যে করেছেন তার ঠিক নেই। তবেই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন তাঁদের প্রতি এবং সেই প্রসন্নতা-পরিবৃত পরিবেশে গোপীমোহন চন্দ্রকুমার প্রসন্নকুমার দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ হয়েছে ঠাকুরপরিবারে। পরবর্তীকালের বংশধরদের বিচিত্রগামী প্রতিভার জৌলুসে ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি স্বভাবতঃই ম্লান হয়ে গেছে এবং তাঁদের কীর্তিকলাপও মনে হয়েছে বিস্মরণীয়। কিন্তু তবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পিতৃপুরুষদের প্রত্যহ স্মরণ করতেন এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে :[২]

পুরুষোত্তমাদ্বলরামঃ বলরামাদ্ধরিহরঃ
হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশঃ
মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ
জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমণেরামলোচনঃ
রামলোচনাদ্দারকানাথঃ,
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

পুরুষোত্তম থেকে বলরাম, বলরাম থেকে হরিহর, হরিহর থেকে রামানন্দ, রামানন্দ থেকে মহেশ, মহেশ থেকে পঞ্চানন, পঞ্চানন থেকে জয়রাম, জয়রাম থেকে নীলমণি, নীলমণি থেকে রামলোচন, রামলোচন থেকে

২ ঈশানচন্দ্র বসু: শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৯০২ সন; ১২৮ পৃষ্ঠা।

জোড়াসাঁকো - ঠাকুরবাড়ি

পাথুরিয়াঘাটা - ঠাকুরবাড়ি
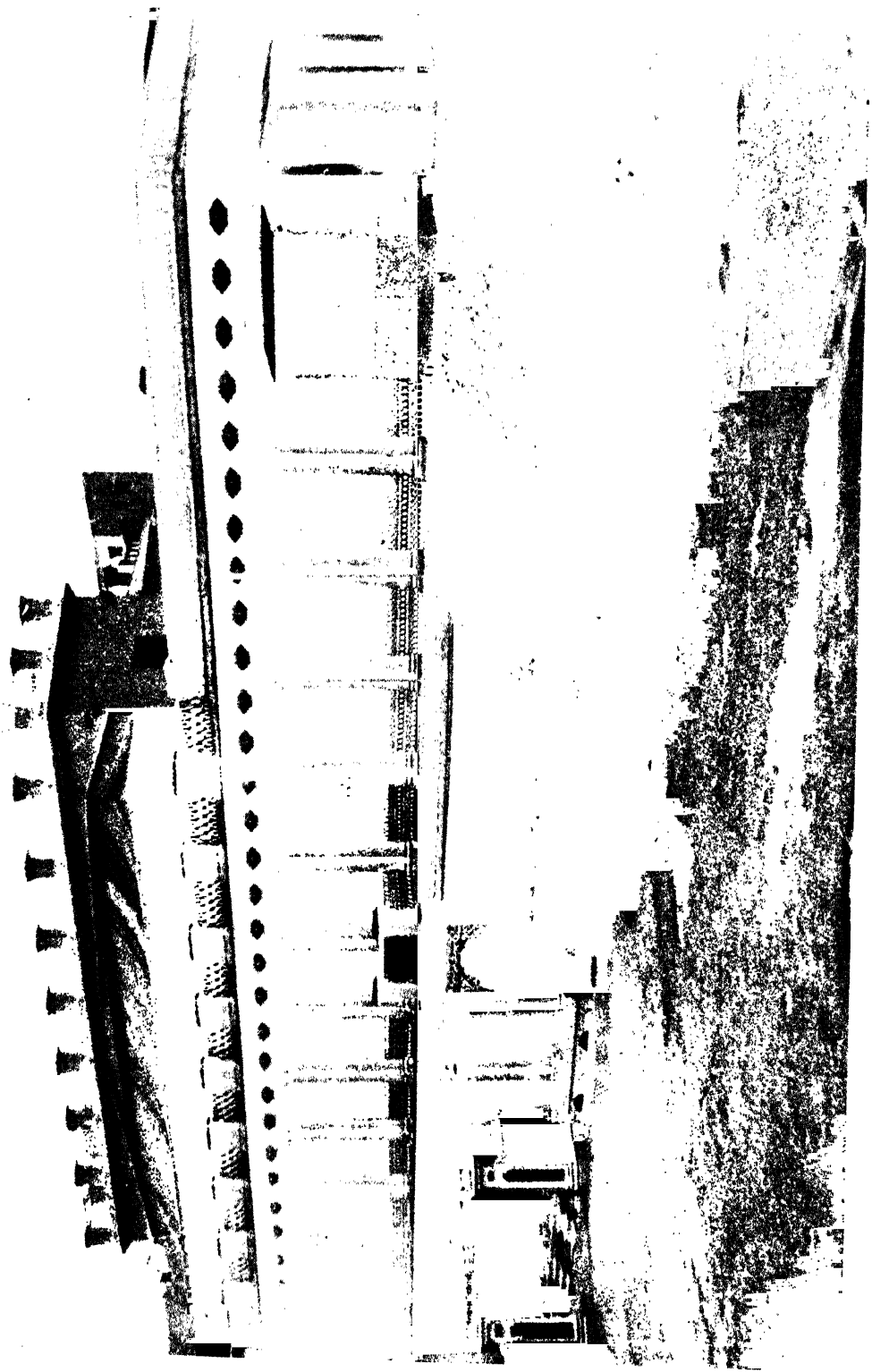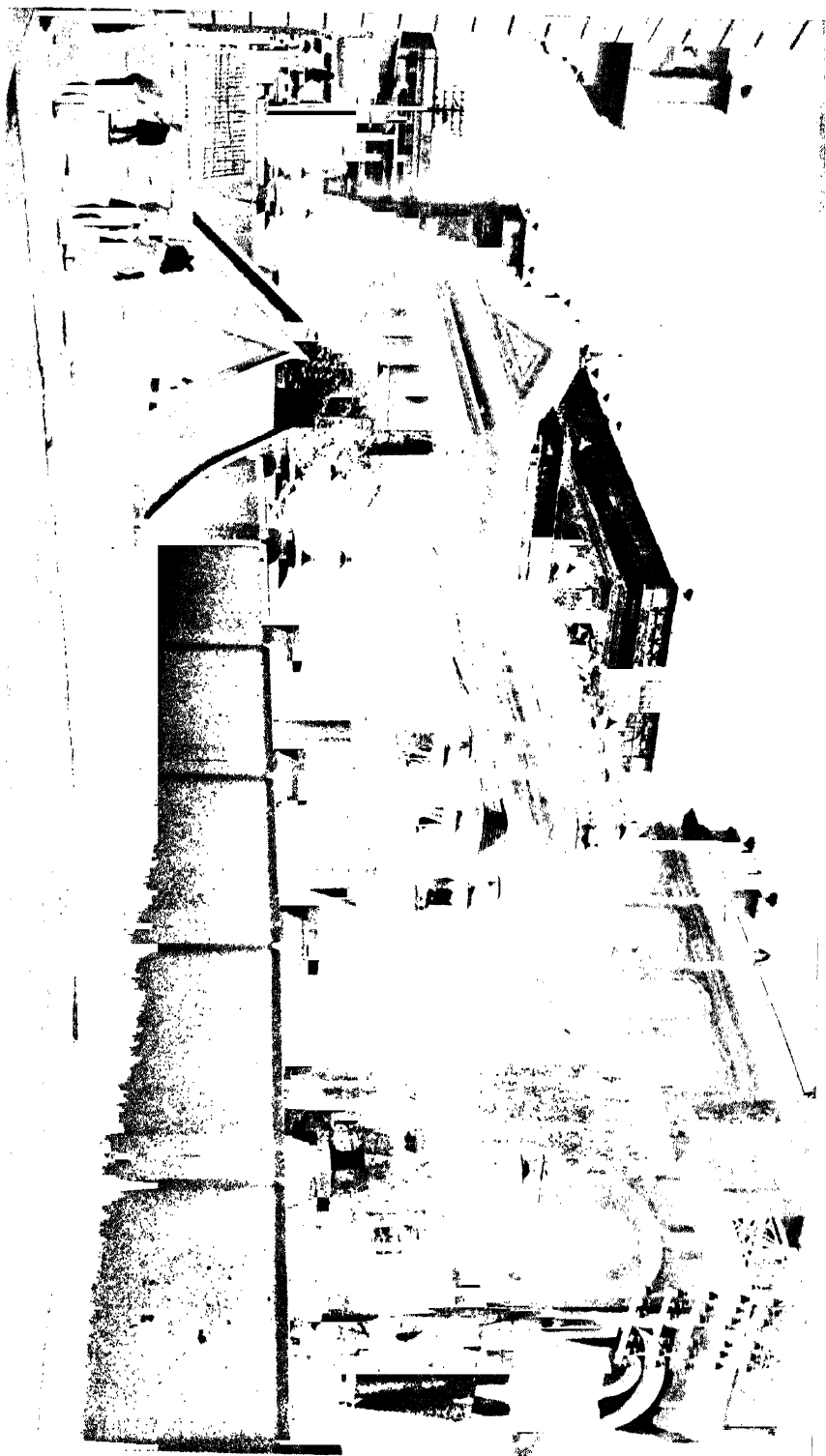
দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রামলোচন জ্যেষ্ঠ এবং দ্বারকানাথকে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন বলে দ্বারকানাথের জনক রামমণির পরিবর্তে রামলোচনের নাম করা হয়েছে। দ্বারকানাথের জন্ম হয় আঠারো শতকের শেষ দশকে (১৭৯৪)। তার ঊর্ধ্বে চারপুরুষ পর্যন্ত ঠাকুরবংশের কেউ কলকাতায় আসতে পারেন, কারণ কলকাতা শহরের তখন পত্তন হয়েছে, লোকজনের বসতি বেড়েছে এবং রোজগারের পথও অনেক খুলে গেছে। দ্বারকানাথ থেকে চারপুরুষেরও আগে ঠাকুরদের কারও কলকাতায় আসা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে প্রায় জব চার্ণকেরও আগে আসতে হয় এবং তা আসবার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে না। পঞ্চানন-জয়রাম-নীলমণি-রামলোচন, এই হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঊর্ধ্বতন চারপুরুষ। কাজেই আঠারো শতকের গোড়ার দিকে পঞ্চানন ঠাকুরকে আমরা দেখতে পাই গঙ্গাতীরের গোবিন্দপুর গ্রামে। কিন্তু এই ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুরু করার আগে আরও কয়েক পুরুষ ঊর্ধ্বে পুরুষোত্তম-বলরাম পর্যন্ত কিছু বলা দরকার। মহর্ষি যখন পুরুষোত্তম পর্যন্ত স্মরণ করতেন তখন ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

পুরুষোত্তম হলেন দ্বারকানাথ থেকে ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে দ্বাদশ পুরুষ। সাধারণত আমরা সাতপুরুষের কথা উল্লেখ করে থাকি এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে সেই সাতপুরুষের মধ্যে প্রথম পঞ্চানন ঠাকুর একেবারে কলকাতা শহরে পদার্পণ করেছেন দেখা যায়। পঞ্চাননের আরও পাঁচপুরুষ আগে পুরুষোত্তম। একপুরুষে পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে গণনা করলে পুরুষোত্তমকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিয়ে যেতে হয়। তখন বাংলাদেশে হুসেন শাহী সুলতানদের পর শূরবংশীয় আফগান সুলতানদের রাজত্বকাল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবে সমাজ ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে তখন বাংলাদেশে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। পুরুষোত্তম মধ্যযুগের এই নবজাগরণকালের লোক।

বাংলাদেশে ঠাকুরবংশ 'পিরালী' ব্রাহ্মণবংশ বলে কথিত। পিরালীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কাহিনীর অন্ত নেই। কুলাচার্য নীলকান্ত ভট্টের কারিকা থেকে জানা যায় যে সুলতানের একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্মচারী নবদ্বীপের কাছে পিরলিয়া বা পিরল্যা গ্রামে বাস করতেন। এক সুন্দরী মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। পিরল্যা গ্রামে বাস করার জন্য অথবা মুসলমানপ্রীতির জন্য লোকে তাঁকে 'পিরালী' বলে ডাকত। এই কাহিনী যদি সত্যও হয় তাহলেও ঠাকুরবংশের সঙ্গে এই প্রেমিক পিরালীর কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, কারণ এই পিরালী যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর বংশ ব্রাহ্মণবংশ বলে কথিত হতে পারে না।

অন্য কুলাচার্যদের কারিকায় দেখা যায় যে হুসেন শাহের আমলে জনৈক হিন্দু দেওয়ান যবনের খানা ঘ্রাণের জন্য, ঘ্রাণে অর্ধভোজন 'থিয়োরি' অনুযায়ী মুসলমানী খানা আস্বাদনের অপরাধে সমাজচ্যুত হন :

যবনের খানার ঘ্রাণ গেল তোমার নাকে।
কেমনে রইল হিন্দুয়ানী কহত আমাকে॥
বাদশার কথায় জব্দ দেওয়ান লোকে পাইল ভান।
সমাজেতে রাষ্ট্র হইল খানা খায় দেওয়ান॥

পীরের থৈইকা পাইল দোষ নাম হইল পিরারী।
সংশ্রবেতে দোষী পিঠাভোগের কুশারি ॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে,

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥

পিরালী ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম আরও অনেক কারিকা, ছড়া ও কবিতা উদ্‌ধৃত করা যায়। কিন্তু এইসব কাহিনী থেকে যে ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার সঙ্গে কারিকার বা কিংবদন্তীর কাহিনী-কল্পনার সম্পর্ক খুব সুদূর। আসল সত্য এই হওয়া সম্ভব যে, সুলতানী আমলে বাংলার মুসলমান শাসকরা তুর্কীয়ানা পদ্ধতিতে যখন দেবদেউল ধ্বংস ও জাতিধর্ম নাশ করছিলেন তখন নবদ্বীপ ও তার পরিপার্শ্বের একাধিক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের উপর দিয়েও সেই ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই বিপযস্ত গ্রামের ব্রাহ্মণরা আবার হিন্দুসমাজের কাছেও কঠোর দণ্ড পেয়েছিলেন। তখন সমাজে কেবল বৈষ্ণবধর্মের উদারতার বাণীই যে ঘোষিত হচ্ছিল তা নয়, রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত ভট্টাচার্যেরাও রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে, নব্য-স্মৃতি হাতে নিয়ে তর্জনী তুলে অনাচার-অত্যাচারপীড়িত হিন্দুসমাজকে শাসাচ্ছিলেন। সামাজিক অবস্থা যা হয়েছিল তাতে স্মার্ত পণ্ডিতদের শাসানিকেও দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা ভেবেছিলেন যে মুসলমানদের অত্যাচারে অনর্গল ধারায় অনাচার প্রবেশ করছে সমাজে এবং সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। কাজেই স্মৃতি-ধর্মশাস্ত্রের বজ্রবন্ধনে তাঁরা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছিলেন। বজ্র আঁটুনির ফলে গেরো ফস্কা হয়েছিল কিনা তা সামাজিক ইতিহাসের বিচার্য বিষয়, আপাতত ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। লক্ষণীয় হল, এই সময় কুলাচার্যরাও সোৎসাহে কুলগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সকলেরই কুলপঞ্জী তৈরি হয়। মুসলমানদের অত্যাচারে অথবা মুসলমান শাসকদের দরবারে রাজকার্য উপলক্ষে ঘনিষ্ঠতার জন্য যেসব ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যদের বিচারে জাতিচ্যুত হয়েছিলেন, মনে হয় তাঁদের মধ্যে 'পিরালী ব্রাহ্মণরা' অন্যতম। হিন্দুসমাজের বিচারে যবন-সাহচর্যের ফলে গ্রামকে-গ্রাম দণ্ডিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণরা এইভাবেও দণ্ডিত হতে পারেন।

কলকাতার ঠাকুরপরিবার, কুলাচার্যদের মতে, যশোহর-খুলনার পিঠাভোগের কুশারী-বংশজাত। কুশারীরা তাঁদের বর্ধমান জেলার আদিনিবাস কুশগ্রাম থেকে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ও যশোহর-খুলনা জেলার ঘাটভোগ, দামুড়হুদা, পিঠাভোগ প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথ কুশারী আদিপিরালী শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করে যশোহর জেলায় বসবাস করেন। জগন্নাথের বংশধররা এইভাবে পিরালী ব্রাহ্মণদের থাকভুক্ত হন।[৩] জগন্নাথ কুশারীর কাল ষোড়শ শতকের প্রথম পর্ব, পুরুষোত্তমের কাল মধ্য পর্ব। উভয়েই মুসলমান রাজত্বের মধ্যাহ্নকালের লোক।

৩ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের 'পিরালী ব্রাহ্মণ' খণ্ড থেকে সংগৃহীত। এবিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসুর সমস্ত মতামত ও উক্তি এই বই থেকে গৃহীত হয়েছে।

পুরুষোত্তমের পুত্র বলরাম, পৌত্র হরিহর, প্রপৌত্র রামানন্দ। রামানন্দের পুত্র মহেশ্বর থেকে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উৎপত্তি। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন সর্বপ্রথম কলকাতায় আসেন এবং বংশলতা অনুসারে তাঁর আগমনকাল আঠারো শতকের প্রথম পর্ব অনুমান করতে বাধা নেই। ১৭০৭ সনে যখন সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয় তখন কলকাতা অঞ্চল জরিপ করে দেখা যায় যে 'বাজার-কলকাতা' অঞ্চলে মোট প্রায় ৫০০ বিঘার মধ্যে কমপক্ষে ৪০০ বিঘায় লোকজনের বসতি ও ঘরবাড়ী আছে, কিন্তু 'টাউন-কলকাতা' অঞ্চলে প্রায় ১৭০০ বিঘার মধ্যে মাত্র ২৫০ বিঘা, 'সুতানুটি' অঞ্চলে ১৭৭০ বিঘার মধ্যে মাত্র ১৩৪ বিঘায় এবং 'গোবিন্দপুর' অঞ্চলে ১২০০ বিঘার মধ্যে মাত্র ৫৭ বিঘায় লোকবসতি আছে, বাকি সব ধানক্ষেত, কলাবাগান, বাঁশবাগান, পুকুর ও জলাজঙ্গলে ভর্তি।[৪] তবু বাজার-কলকাতার (বর্তমান বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চল) বসতির ঘনত্ব দেখে বোঝা যায় যে আঠারো শতকের গোড়ার দিকেই শহরের আকর্ষণ বেশ বেড়েছিল, অন্তত আর্থিক আকর্ষণ তো নিশ্চয়ই। তা না হলে বাজার অঞ্চলে লোকের ভিড় হবে কেন? সুতানুটি (বর্তমান উত্তর-কলকাতা), টাউন-কলকাতা (বর্তমান মধ্য-কলকাতায় বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চল) ও গোবিন্দপুরে (বর্তমান ময়দানে কেল্লার কাছে) লোকবসতি আদৌ ঘন হয় নি। আগেই বলেছি, বাজার-কলকাতা অঞ্চলে বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা (মুর্শিদাবাদের জৈন ব্যাঙ্কার শেঠরা নন) আগে থেকে বাজার পত্তন করেছিলেন, সেই কারণে এই অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় লোকবসতি বেশ বেড়েছিল।[৫] এদেশের লোক, প্রধানত বিভিন্ন বণিক-সম্প্রদায়, ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই বাজার অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তা হলেও গোবিন্দপুর গ্রামের আকর্ষণও তখন কম ছিল না, কারণ গঙ্গাতীরে ইংরেজদের পুরাতন কুঠি ও কেল্লা গোবিন্দপুরের কাছেই অবস্থিত ছিল (বর্তমান কাস্টমস হাউস ও বড় ডাকঘরের কাছে)। কলকাতা শহরের মূলকেন্দ্র (nucleus) ছিল এই পুরাতন কুঠি-কেল্লা অঞ্চল, এবং এই কেন্দ্রটিকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করে গোবিন্দপুর থেকে সুতানুটি পর্যন্ত মৌচাকের মত লোকবসতি গড়ে উঠেছিল। ১৭০৫-৬ সনেই দেখা যায়, কোম্পানির কর্মচারীরা কলকাতার খবর জানিয়ে বিলেতে ডিরেক্টরদের লিখছেন—"The Towne buildings increased and the Streets regular"—এবং তার চেয়েও বড় সুসংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে "people flocking there to make the Neighbouring Jemindars envy them"—অর্থাৎ দলে দলে লোক শহরে আসছে এবং তাই দেখে আশেপাশের জমিদাররা বেশ ঈর্ষা প্রকাশ করছেন।[৬]

পঞ্চানন ঠাকুর যদি এই সময় কলকাতায় আরও অনেকের মত ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এসে থাকেন তা হলে যথাসময়েই এসেছিলেন বলতে হবে। বাজার-কলকাতায় যেমন প্রধানত বণিকজাতির বাস ছিল, তেমনি গোবিন্দপুরে মনে হয় প্রধানত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মধ্যবিত্তরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কুশারীবংশীয় ব্রাহ্মণ বলেও পঞ্চানন গোবিন্দপুরে বাস করা বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন। এ ছাড়া সাহেবদের কুঠি, কেল্লা, মালগুদাম ও জাহাজঘাট কাছে বলেও তাঁর গোবিন্দপুরে বাস করার ইচ্ছা হতে পারে। শোভাবাজারের মহারাজা

৪ C. R. Wilson: The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I.

৫ Benoy Ghose: "Some Old family-founders in 18th century Calcutta, The Setts of Sutanuti"—in *Bengal: Past and Present*, Vol. LXXIX, Part I, January-June 1960.

৬ Fort William General, dated 31 December 1706 (MS. Records).

নবকৃষ্ণের পিতা, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, এঁরা পঞ্চাননের সময়ে, কিছু আগে বা পরে, কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসেছিলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য যাঁরা তখন কলকাতায় আসতেন তাঁরা হয় কোম্পানির কলকাতার জমিদারীর কাজকর্ম, না হয় ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। কাপড়চোপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা তখনও কুলবৃত্তি হিসেবে প্রধানত বিভিন্ন বণিকজাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা তখন জায়গাজমির পত্তনি, বাজারঘাট ও নিমকমহলের ইজারাদারী, জাহাজের বিদেশী নাবিক ও লস্করদের জিনিসপত্তর সরবরাহ অথবা বেনিয়ানগিরি করতেন। পঞ্চানন এর মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসীদের মাল-সরবরাহের কাজটি বেছে নিয়েছিলেন শোনা যায়। এতে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার হত এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন ধরার জন্য ব্যবসায়ীদের যে আগ্রহ প্রকাশ পেত তাই থেকে নাকি পরে 'কাপ্তেন পাকড়াও' কথা শহরে চালু হয়েছে এবং শহরের বাবুরাও 'কাপ্তেন' নামে অভিহিত হয়েছেন। ইংরেজ ক্যাপ্টেন, খালাসী ও বণিক মহলে পঞ্চানন 'ঠাকুর' বলে পরিচিত হন। আমাদের দেশে সাধারণ লোক ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর মশাই' বলে সম্বোধন করে থাকেন। গোবিন্দপুরের সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে পঞ্চানন কুশারীর 'ঠাকুর মশাই' নামটি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং এই 'ঠাকুর' কথাটি ইংরেজদের মুখে 'Tagore' হয়ে যায়। এর মধ্যে কতটুকু কাহিনী আর কতটুকুই বা ইতিহাস তা বলা কঠিন। তবে পঞ্চাননের কালের দিক থেকে বিচার করলে কলকাতা শহরে তাঁর পেশা ও পদবীর রূপান্তর কোনটাই খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

'পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ জয়রামান্নীলমণিঃ'। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কলকাতায় ইংরেজদের জমিদারী কাছারীতে কাজ করতেন। কলকাতা কলেক্টরেটের দলিলপত্রে কোথাও জয়রামের নাম পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। কলকাতার জমিদারীতে তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি, ইংরেজের অধীনে 'ব্ল্যাক ডেপুটি' হিসেবে আসলে তিনিই জমিদারীর তত্বাবধান করতেন। তাঁর প্রতাপে কলকাতা-সূতানুটি-গোবিন্দপুরের লোক কাঁপত, 'গোবিন্দরামের ছড়ি' প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কাছারীতে এদেশের লোক নায়েব, গোমস্তা, আমিন, রাজস্ব-আদায়কারী প্রভৃতি নানা রকমের চাকরি পেতেন। জয়রাম গোবিন্দরামের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে হয় তাঁর পক্ষে কলকাতার জমিদারী কাছারীতে কোনো কাজে নিযুক্ত থাকা অসম্ভব নয়। পলাশীর যুদ্ধের বছরখানেক আগে ১৭৫৬ সনে (ফারেল সাহেব ১৭৬২ সন বলেছেন) জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে দুই স্ত্রী, তিন পুত্র—দর্পনারায়ণ নীলমণি ও গোবিন্দরাম—এবং পৌত্ররা জীবিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্লোকে কেবল 'জয়রামান্নীলমণিঃ' এবং 'নীলমর্ণেরামলোচনঃ' উল্লেখ করা হয়েছে, দর্পনারায়ণের নাম নেই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঠাকুরপরিবারে দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের শাখা নীলমণি থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি শাখাকে দর্পনারায়ণের শাখা, আর একটিকে নীলমণি ঠাকুরের শাখা বলা যায়। দেবেন্দ্রনাথ এই কারণে জয়রাম-নীলমণি-রামলোচন-দ্বারকানাথের নাম পিতৃপুরুষের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। দর্পনারায়ণের শাখাকে পাথুরিয়াঘাটার এবং নীলমণির শাখাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার বলা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর পুরাতন কেল্লা তুলে দিয়ে নূতন কেল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। তার জন্য গোবিন্দপুর গ্রাম দখল করে স্থানীয় লোকজনদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে শহরের অন্য অঞ্চলে

স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার ইংরেজ কর্তারা কোম্পানির ডিরেক্টরদের লেখেন: "আমরা গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে 'নেটিব' বাসিন্দাদের অন্যত্র তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ নূতন কেল্লা এই স্থানে তৈরি করা হবে ঠিক হয়েছে। ইটের পাকাবাড়ির মালিক যাঁরা তাঁদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলা হয়েছে। যাঁরা কাঁচা চালাঘরে থাকতেন তাঁদের অন্যত্র বসবাসের জমি দেওয়া হয়েছে এবং স্থানান্তরের খরচ বাবদ কিছু নগদ টাকাও দেওয়া হবে জানানো হয়েছে।"[৭] এই খবরটুকু ছাড়া গোবিন্দপুরের বাসিন্দারা কে কত জায়গাজমি ও নগদ টাকা পেয়েছিলেন, দলিলপত্র থেকে তা জানা যায় না। তবে ক্ষতিপূরণের জন্য উৎখাত বাসিন্দাদের যে অনেকদিন ধরে বোর্ডের কাছে লেখালেখি করতে হয়েছিল, সরকারী নথিপত্রের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়।[৮] জয়রাম ঠাকুর গোবিন্দপুরের ভদ্রাসন রেখেই গত হয়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু দর্পনারায়ণ ও নীলমণি তা ছেড়ে আসার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে কত ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোথাও তার উল্লেখ নেই। তাঁদের বসতবাড়ি পাকা ছিল কিনা, এবং থাকলেও কত বড় ছিল তা অনুমান করা সম্ভব নয়। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু পিরালী ব্রাহ্মণখণ্ডে ঠাকুরবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে জয়রাম মৃত্যুকালে ধনসায়েরের বাড়ি বাগান পুষ্করিণী বৈঠকখানা ব্যতীত নগদ টাকাও অনেক রেখে যান। কিন্তু এই উক্তির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ তিনি দেন নি। ধনসায়েরই বা কোথায়? ধর্মতলা? আঠারো শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ধর্মতলা অঞ্চলে 'ধনসায়ের' নামে কোনো জায়গা ছিল বলে জানা যায় না। ভদ্রাসনের নাম হতে পারে, 'সায়র' বা সরোবর-দীঘি হতে পারে, কিন্তু তারই বা প্রমাণ কি? ১৭৫৭ সনের শেষে গোবিন্দপুরের বসতি তুলে দেওয়া হয়, কারণ এই বিষয়ে কোম্পানির কাছে লেখা পূর্বোক্ত চিঠির তারিখ ১০ জানুয়ারি, ১৭৫৮। জয়রামের মৃত্যুর অল্পদিন পরের ঘটনা। কাজেই দর্পনারায়ণ ও নীলমণি যদি কোনো বসতবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়ে থাকেন তা হলে সেটা গোবিন্দপুরে হওয়াই সম্ভব। এই সময় শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র এবং আরও অনেক দর্পনারায়ণ-নীলমণির সমসাময়িক ব্যক্তি উত্তর-কলকাতায় সুতানুটি অঞ্চলে নূতন ভদ্রাসন নির্মাণ করে গোবিন্দপুর থেকে উঠে আসেন।

ঠাকুরদের মধ্যে দু'জন অবশ্য কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোম্পানির কাছ থেকে, কিন্তু সেটা মনে হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কলকাতায় ইংরেজদের যুদ্ধের ফলে (১৭৫৬) যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তারই পূরণস্বরূপ। যাঁরা এই ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত পিতা-পুত্র গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘু মিত্র (প্রায় ৪ লক্ষ টাকা পান), শোভারাম বসাক (প্রায় ৪ লক্ষ), রতু (রতন) সরকার (প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার), শুকদেব মল্লিক ও নয়ান মল্লিক (প্রত্যেকে

---

৭ Letter to Court, January 10, 1758, para 110—"We have been obliged to remove all the Natives out of Govindpore, where the new citadel will stand, the brick houses having been valued in the most equitable manner, and when reported to the Board, will be paid for; those who dwelt in thatched houses have had a consideration made them for the trouble and expense of removing, and have been allowed ground in other parts of the town and outskirts to settle in."

৮ Proceedings, 1760 onwards, also Rev. Long's Selections from Unpublished Records, 1748-1767.

প্রায় ৪০ হাজার), নীলমণি ও হরিকিষণ ঠাকুর (যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ১০ হাজার)।[৯] হরিকিষণ ঠাকুর নীলমণি ও দর্পনারায়ণের ভাই হতে পারেন। বংশলতায় সব নাম নেই ঠাকুরবংশের এমন অনেক নাম পুরাতন দলিলপত্রে পাওয়া যায়।

১৭৫৮-৫৯ সনে কোনো সময় দর্পনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর উত্তর কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করে বাস করতে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু কয়েকটি দলিল (বিক্রয়-কোব্‌লা, পাট্টা ইত্যাদি) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ১৭৬৪ সনে নীলমণি ঠাকুর সুতানুটি গ্রামে কলকাতা কালেক্টরীর জঙ্গজমি থেকে দু'বিঘে তের কাঠা জমি সালিয়ানা ৭৮/৪ গণ্ডা সিক্কামুদ্রা খাজনায় পাট্টা করে নেন। এর কয়েক মাস পরে তিনি ডিহি কলকাতার প্রান্তে জনৈক রামচন্দ্র কলুর কাছ থেকে ৫২৫৲ টাকায় ঘরবাড়িসহ সাড়ে দশকাঠা জমি নিজের নামে কেনেন। তারপর ১৭৬৯ সনে এই সব জমির সংলগ্ন আরও দু'বিঘে সাতকাঠা জমি বসতবাড়িসহ তিনি জনৈক জগমোহন সাহার কাছ থেকে ৯০০০৲ টাকায় কেনেন। এইসব জমি জুড়ে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরপরিবারের বাসস্থান গড়ে ওঠে।

এই সময় পাথুরিয়াঘাটায় দর্পনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুরের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও, সমাজে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে হয় না। ব্যবসাবাণিজ্য বা চাকরিবাকরি করে তাঁরা তখন পর্যন্ত হয়ত প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি। কারণ ১৭৬০ সন থেকে ১৭৭০-৭৫ সন পর্যন্ত দর্পনারায়ণ বা নীলমণির নাম কোনো সরকারী নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল পূর্বোক্ত ক্ষতিপূরণের তালিকায় (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮) হরিকিষণ 'Tagoor'-এর সঙ্গে 'নীলমণি' নামটি ছাড়া। অথচ ১৭৬০ সন থেকে দলিলপত্রে বিবিধ প্রসঙ্গে একাধিক ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, যেমন ভবানীচরণ ঠাকুর, বিশনারায়ণ ঠাকুর, দয়ারাম ঠাকুর, হরিকিষণ ঠাকুর, কেবলরাম ঠাকুর ইত্যাদি। চব্বিশ-পরগণার জমিদারী নিয়ে ইংরেজরা যখন টাউন-হলে নিলাম ডেকে তার ইজারা দেন তখন ভবানীচরণ ঠাকুর (বলরাম বিশ্বাসের সঙ্গে) পিচাকুলির জমিদারী ৩৩,৪০০৲ টাকায় ডাক দিয়ে কেনেন (৩১ জুলাই ১৭৬০)।[১০] গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্র কোন প্রতারণার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখনকার ইংরেজদের দণ্ডনীতির সঙ্গে আমাদের দেশীয় দণ্ডনীতির গুরুতর পার্থক্যের ফলে সমাজে রীতিমত বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি তার বড় দৃষ্টান্ত। রাধাচরণের ফাঁসির হুকুম হলে কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও অবাঙালী বাসিন্দারা দণ্ড মকুব করার জন্য আবেদন করেছিলেন (২৯ জানুয়ারি ১৭৬৬)। আবেদনপত্রের ৯৫ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে পূর্বের ভবানীচরণ ছাড়া বাকি ছ'জন ছিলেন ঠাকুরবংশের।[১১] এঁদের মধ্যে নীলমণি বা দর্পনারায়ণ কারও নাম না থাকাতে মনে হয় যে ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যেই এই দুই ভাই তখনও প্রধান হয়ে ওঠেন নি।

১৭৭৫-৭৬ সন থেকে বিভিন্ন নথিপত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে তখন তিনি যে খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নীলমণি ঠাকুর

৯ Consultations, September 18, 1758; Long: op. cit, p. 149.

১০ Proceedings, July 31, 1760; Long: op. cit, p. 205.

১১ Proceedings, January 29, 1766; Long: op cit, p. 430.

ব্যবসায়ী ছিলেন না, থাকলেও তাঁর ভাইয়ের মত প্রতিষ্ঠা পান নি। মনে হয় সরকারী জমিদারী বিভাগে অথবা কোন বাণিজ্যকুঠিতে তিনি বাঁধা মাইনের চাকরি করতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে নীলমণি সেরেস্তাদারের কাজ করতেন এবং উড়িষ্যায় থাকতেন। তা হতে পারে এইজন্য যে দর্পনারায়ণের সমসাময়িক দলিলে ব্যবসাবাণিজ্য অথবা বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে কোথাও নীলমণি ঠাকুরের নাম নেই। দর্পনারায়ণ কলকাতায় থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করতেন এবং নীলমণি বাইরে কোম্পানির জমিদারীতে চাকরি করতেন, একথা সত্য বলেই মনে হয়।

বৈদেশিক বিভাগের নথিপত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুর—"Who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time"—বলা হয়েছে।[১২] কিন্তু এইটুকু পরিচয় তাঁর যথেষ্ট নয়। কলকাতার 'রেভিনিউ কমিটি', 'রেভিনিউ বোর্ড' এবং সম্পত্তির 'লীজ-ডীডের' দলিলপত্র থেকে তাঁর বিষয় যা জানা যায় তাতে মনে হয় রামদুলাল দে-সরকার, মদন দত্ত প্রভৃতির মত তিনি সেকালে অসাধারণ কর্মী পুরুষ ছিলেন। কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে 'বেনিয়ান', কোথাও 'merchant of Calcutta', কোথাও বা নিমক ও বাজারের ইজারাদার ও জমিদারীর পত্তনিদার। জানবাজার অঞ্চলে দর্পনারায়ণ অনেক ভূ-সম্পত্তি কিনেছিলেন, সেখানে বেশ বড় বাজার বসিয়েছিলেন।[১৩] চব্বিশ-পরগণায় নিমকের এজেন্টদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।[১৪] নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্রকে একবার তিনি, বারাণসী ঘোষ ও রামশঙ্কর হালদার মিলে বকেয়া সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। সেই টাকা মহারাজা শিবচন্দ্র পরিশোধ করতে পারেননি বলে কমিটির কাছে তাঁরা আবেদন করেছিলেন যে তাঁর মাসহারা থেকে মাসিক কিস্তীতে যেন ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং কমিটি আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন।[১৫] চব্বিশ-পরগণার বড় বড় ইজারাদারদের জামিন হতেন দর্পনারায়ণ, আর্থিক জগতে তাঁর এত সুনাম ও প্রতিপত্তি ছিল।[১৬] এত বড় কর্মী পুরুষ যিনি ছিলেন তাঁকে শুধু হুইলার সাহেবের দেওয়ান ও পে-আফিসের কর্মচারী বলে পরিচয় দিলে কিছুই বলা হয় না। বিষয়-সম্পত্তিও কলকাতায় তিনি যথেষ্ট কিনেছিলেন। রাধাবাজার, তালতলা বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিল।[১৭] এ ছাড়া পরগণা উত্তর শ্রীপুরে (রাজশাহী জমিদারীর অধীন) বাৎসরিক ১৩,০০০৲ টাকা নীট আয়ের প্রায় ২৪৯ বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট জমিদারীও তিনি ৯১,৫০০৲ টাকায় কিনেছিলেন।[১৮]

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সাতপুত্রের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুরের বৈষয়িক বুদ্ধি পিতার মতই প্রখর ছিল। তখনকার দিনে কলকাতার বৈঠকখানা বাজার, তালতলা বাজার, ধর্মতলা বাজার, জানবাজার, মেছুয়াবাজার,

১২ Foreign Department Miscellaneous Records (MS), 1839, Vol. 131.

১৩ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, July 1781, Nos. 52, 74; September 1781, No. 16.

১৪ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, February 1776, p. 262; February 15, 1776, p. 510-11; June 21, 1776, p. 1490-2.

১৫ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, January 24, 1782, Nos. 3, 4, pp. 214-17.

১৬ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, December 1777, p. 246.

১৭ Leases and Deeds, Vols. II and III; No. 627, 26 and 27 August 1783; No. 709, 1784.

১৮ James W. Furrell: The Tagore Family—A Memoir, London, 1882, pp. 62-63.

সুতানুটি বাজার প্রভৃতি বাজার-হাট ইজারা নেওয়া, কোম্পানির অনুমতি নিয়ে (বিনা অনুমতিতেও) নূতন হাট-বাজার পত্তন করা, কলকাতা শহরের ধনবান লোকদের একটা বড় ব্যবসা ছিল। বাজার ইজারা নিয়ে অথবা পত্তন করে তাঁরা নানারকমের দোকান প্রতিষ্ঠার ও জিনিসপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা করে দিতেন, কোম্পানির কর্তাদের একটা নির্দিষ্ট টাকা দিতে হত, বাকি যা আয় হত তা তাঁরা নিজেরা ভোগ করতেন। গোবিন্দরাম মিত্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ থেকে রাধাকান্ত দেব, দর্পনারায়ণ ও গোপীমোহন ঠাকুর, মদন দত্ত, বারাণসী ঘোষ এবং আরও অনেকে কলকাতার বাজার থেকে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করেছেন। দর্পনারায়ণের জানবাজারের বাজারের কথা বলেছি, গোপীমোহন ঠাকুর নূতন চীনাবাজারের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় ৫ বিঘে ১৯ কাঠা ১২ ছটাক জমির উপর একদা (১৭৭৫ সনে) একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল, 'নিউ থিয়েটার' বলা হত। পরে জনৈক রোওয়ার্থ সাহেব সেখানে একটি নিলেমকুঠি স্থাপন করেন। 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে (১৮০৮ সন) দেখা যায় যে এই বিস্তৃত ভূসম্পত্তি গোপীমোহন ঠাকুর কিনে নিয়েছিলেন নূতন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য—"Known by the name of the New China Bazar, most of the shop-keepers of the Old China Bazar having agreed to remove their shops to the above mentioned buildings···on which very large investments and various other valuable articles have been purchased." ১৮০৮ সনের ২০ নভেম্বর এই নূতন চীনাবাজার খোলা হবে বলে পত্রিকায় 'নোটিশ' দেওয়া হয়েছিল এবং জানানো হয়েছিল যে সেখানে "Europe and other articles of every description will be found for sale."[১৯] গোপীমোহন এই চীনাবাজারের জন্য কতটা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেছিলেন এবং কতটাকা মুনাফা করতেন তার হিসেব না পাওয়া গেলেও কল্পনা করতে বাধা নেই।

নীলমণির কয় পুত্র ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন রামলোচন রামমণি ও রামবল্লভ নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল (নগেন্দ্রনাথ বসু ও ফারেল)। কারও মতে তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল—রামতনু, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ।[২০] কলকাতার বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে রামরতন ঠাকুরের নাম পুরাতন লীজ-ডীডের দলিলে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর অন্য কোন ভাইদের, অর্থাৎ নীলমণির অন্য কোন পুত্রদের কোন বৈষয়িক খবর কিছু পাওয়া যায় না।[২১] এতে মনে হয় যে বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য দর্পনারায়ণ নিজে ও তাঁর পুত্ররা অন্তত কলকাতা শহরে যতটা উদ্‌যোগী ছিলেন, নীলমণি বা তাঁর পুত্ররা তা ছিলেন না। নিমকের এজেন্সী, দেওয়ানী বা বেনিয়ানী, কলকাতার হাটবাজারের ইজারাদারী অথবা এই ধরনের কোন কাজকর্ম করে যদি তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেতেন তা হলে রেভিনিউ কমিটি বা রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রে কোথাও তাঁদের নামের উল্লেখ থাকত।

নীলমণি উড়িষ্যায় সেরেস্তাদারের চাকরি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে কলকাতায় যথেষ্ট ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন, একথা নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কলকাতায় থাকতেন না বলে তাঁর ভাই

১৯ Calcutta Gazette, 1st November 1808.

২০ Loke Nath Ghose: The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc., Part II, Calcutta, 1881--"The Tagore Family", pp. 160-223.

২১ Leases and Deeds, Vol. I, No. 144, 16 January 1781.
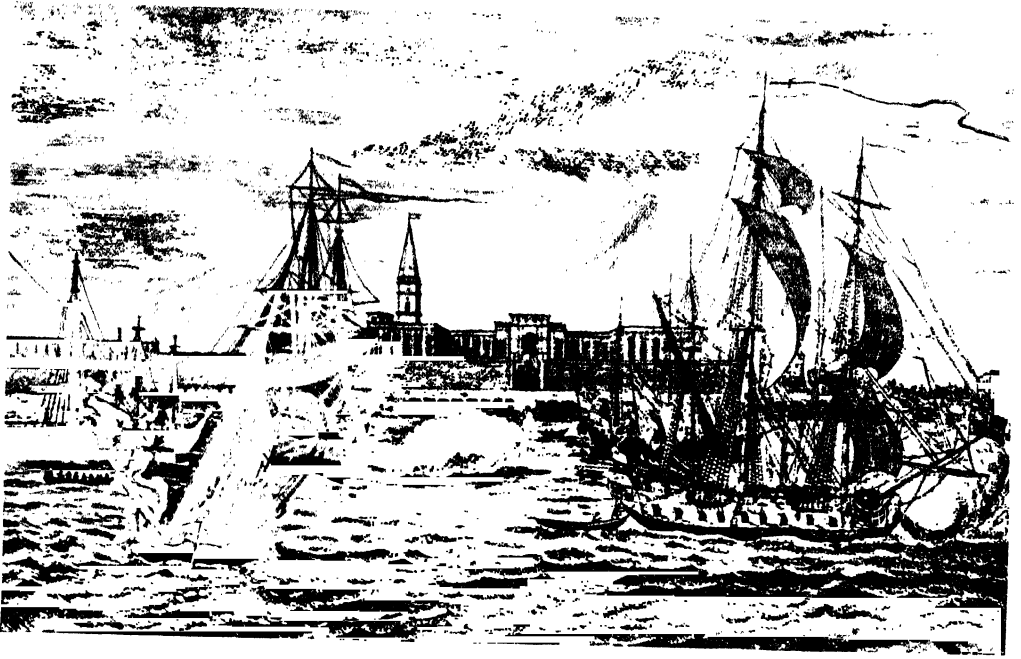
ফোর্ট উইলিয়াম । ১৭৩৬

গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির । ১৭৯২

এসপ্লানেড । ১৮৩৮
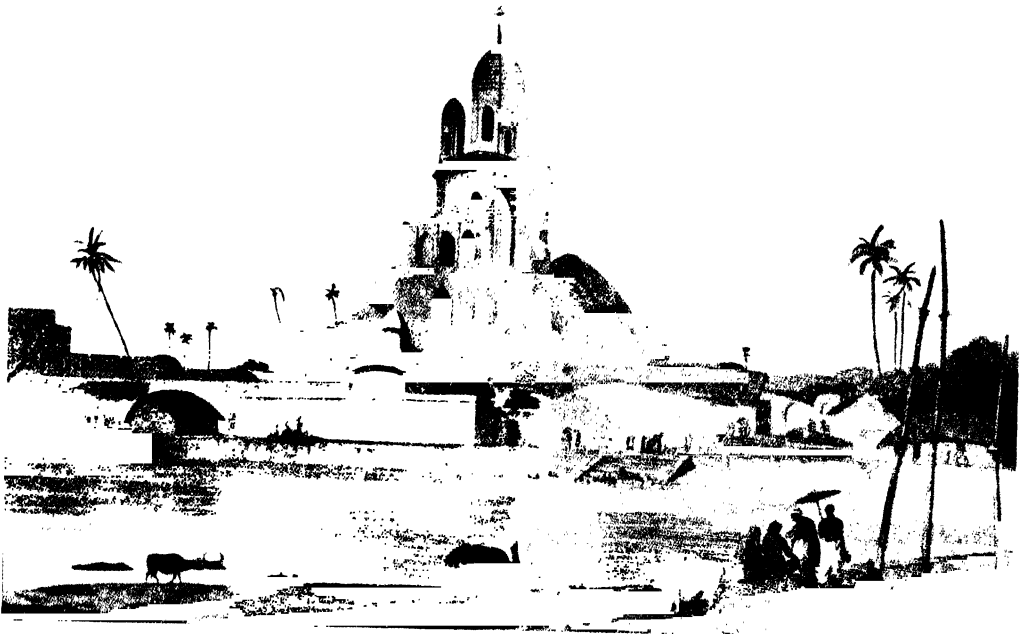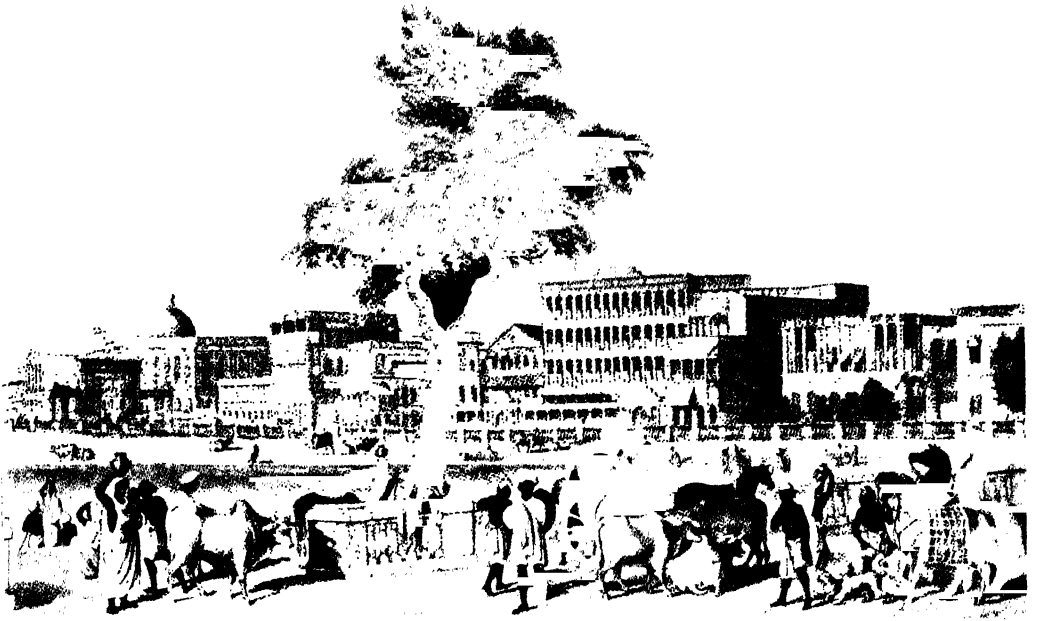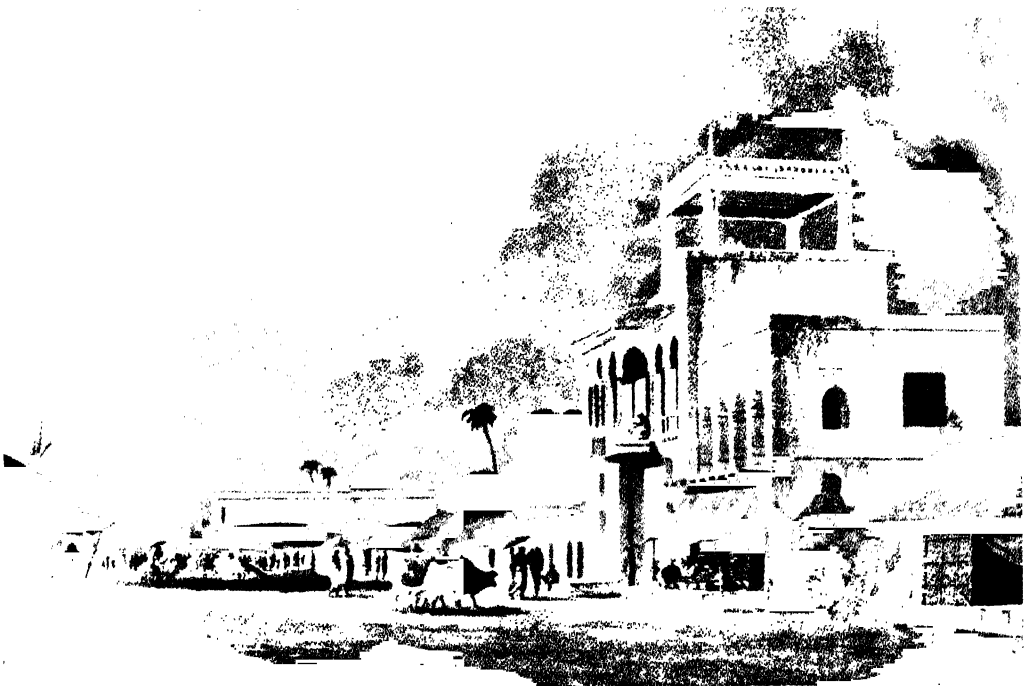
চিৎপুর রোডের একাংশ । ১৭৯২

দর্পনারায়ণকে পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে হত। উপার্জিত অর্থ নীলমণি তাঁর ভাইয়ের কাছে কিছু কিছু গচ্ছিত রাখতেন। দুই ভাই এইভাবে যখন নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করছিলেন তখন ঘটনাচক্রে তাঁরা এক পারিবারিক সংকটের সম্মুখীন হন। সংকট ঘনিয়ে ওঠে তাঁদের পরলোকগত ছোটভাই গোবিন্দরামের বিধবা পত্নী রামপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পৃথক হবার ইচ্ছা থেকে। সম্পত্তি বিভাগের জন্য তিনি সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করেন। তার ফলে একান্নবর্তী ঠাকুরপরিবার তিনটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়, দর্পনারায়ণ ও নীলমণিও ভিন্ন হতে বাধ্য হন। পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন দর্পনারায়ণ, আর নীলমণি নিজের অংশের বদলে নগদ একলক্ষ টাকা নিয়ে মিটমাট করে নেন। পৈতৃক বিগ্রহের মধ্যে দর্পনারায়ণ রাধাকান্তের সেবার ভার পান এবং নীলমণি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কলকাতার আদিবাসিন্দা শেঠ-বসাকদের বিস্তীর্ণ বাগান ছিল উত্তর-কলকাতায়। এই বাগানকেই 'জোড়াবাগান' বলা হত। নীলমণি ঠাকুর নূতন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শেঠবংশীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণের কাছ থেকে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাসের জমি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাস থেকে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনে নীলমণি-শাখার ঠাকুর পরিবারের বাসের সূত্রপাত হয়।[২২] জোড়াসাঁকো অঞ্চল তখন মেছুয়াবাজারের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু জোড়াসাঁকো নামটিও তার কম প্রাচীন নয়। গ্রাম্যজীবনকালেই এখানে কোন পুষ্করিণী বা নালার উপর যাতায়াতের জন্য একজোড়া সাঁকো ছিল বলে স্থানীয় লোকের কাছে জোড়াসাঁকো নামেই তা পরিচিত ছিল। এই কারণে এরকম পরিচয় গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক স্থানের আছে। উইলসনের বিবরণ থেকে মনে হয় যে শেঠদের যে পুরাতন বাগান ছিল এই অঞ্চলে তার নাম ছিল 'জোড়া বাড়ি বাগ'। অর্থাৎ একজোড়া বাড়িসহ বাগান ছিল এবং তার জন্যই অঞ্চলটির নাম হয়েছিল 'জোড়াবাগান'।[২৩] ১৭৪২ সনে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণরের কাছে সেনাবিভাগ থেকে একটি রিপোর্ট দাখিল করা হয় কলকাতা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য। তাতে কলকাতার নগর-এলাকার মধ্যে সাতটি অঞ্চলে কামান স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। তার মধ্যে শেঠদের জোড়াবাগানে ছয়-কামানের একটি ব্যাটারি স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কলকাতা শহরের কয়েকটি অতিপ্রাচীন মানচিত্র ও নক্সা আছে। তার মধ্যে একটি নক্সায় (*Plan of Calcutta*, by Forresti and Clifres, 1742) পঞ্চম ব্যাটারীর উল্লেখ আছে 'Batarie Zora Sako' বলে। উইলসন বলেছেন, "It is placed at what is now the junction of the Chitpur Road with Ratan Sircar Street, near Lala Babu's Bazar, below the Jora Sanko Police Station". এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ১৭৪২ সনে তো বটেই, তার আগেও স্থানটির 'জোড়াসাঁকো' নাম খুব অপরিচিত ছিল না কলকাতার লোকের কাছে। ১৭৮০ সনের পর থেকে কলকাতার প্রাচীন পাট্টা-দলিলেও 'Jurah Sankoo' নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (Deed No 1165, dated Ist February 1786)। নামটি নূতন হলে পাট্টা-দলিলে এইভাবে ব্যবহৃত হত না। 'জোড়াবাগান'

২২ নগেন্দ্রনাথ বসুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
২৩ Wilson: Early Annals etc., Vol. I, pp. 158-9.

নামে খ্যাত শেঠদের বাগান আঠারো শতকের আগে, এমন কি ইংরেজরা কলকাতায় কুঠিস্থাপনের আগে থেকেই যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার পরিষ্কার প্রমাণ আছে। ১৭০৭ সনে কৌন্সিলের সদস্যরা শেঠ-বাগানের খাজনা কমিয়ে দেন এই কারণে যে "they being possessed of the Ground which they made into Gardens before we had possession of the Towns".[২৪] কাজেই সপ্তদশ শতকের শেষদিকে শেঠ-বসাকরা যখন সুতানুটিতে সুতার হাট বসিয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন তার কিছু পর থেকে তাঁদের বাগানটিও গ'ড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো নাম কলকাতা শহরে পরিচিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। তা হলে 'জোড়াসাঁকো' নামটি পঞ্চানন ঠাকুরের আমলেই পরিচিত হবার কথা এবং তার আঞ্চলিক পরিচিতি হয়ত দর্পনারায়ণ-নীলমণি শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রতিষ্ঠার পর শহরময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু জোড়াসাঁকোয় নূতন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠার পরেও নীলমণি ঠাকুর ও তাঁর পুত্রদের আমলে এই শাখার ঠাকুরপরিবারের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যে কলকাতার সমাজে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বলা কঠিন। বৈদেশিক দফ্‌তরে বিবিধ বিষয়ের নথিপত্রের মধ্যে 'Principal Hindoo Inhabitants of Calcutta' নাম দিয়ে কতকগুলি পরিবারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১৮৩৯ সন)।[২৫] তার মধ্যে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পরিবার, রাজা সুখময় রায়ের পরিবার, মল্লিক পরিবার, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবার, দেওয়ান রামচন্দ্র রায়ের পরিবার, খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষালের পরিবার এবং আরও অনেক পরিবার ও ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঠাকুরপরিবার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা লক্ষণীয়, এখানে তা অবিকল উদ্‌ধৃত করছি:

> Thakoors. This is an extensive and very rich family—the principal branch of it is that derived from Durop Nerayun Thakoor who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time. He had seven sons. Ram Mohun Thakoor (deceased), Gopee Mohun Thakoor, who died in 1816 after having long been at the head of the family to the great increase of its wealth—Krishna Mohun Thakoor (insane), Peearee Mohun Thakoor (born dumb and now dead), Hurree Mohun Thakoor (living now in great respectability), Ladlee Mohun Thakoor Do and Mohunee Mohun Thakoor who died a year or two ago leaving an infant child. Gopee Mohun left six sons, whereof the eldest Soorj Koomar Thakoor died childless shortly after. Chundur Koomar, Kalee Koomar, Nund Koomar, Hurro Koomar and Prosunno Koomar Thakoors now represent this branch.

ঠাকুরবংশের এই বিবরণের মধ্যে নীলমণি ঠাকুরের পরিবারের কোন পরিচয় নেই। পরে "List of the rich Bengalee Gentlemen of Calcutta" বলে অঞ্চলভেদে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি তালিকাও

২৪ Consultations, 11 September 1707.

২৫ Foreign Department Miscellaneous Records, 1839, Vol. 131 (National Archives, New Delhi).

দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ললিতমোহন ঠাকুর (?), শ্যামলাল ঠাকুর ও কানাইলাল ঠাকুরের নাম ছাড়া আর কোন ঠাকুরের নাম নেই। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে :

Muchhoowa Bazar. Dowarakanath Thakoor, son of Rammunee Thakoor.

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পৌত্রদের নাম, গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিক ও জমিদার শিবচরণ সান্ন্যালের পুত্র মধুসূদন সান্ন্যালের নাম আছে। নীলমণি-শাখার ঠাকুরপরিবারকে জোড়াসাঁকোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই শাখার শুধু দ্বারকানাথের নাম ছাড়া আর কোন নাম নেই এবং দ্বারকানাথও মেছুয়াবাজার অঞ্চল-ভুক্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮২৩ সনে দ্বারকানাথের গৃহপ্রবেশ উৎসবের যে খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয় তাতেও 'জোড়াসাঁকো' অঞ্চলের নাম নেই।

জোড়াসাঁকো সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ হল এই যে নীলমণি-শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রসিদ্ধির সঙ্গে জোড়াসাঁকো যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। 'মেছুয়াবাজার' বা 'মেছোবাজার' নামের কোন ধ্বনিমাধুর্য নেই, শোভাবাজার শ্যামবাজার বাগবাজার রাধাবাজার বৌবাজার বড়বাজার জানবাজার প্রভৃতি কলকাতার আরও অনেক বাজার-পদবীযুক্ত আঞ্চলিক নামের একটা যে সাধারণশ্রী আছে, মেছুয়াবাজার তা থেকেও বঞ্চিত। স্থান-মাহাত্ম্যের কতখানি যে নাম-মাহাত্ম্যের সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসে সেটাও কম কৌতূহলের বিষয় নয়। মেছুয়াবাজার তার নিরাভরণ শ্রীহীন পরিচয়ের জন্য ঠাকুরপরিবারের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। মেছুয়া বাজারের দ্বারকানাথ জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ হয়েছেন, পুরাতন মেছুয়াবাজারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বহু-পুরাতন জোড়াসাঁকোর মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বারকানাথের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রবল টানে জোড়াসাঁকো নাম তার আঞ্চলিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের আমলে দেশ থেকে দেশান্তরে পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও ঠাকুরপরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরকে।

দ্বারকানাথের জন্মের বছর তিন-চার আগে, ১৭৯০-৯১ সনে, নীলমণি ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর পৌত্র ও বংশের অন্যতম কীর্তিমান পুরুষকে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন হন পরিবারের অভিভাবক। রামলোচনের পুত্রসন্তান ছিল না, তাই তিনি মধ্যম সহোদর রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঘটনাটি নিয়ে পরে একটি কিংবদন্তীও রচিত হয়। একদিন এক সন্ন্যাসী রামলোচনের গৃহে ভিক্ষা করতে আসেন। রামলোচনের স্ত্রী ভিক্ষা নিয়ে এলে শিশু দ্বারকানাথকে খেলা করতে দেখে তিনি তাঁকে বলেন, "মা—এই শিশুটি তোমার খুব সুলক্ষণযুক্ত; এ তোমাদের বংশের গৌরব হবে, ধনদৌলত মানসম্ভ্রম বাড়াবে, কৃতী ও যশস্বী পুরুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।" সন্ন্যাসীর কথা শুনে স্বামীর সম্মতিক্রমে ১৭৯৯ সনে রামলোচন-পত্নী দেবরপুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। বোঝা যায়, দ্বারকানাথের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরে কিংবদন্তীটি রচিত হয়েছে এবং তার নায়ক হয়েছেন যথারীতি একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।

জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের স্বোপার্জিত সম্পত্তি ও পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দ্বারকানাথ পেয়েছিলেন সত্য, আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি মানুষ হননি। ঐশ্বর্যের মধ্যেই দ্বারকানাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। পথের

ধুলো থেকে তাঁকে কিছু গড়ে তুলতে হয়নি। কিন্তু কেবল এই পৈতৃক ঐশ্বর্যের জোরে দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' বলে সমাজে পরিচিত হননি। ঠাকুরপরিবারের পঞ্চানন থেকে দর্পনারায়ণ-গোপীমোহন, নীলমণি-রামলোচনের ধারায় দ্বারকানাথ প্রথম নূতন পথ খুলে দেন। তাঁর বহুমুখী উদ্যম ও কর্মশক্তি সেই নূতন প্রবাহপথে বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করে। পশ্চিম থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বহু জমিদারীর মালিক হন তিনি, তাঁর পৌত্র রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীতে যে-সব জমিদারীর অপূর্ব প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে। এই সব জমিদারী অধিকারের ও তত্ত্বাবধানের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন সরকারী দলিলপত্রে টুক্‌রো হয়ে রয়েছে। টুক্‌রোগুলি জোড়া দিলে দ্বারকানাথের বিচিত্র কর্মপ্রতিভার একটা দিকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অথচ একথাও ঠিক যে সেকেলে জমিদার বলতে সমাজের একটি অন্ধকার কোণ থেকে যে-ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দ্বারকানাথ সেই শ্রেণীর জমিদার ছিলেন না। প্রতাপের দিক থেকে নয়, চরিত্র ও প্রবৃত্তির দিক থেকে। প্রতাপ তাঁর হয়ত কোন প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের চাইতে কম ছিল না, কিন্তু মন তাঁর 'বারো ভুঁইয়াদের' জমিদারীর যুগ অতিক্রম করে নিঃসন্দেহে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। মৃত স্বর্ণপিণ্ডের মত অসাড় অচৈতন্য মূলধনকে (Capital) তিনি মুক্ত বলাকার প্রাণাবেগে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, ভূসম্পত্তির গর্ভে নিশ্চিন্তে সমাধিস্থ করতে চাননি। কিন্তু পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক পরিবেশে তা সম্ভব হয়নি। তাই দ্বারকানাথের মূলধন ইংরেজের অভিশাপেই শেষ পর্যন্ত আবার মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবু তার বন্ধনমুক্তির ডানা-ঝাপ্‌টানি দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। নীলক্ষেত আর নীলকুঠি থেকে আরম্ভ করে চিনির কারখানা, কয়লার খনি, বাষ্পীয় পোত, ব্যাঙ্ক, এজেন্সি হাউস, সংবাদপত্র, নাট্যশালা, সর্বত্র দ্বারকানাথ সাহস করে তাঁর মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পঞ্চানন ঠাকুরের 'ক্যাপ্টেন পাকড়ানো', জয়রাম ঠাকুরের আমিনী, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিমক মহলের ও হাটবাজারের ইজারাদারী, নীলমণি ঠাকুরের সেরেস্তাদারী, গোপীমোহনের চীনাবাজার, রামলোচন-রামমণির স্থির বিষয়বুদ্ধি, সব একত্র করলেও দ্বারকানাথের দুরন্ত উদ্যম ও অভিযানের কাছে হার মেনে যায়। দ্বারকানাথের জীবনটাকে মনে হয় একটা রূপকথার মত। জীর্ণ দলিলপত্রের মধ্যে আজও তার অধিকাংশই চাপা পড়ে রয়েছে। যদি তা উদ্ধার করা যায় তা হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের বিচিত্র-গামী প্রতিভার আসল উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।[২৬]

২৬ কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা ইংরেজীতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে—*Memoir of Dwarkanath Tagore*, Calcutta 1870. দ্বারকানাথের আসল কর্মজীবন ও কীর্তিকথার বিবরণ বিশেষ কিছু এই গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে মনে হয়, দ্বারকানাথের এই টুক্‌রো জীবনকথা কিশোরীচাঁদ লিখেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে। হাতের কাছে পারিবারিক সংগ্রহে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যেসব কাগজপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন ছিল দেবেন্দ্রনাথ সেইগুলি কিশোরীচাঁদকে দিয়েছিলেন এবং লেখার জন্য পারিশ্রমিক দিতেও সম্মত হয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ নিজে এবিষয়ে তথ্যাদি অনুসন্ধান করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেই কারণে তাঁর লেখা জীবনীটি কতকগুলি প্রশংসাপত্রের সমষ্টি হয়েছে মাত্র, দ্বারকানাথের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত হয়নি।

লোকনাথ ঘোষের "Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc" বইখানি (দুইখণ্ড) এবং Furrell-এর লেখা "The Tagore Family" কলকাতা ও লণ্ডন থেকে একই সময়ে (১৮৮১-৮২ সনে) প্রকাশিত হয়। ঘোষ ও ফারেল উভয়েই কিশোরীচাঁদ সম্বল করার ফলে ঠাকুরপরিবারের ইতিহাসে অনেক ফাঁক থেকে গেছে এবং ভুলভ্রান্তিও আছে। সংশোধন ও সুসম্পূর্ণ করার উপায় হল সরকারী নথিপত্র ও সমসাময়িক পত্রিকাদি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা।

জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথের গৃহপ্রবেশ-উৎসবে সেদিন ইংরেজ ও বাঙালীর মিলন-মিশ্রণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন সূচিত হয়েছিল। কেবল জোড়াসাঁকোয় নয়, বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতেও এই মিলনের উৎসব হত ঘন ঘন, দ্বারকানাথের উদারতা ও ঐশ্বর্যের প্রকাশে দেশ-বিদেশের মানুষ বিস্মিত হত। মনে হয় যেন দ্বারকানাথের নিজের জীবনটাও ছিল একজোড়া সাঁকোর মত। একটি সাঁকো দিয়ে বাইরের বা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আচার-প্রথা ভিতরে আসত, আর একটি সাঁকো দিয়ে স্বদেশের ভাবধারা ঐতিহ্য আচার-প্রথা বাইরে যেত। দুই সাঁকোর উপর দিয়েই গতি ছিল অবাধ। সহযোগী রামমোহনের মত দ্বারকানাথও অস্তগামী মধ্যযুগ ও উদীয়মান নবযুগের সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিশাল একটি সাঁকোর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে এই বিশ্ব-ভারত-বাংলার সাংস্কৃতিক সাঁকোর বন্ধন আরও দৃঢ় করেছেন।

অগ্রদূত ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ'। এটি প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (১৮৭৪ নবেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে, কিন্তু অনামে। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতার নাম 'হিন্দুমেলায় উপহার', ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১১ তারিখে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালককবি-কর্তৃক স্মৃতি থেকে আবৃত্ত এবং পরবর্তী ২৫ ফেব্রুআরি (১২৮১ ফাল্গুন ১৪) তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, সনামে। এটাই সনামে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা। তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত কবিতা 'প্রকৃতির খেদ'। এটি প্রথমে আংশিকভাবে পঠিত হয় 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে, সম্ভবতঃ ২০ তারিখে। অতঃপর এটি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় উক্ত বৈশাখ মাসের শেষ দিকে, কিন্তু অনামে। তার কিছুকাল পরেই এটি কিছু পরিমার্জিতরূপে আবার প্রকাশিত হয় শক ১৭৯৭ আষাঢ় (১৮৭৫ জুন-জুলাই) সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, এবারও অনামে।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রকাশিত কবিতাগুলির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় এগুলি সম্বন্ধে (প্রত্যক্ষতঃ প্রথম ও তৃতীয়টি সম্বন্ধে এবং পরোক্ষে দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে) অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনাগুলির গুরুত্বও কম নয়। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবনের পক্ষে এই গদ্য রচনাগুলি আলোচনার সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমেই দেখা দরকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা কোন্‌টি। বাল্যকালে হিমালয়-বাসকালের স্মৃতিপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন—

> তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন ; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম। —'জীবনস্মৃতি', হিমালয় যাত্রা

এ হচ্ছে ১৮৭৩ সালের বৈশাখ মাসের কথা। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৯০৪) বলা হয়েছে—

> রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাহার বাঙ্গলা গদ্য রচনার সূত্রপাত। —সজনীকান্ত। 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ১৯৫

এই বিবরণটি সম্ভবতঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তথ্য অবলম্বনেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের এই জ্যোতিষবিষয়ক বাল্যরচনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, উল্লিখিত দুটি উক্তির কোনোটিতেই সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। আমরা একটু পরেই দেখব রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবনই এই ধারণা পোষণ করে গেছেন যে, রচনাটি তৎকালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৭৩ সালের এপ্রিল-মে (১২৮০ বৈশাখ) মাসে হিমালয়ে ডালহৌসি পাহাড়ে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ উক্ত জ্যোতিষবিষয়ক রচনাটি লেখেন। তার অল্প পরেই তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (শক ১৭৯৫ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় আশ্বিন কার্তিক পৌষ মাঘ)। প্রবন্ধটিতে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ

লেখকের পাকা হাতের পরিচয় সুস্পষ্ট। তা ছাড়া, তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় জ্যোতিষবিষয়ক আর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। এ বিষয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি (১৩৩৯ সালে) যে উত্তর দেন তা এই।—

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এটার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষপর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আর-একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সংগত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার মনে থাকতে পারত না। ইতি ১৫।১০।৩৯

—সজনীকান্ত। 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ১৯৬-৯৭

সুতরাং তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত এই লেখাটির মূল বাংলা রচনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু হাত ছিল বলেই মনে করা যায়। কিন্তু তার ভাব বা বক্তব্যবিষয় সংগৃহীত তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং রচনাটিও কোনো যোগ্য লেখকের দ্বারা প্রকাশযোগ্যরূপে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। এই অবস্থায় এটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা বলে স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ অল্পবয়সের এই জ্যোতিষবিষয়ক রচনাটি তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে, এই দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কখনও এটিকে তাঁর প্রথম গদ্য-রচনা বলে উল্লেখ করেন নি। বরং অন্য একটি প্রবন্ধকেই তাঁর প্রথম গদ্যরচনার সম্মান দিয়েছেন। তার কারণ এই লেখাটিতে ভাষার দিক্ থেকে তাঁর কিছু কর্তৃত্ব থাকলেও ভাবের দিক্ থেকে কিছুমাত্র স্বকীয়তা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনার আলোচনাপ্রসঙ্গে 'ঝানসীর রানী' নামক প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। এটি প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষের 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪ অগ্রহায়ণ), কিন্তু এটির রচনাকাল কয়েক বৎসর পূর্ববর্তী বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' (১৩৬৮) গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়েছে। এই পুস্তকের 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগে এটির সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 'রচনাটির রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত প্রাথমিক খসড়া শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে'। এই প্রাথমিক খসড়াটি যে পাণ্ডুলিপিতে আছে সেটি 'মালতী পুথি' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের যতগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এটিই সর্বপ্রাচীন। তাঁর বাল্যজীবনের (এমনকি ছাত্রজীবনেরও) বহু রচনা এটিতে পাওয়া গিয়েছে।

হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে গৃহশিক্ষকদের কাছে পাঠাভ্যাস করার সময়ে তিনি যেসব রচনা করেছিলেন তারও বহু নিদর্শন আছে এই মালতী পুথিতে। এই পুথিতে প্রাপ্ত 'ঝানসীর রানী'র প্রাথমিক খসড়াটি একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করলে মনে কোনো সন্দেহ থাকে না, এটি তৎকালীন পাঠাভ্যাসের অঙ্গ হিসাবে কোনো ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে রচিত। পরবর্তীকালে এটি পরিমার্জিত হয়ে প্রথম বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়। এসব কথা বিবেচনা করলে এই প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রথম গদ্যরচনা বলে গণ্য করা সমীচীন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকাশকালের বিচারে এটি প্রাথমিক গদ্যরচনা বলে

স্বীকৃতিলাভের অধিকারী নয়। তা ছাড়া, যদিও এটিতে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ভাবের আভাস ফুটে উঠেছে তবু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এটিতে তাঁর চিন্তাধারার স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশলাভের অবকাশ পায় নি। কেননা, এক্ষেত্রে তাঁকে কোনো ইংরেজি রচনা অবলম্বনে মুখ্যতঃ অনুবাদের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। অনুবাদ বা অনুসরণের দিক্ থেকে বিচার করলে এই ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধটিকে পূর্বোক্ত জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধটির অনুবর্তী বলে গণ্য করতে হয়। রচনাকালের বিচারে এটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার পর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করলেও ভাব বা ভাষার দিক্ থেকে এটিকে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্বকীয়তার অধিকারী বলে স্বীকার করা যায় না।

২

চিন্তা ও রচনার স্বকীয়তা তথা বিশিষ্টতা এবং প্রকাশকালের অগ্রবর্তিতার বিচারে যে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা বলে মর্যাদালাভের অধিকারী তার নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসাঙ্গিনী'। এটি প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার ১২৮৩ সালের কার্তিক (১৮৭৬ অক্টোবর-নবেম্বর) সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এটিকেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যপ্রবন্ধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই।—

> প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।
>
> তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী-নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।
>
> তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন— তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।
>
> এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।
>
> আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।
>
> খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত। —'জীবনস্মৃতি', রচনাপ্রকাশ

উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পনের বৎসর পাঁচ মাস। আর, জীবনস্মৃতি তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের রচনা। পরিণতবয়সে তিনি তাঁর এই বাল্যরচনাটি সম্বন্ধে যে পরিহাস-মিশ্রিত কটাক্ষপাত করেছেন তা ওই রচনাটির প্রাপ্য কিনা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

কিন্তু তার আগে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' 'অবসরসরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী', এই তিনখানি বইএর একটু পরিচয় দিয়ে নেওয়া কর্তব্য। তিনখানিই কবিতার বই।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ (শক ১৭৯৭ অগ্রহায়ণ) সালে। কবির নাম নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২)। 'ভুবনমোহিনী' তাঁর ছদ্মনাম। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না। আখ্যাপত্রে ছিল 'Edited and published by Nobinchandra Mookhopadhyay' শুধু এই কথা-কয়টি। কিন্তু ছদ্মনাম 'ভুবনমোহিনী' সুপরিচিত ছিল। তাই তৎকালে ধারণা হয়েছিল, এই পুস্তকটি ওই নামের কোনো মহিলা কবির রচনা। এটিই কবির প্রথম কাব্য এবং প্রকাশের অল্পকাল পরেই এটিকে বালক-রবীন্দ্রনাথের কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে বলা যেতে পারে যে, নবীনচন্দ্রের তৃতীয় কাব্য 'সিন্ধুদূত'কেও (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের হাতে কঠোর সমালোচনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল।

'অবসরসরোজিনী' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালের মে মাসে। রচয়িতা কবি রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪)। তিনি নবীনচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন, 'তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে আদরের বস্তু'। রাজকৃষ্ণ বহু গ্রন্থের লেখক। কিন্তু তাঁর খ্যাতির প্রধান হেতু 'অবসরসরোজিনী' কাব্যখানি। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

> অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুণই আজিকার বাঙ্গালী পাঠক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে, 'অবসর-সরোজিনী' পড়ে না বলিয়াই কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে সে জানে না, পড়িলে 'ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি' প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না।
>
> — সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৫০ (১৩৫৩ সং), পৃ ৫২

অতঃপর 'দুঃখসঙ্গিনী'। এটির প্রকাশকাল ১৮৭৫ অক্টোবর। রচয়িতা হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪-১৯৩০)। দুঃখসঙ্গিনীই তাঁর প্রথম বই। কিন্তু বইটি তৎকালে সাহিত্যজগতে উপেক্ষিত হয় নি। বান্ধব আর্যদর্শন বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বহু উদ্ধৃতিসহ দীর্ঘ সমালোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কি, তা যথাস্থানে দেখানো যাবে। তবে এস্থলেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, বালক-রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ফলেই এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরতা অর্জন করেছে। কিন্তু 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। বিস্মৃতির অন্ধকারেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র, 'অবসরসরোজিনী'র কবি রাজকৃষ্ণ এবং 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবি হরিশ্চন্দ্র, এই তিনজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন রাজকৃষ্ণ। তাঁকে জীবনে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল; তিনি দীর্ঘজীবনও লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসরের স্বল্পপরিসর জীবনে নানা বিরুদ্ধতার মধ্যেও তিনি নিজ প্রতিভার বিশিষ্টতাগুণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়তার

অধিকারী হয়েছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার (প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ বৈশাখ ৬ তারিখে) অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি তখনই 'উদীয়মান কবি' বলে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন।

অপর দুই জন, নবীনচন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্র, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ করেও রাজকৃষ্ণের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। বস্তুতঃ বালক-রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা-প্রবন্ধটিই অনেকাংশে তাঁদের সাহিত্যকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির কয়েকটি বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। একটু মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রপ্রতিভার যে বিশিষ্টতা পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যকে অপূর্ব প্রভায় উদ্‌ভাসিত করেছিল তারই অরুণাভাস পাওয়া যায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে। বস্তুতঃ, চিন্তামুক্তির যে বিশিষ্টতা ও বলিষ্ঠতা উত্তরকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগে আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছে, এই প্রবন্ধটিকে বলা যায় তারই অগ্রদূত। একটু কান পেতে অবহিত হলেই এই স্বল্পায়তন রচনাটির মধ্যেই শোনা যাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার দুর্জয় আত্মঘোষণা-বাণী— 'অয়মহং ভো'।

এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার ক্ষেত্রে 'অভিলাষ' কবিতাটির যে স্থান, তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ভুবনমোহিনী' প্রভৃতি রচনাটিরও সেই স্থান। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে প্রেরণাভূমি থেকে 'অভিলাষ' কবিতার উৎপত্তি, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনাটিতেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বালক-রবীন্দ্রনাথ 'অভিলাষ' কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮১ শ্রাবণ) প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধটি থেকে। কিন্তু সে প্রেরণা আনুকূল্যের প্রেরণা নয়, প্রতিবাদের প্রেরণা। 'ভুবনমোহিনী'-ইত্যাদি-শীর্ষক গদ্য-রচনাটিতেও 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। কিন্তু এবারকার প্রভাব প্রতিবাদের নয়, সমর্থনের। তার প্রমাণ দেওয়া কঠিন নয়। 'ভুবনমোহিনী' থেকে বালক-সমালোচকের দুটি উক্তি উদ্‌ধৃত করছি। প্রবন্ধের প্রথমেই এক জায়গায় বলা হয়েছে—

> এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নির্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে।

এই উক্তির 'নির্জীব' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাঙালি নির্জীব কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় পরবর্তী আর-একটি উক্তিতে।—

> বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে, আবার বাঙ্গলার জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালিরা স্বভাবতঃ নির্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথায়? অনেকদিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালির হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ অষ্টেপৃষ্ঠে মূলবিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া

বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্ত প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। — জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ১২৮৩ কার্তিক

এবার 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক।—

বাঙ্গালির পূর্ববীরত্ব, পূর্বগৌরবের কি জানা আছে?· · প্রাচীনকাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ বঙ্গদেশ পর্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব কোথায়?···

পূর্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোনো প্রমাণ নাই। হোয়েন্থসাঙ সমতটরাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্বাকৃত, দুর্বল গঠন ছিল।· ·

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্বল।· ·

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। — বঙ্গদর্শন, ১২৮১ শ্রাবণ

দেখা যাচ্ছে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই বাঙালিকে প্রথমাবধি ঐতিহাসিক গৌরবে বঞ্চিত, কর্মকীর্তিহীন নির্বীর্য জাতি বলে ধরে নিয়েছেন এবং উভয়ের মতেই এই নির্বীর্যতার হেতু প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ জলবায়ুর প্রভাব। বাঙালি জাতির অতীত ও বর্তমান প্রকৃতি সম্বন্ধে উভয়ের এই সুস্পষ্ট মতসাদৃশ্য আকস্মিক বলে মনে করবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রকাশের কয়েক মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভাই ভাই' নামে কবিতাতেও কঠোর ভাষায় বাঙালির ঐতিহ্যগৌরবহীনতাকে ধিক্‌কার দিয়াছেন।—

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছি ছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।· ·
কার উপকার করেছ সংসারে?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয়?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল?
কোন্ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল?
এই বঙ্গভূমি এ-কাল সে-কাল
অরণ্য, অরণ্য, অরণ্যময়। —বঙ্গদর্শন ১২৮১ চৈত্র

'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য এবং এই কবিতার বক্তব্যবিষয় অবিকল এক। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি বা এটির কোনো প্রভাব তাঁর উপরে পড়ে নি, এমন কথা মনে করবারও কোনো হেতু নেই। যা হক, 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধ এবং 'ভাই ভাই' কবিতার সঙ্গে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি রচনাটির এই চিন্তাগত ঐক্যটুকু অস্বীকার বা উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

বাংলাদেশের জলবায়ুর গুণে বাঙালিরা হয়েছে নির্জীব এবং তারই ফলে বাংলাসাহিত্যে ঘটেছে মহাকাব্যের অল্পতা ও প্রেমবিষয়ক গীতিকবিতার প্রাধান্য, এই হচ্ছে বালক-রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা দেখেছি এই অভিমতের প্রথমাংশের উৎস হচ্ছে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধটি, দ্বিতীয়াংশের উৎস নিহিত রয়েছে বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রেরই অপর একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির নাম 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। এর থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

> ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার তেজোহানিকর ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহ-সুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য। —বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ

এই প্রবন্ধেরই প্রথমাংশে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় আর্যরা যে-সময়ে 'অনার্যকুলপ্রমথনকারী ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি'রূপে পরিগণিত ছিল, তখনকার 'সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ' মহাকাব্য। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশপ্রভাবে যখন কোনো জাতির চরিত্রে বীর্যবত্তার প্রকাশ ঘটে তখন সাহিত্যেও দেখা দেয় সেই চরিত্রানুযায়ী বীররসাত্মক মহাকাব্য, সেইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশগুণে যখন জাতীয় চরিত্রে দুর্বলতা ও কোমলতার প্রাধান্য ঘটে তখনই রচিত হয় মাধুর্যময় গীতিকবিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধে।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' (১২৮০ পৌষ) ও 'বাঙ্গালির বাহুবল' (১২৮১ শ্রাবণ) প্রবন্ধ এবং 'ভাই ভাই' কবিতার (১২৮১ চৈত্র) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধের (১২৮৩ কার্তিক) এই যে ভাবগত-ঐক্য, একে নেহাতই আকস্মিক বলে উপেক্ষা করা যায় না। 'ভাই ভাই' কবিতায় আছে বাঙালির 'কোমল স্বভাব কোমল দেহ'র কথা, তার পরেই আছে তার 'কোমল পিরীতি কোমল স্নেহ'র কথা। আর, বালক-সমালোচকের রচনায় আছে বাঙালির 'কোমল হৃদয়ে' প্রেমের প্রভাবের সবিস্তার পরিচয়। এই সাদৃশ্যটুকুও লক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বালক-বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' এবং অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ

বিষয়ে তাঁর স্বীকৃতিরও অভাব নেই। তেমনি তাঁর সে বয়সের গল্পরচনায় যদি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার ছায়াপাত দেখা যায়, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন তার বিচিত্র আলোকরশ্মিপাতে রবীন্দ্রনাথের উন্মেষোন্মুখ হৃদয়কে এক নূতন জগতের অপূর্ব বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত করে তুলেছিল, এ কথা তিনি যে কতবার কতভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ স্থলে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সেকালে তাঁর কিশোর হৃদয় যে ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার আভাস পাওয়া যায় এই লাইন-কয়টিতে—

মনে আছে সেই প্রথম বয়স নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি অধিক জাগিয়া উঠে।
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি' যেন রক্তকমল ফুটে॥
প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে চাহি রহিতাম একা
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই লেখনি অরুণ-রেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক প্রাচীন তিমির নাশি,
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে নূতন জগৎ-রাশি॥ —'মানসী', পরিত্যক্ত (১৮৮৮)

রবীন্দ্রনাথের কিশোর হৃদয়ে বঙ্কিমচিন্তাধারার এই যে প্রভাব, তা সহজে মুছে যায় নি। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো ভাব তাঁর অন্তরে চিরকালের জন্য বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবই যে সর্বাধিক এই বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের শেষবয়স পর্যন্ত এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ রকম আর-একটি বিশ্বাস হচ্ছে বাঙালির নির্বীর্যতা ও ঐতিহ্যগৌরবহীনতা সম্বন্ধে। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু দু-একটি কথার উল্লেখই যথেষ্ট। 'মানসী' কাব্যের দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি ও বঙ্গবীর, 'সোনার তরী' কাব্যের হিং টিং ছট্‌, 'চৈতালি' কাব্যের বঙ্গমাতা, 'কল্পনা' কাব্যের উন্নতিলক্ষণ প্রভৃতি রচনার কথা স্মরণ করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।—

অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি গৃহের প্রতি টান,· ·
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি-সন্তান। —'মানসী', দুরন্ত আশা (১৮৮৮)

এর সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালি বর্ণনার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। 'গৃহের প্রতি টান' কি বঙ্কিমচন্দ্রের পুনঃ-পুনরুক্ত 'গৃহসুখপরায়ণ' বিশেষণটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না?

অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।· ·
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল॥ —'সোনার তরী', হিং টিং ছট্‌ (১৮৯২)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'খর্বাকৃত দুর্বলগঠন' বিশেষণ স্মরণীয়। আর, শেষ লাইনটি হচ্ছে বাঙালির ঐতিহ্যগৌরব-হীনতার প্রতি আপাতনিষ্ঠুর ইঙ্গিত। 'নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব' 'ভাই ভাই' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের

এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল'। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদিতেও এই মনোভাব সুস্পষ্ট। বাঙালির এই অগৌরবের প্রতিকার -কামনাতেই তিনি কবিতায় লিখেছিলেন—

> শীর্ণশান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
> দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
> সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
> রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি॥ —'চৈতালি', বঙ্গমাতা (১৮৯৬)

আর গদ্যে লিখেছিলেন—

> বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুশকিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই।· ·
>
> পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ, তাঁহারা নাই, তবে ভালো মন্দ কোনো- একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমতো মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সংগতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত বড়ো দুর্ভাগ্য, এত বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে?
>
> —'বিচিত্র প্রবন্ধ', মা ভৈঃ (১৩০৯)

পরবর্তীকালের এই বেদনাময় মনোভাবের বীজ নিহিত রয়েছে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাব উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতা থেকে।

অতএব এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রসাহিত্য তথা রবীন্দ্রচিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে 'ভুবন-মোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবন্ধটির গুরুত্ব কম নয়।

৪

অতঃপর উক্ত প্রবন্ধের ভাষা ও ভাব -গত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেই এই আলোচনা সমাপ্ত করব।

প্রথমেই ভাষার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় 'বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল'। অন্যত্র বলেছেন—

> তাঁর [বঙ্কিমচন্দ্রের] আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল, তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে। —'বাংলাভাষাপরিচয়' (১৯৩৮) পরিচ্ছেদ ৬

বাংলা সাহিত্যে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণতেজে আবির্ভাব তখন কিশোর-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কোরকের উন্মেষকাল। এই দু-এর পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল'। সুতরাং, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার সত্যপরিচয় পেতে হলে তাঁর বালকচিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র প্রভাবের যথোচিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা প্রয়োজন।

এই অবস্থায়, আশা করা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গদ্যরচনায় বঙ্কিমী রীতির ছায়াপাত ঘটবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি রচনাটিতে বঙ্কিমী রচনারীতির প্রভাব খুব অল্পই দেখা যায়। উদ্‌ধৃত রচনাংশগুলির তুলনা করলেই দুই জনের রচনারীতির পার্থক্য বোঝা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক গদ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঋজু যুক্তিপরায়ণতা ও অলংকারপ্রয়োগের স্বল্পতা; তাঁর রচনার লক্ষ্য বক্তব্যকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করা, হৃদয়গ্রাহী করা নয়। এই রীতির আর-এক বৈশিষ্ট্য বক্তব্যের মধ্যে বেগ সঞ্চারের অভিপ্রায়ে স্থলে স্থলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ। পূর্বোদ্‌ধৃত অংশগুলির মধ্যে এই বিশিষ্টতাগুলি সহজেই লক্ষিত হবে। পক্ষান্তরে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদিতে এইগুলির পরিবর্তে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার যা প্রধান বিশিষ্টতা, কবিসুলভ আলংকারিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং হৃদয়গ্রাহিতার অলক্ষিত পথে পাঠকের আন্তরিক স্বীকৃতি আদায়, বাংলা সাহিত্যে তারই প্রথম পদসঞ্চারণ। এই প্রথম পদক্ষেপেই কোথাও কোনো দ্বিধা বা শঙ্কার চিহ্নমাত্রও নেই। প্রথম শরসন্ধানেই পাওয়া গেল অব্যর্থ নৈপুণ্যের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

> যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধবালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্‌গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্রকাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়। সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে।

এই ভাষায় রবীন্দ্ররচনাসুলভ অলংকারবাহুল্য ও প্রবল স্রোতোবেগময় হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণতেজেই প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া, এ ভাষার ভাবব্যঞ্জনা, ভারসামঞ্জস্য, ধ্বনিঝংকার ও অনতিস্ফুট ছন্দস্পন্দন উত্তরকালের রবীন্দ্ররচনার যোগে আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বিশিষ্টতাগুলির একত্র সমাবেশ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনায় সুলভ নয়। রবীন্দ্ররচনার এই সুপরিচিত বিশিষ্টতাগুলি তাঁর এই প্রথম রচনাটিকেই যে অপূর্ব সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছে সে কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে এ ভাষাকে বলতে হয়—

নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন

কিংবা

যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

বালক-রবীন্দ্রনাথের হাতে এই যে নূতন গদ্যরীতির উদ্‌ভব হল, তাঁর মতে এর কৃতিত্বও বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রেরণালাভের ফলেই বাংলাভাষা সহসা 'নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে' চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলাভাষা এই যে নূতন পথে প্রবলবেগে প্রবাহিত হল, স্বীকার করতে হবে তাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণারই ফল।

গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উদ্যমের পূর্ণ মূল্য বুঝতে হলে মনে রাখা উচিত যে, এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল পনেরো বৎসর পাঁচ মাস মাত্র।

৫

এবার ভাবের কথা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্বর্গত সজনীকান্ত দাসের একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

> রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গদ্যপ্রবন্ধে দুইটি বস্তু লক্ষণীয়। এক, সতের বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের পথে আমেদাবাদ যাইবার পূর্বে তিনি ইংরেজি জানিতেন না—এই উক্তি সত্য নহে। রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় চৌধুরীর কৃপায় ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই প্রবন্ধে আছে। দ্বিতীয়, ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭ সনের জুলাই) ভারতীর প্রথম সংখ্যা হইতে 'মেঘনাদবধকাব্যে'র উপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ কিশোর-রবীন্দ্রনাথ চালাইয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত বীজাকারে এই প্রবন্ধেই আছে। —'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ২১১

আমরা জানি যে, হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের (১৮৭৩ মে-জুন) পরে রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্পীঅরের ম্যাক্‌বেথ বাংলা ছন্দে তরজমা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার উপরে বেশ-খানিকটা দখল না হলে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হত না। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার জ্ঞান যে গভীর না হলেও ব্যাপকতায় উপেক্ষণীয় ছিল না, তার যথেষ্ট পরিচয় আছে তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধটিতে। শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, সাহিত্যের ইতিহাসও তাঁর কাছে নেহাত অপরিচিত ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তিনি যে তৎকালে শুধু কুমারসম্ভবই পড়েছিলেন তা নয়। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষতঃ কালিদাসের সাহিত্য, সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা তাঁর তখনই হয়েছিল। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে ব্যাপক ভূমিকার উপরে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাটিতেই।

শুধু সাহিত্য নয়, যে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রচিত্তের অন্যতম প্রধান লক্ষণ তারও প্রথম সংশয়াতীত আবির্ভাব ঘটেছে এই প্রবন্ধটিতেই। একদিকে ফরাসি-বিপ্লব, অন্যদিকে বাংলাদেশের চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব, এই উভয়ই বালক-রবীন্দ্রনাথের মনকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার ইতিহাসে চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ পরবর্তীকালে দেখা গিয়াছিল, এ সময়েই যে সে-অনুরাগের সূত্রপাত হয়েছিল—এ কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে', বালক-সমালোচকের এই উক্তি আজও অগ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া, কি কারণে 'প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে', কিশোর ভাবুক তার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন ও যে যুক্তিপরম্পরার উপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাও অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। শুধু তাই নয়। যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি তা উপস্থাপিত করেছেন বা তৎকালের পক্ষে, তথা সেই বয়সের বালকের পক্ষে, সত্যই বিস্ময়কর।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল'। 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয় ১২৮১-৮৩ (ইংরেজি ১৮৭৪-৭৬) সালে। যে-সময়ে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি রচিত হয় সে-সময়েই বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ও সাগ্রহ পরিচয় ঘটে। সুতরাং এই প্রবন্ধে যে বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়ের বিষয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' (১২৮০ পৌষ) প্রবন্ধও এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রেরণা, তারও প্রথম প্রকাশ এই প্রবন্ধটিতেই।

এ প্রবন্ধে গীতিকাব্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কারণ যেমন যথেষ্ট যুক্তি ও নৈপুণ্যের সহিত উপস্থাপিত হয়েছে, মহাকাব্য-রচনার রীতি পরিহারের যুক্তিও তেমনি দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে। তাঁর মতে এখন মহাকাব্য-রচনার যুগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে-কালে মানুষের হৃদয় ছিল অনাবৃত, কৃত্রিম সভ্যতার আচ্ছাদনে মানুষ হৃদয় গোপন করতে জানত না, তখনই ছিল মহাকাব্য-রচনার যুগ। আধুনিক কালের কৃত্রিমতার মধ্যে আর সার্থক মহাকাব্য-রচনা সম্ভব নয়। 'এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব না।' তৎকালে বাংলাদেশে মহাকাব্য-রচনার যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, বালক-রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রসন্নহৃদয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। হেম-নবীনের মত প্রবীণ কবিরাও যে যুগধর্মের সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পান নি, কিশোর-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে তা এত সহজেই প্রতিফলিত হয়েছিল তা তাঁর সহজাত অসামান্য প্রতিভারই পরিচায়ক। তাই তিনি তখনই অসংকোচে লিখতে পেরেছিলেন—

> আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে, যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনি একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয়ে লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখনো কখনো রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিতেছেন। এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐসকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে।

কিশোর-সমালোচকের এই প্রতিবাদ তখনকার মহাকবিদের শ্রুতিগোচর হয় নি। যদি হত তা হলে বাংলা সাহিত্য বিপুল পরিমাণ কৃত্রিমতা ও শক্তির অযথা অপচয় থেকে রক্ষা পেয়ে যেত।

পক্ষান্তরে সেকালে কৃত্রিম মহাকাব্যধারার পাশে পাশেই যে নূতন গীতিকাব্যের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তার কলোচ্ছ্বাসে কিশোর কবির হৃদয় মুগ্ধ হয়েছিল। তাই তিনি লিখলেন 'বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে।' এই 'ক্রন্দন' মহাকবিদের কর্ণগোচর হয়নি। কিন্তু এ ক্রন্দনই বালকের চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাই তিনি জীবনের প্রথম থেকেই মহাকাব্যের পথ ছেড়ে গীতিকাব্যের পথই বেছে নিলেন। আর গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য যে প্রেম, সে কথাও তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে এই প্রবন্ধটিতেই। সে প্রসঙ্গ একটু পরেই পুনরুত্থাপন করা যাবে। প্রেমগীতির প্রতি পক্ষপাতবশতঃ এই যে মহাকাব্যের পথ পরিহার, তার প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল যখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল কাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়॥ —'ক্ষণিকা' (১৯০০) ক্ষতিপূরণ

যে যুগের প্রতি এই পরিহাস মিশ্রিত কটাক্ষপাত, সেই মহাকাব্যের যুগের আর-একটি বিশেষ লক্ষণ স্বদেশপ্রীতির অতিবাহুল্য। সেই স্বাদেশিক উত্তেজনার যুগে প্রেমসংগীত শুধু উপেক্ষিত নয়, ধিক্কৃতও হত। কিঞ্চিদধিক পনেরো বৎসরের কিশোর-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির প্রেরণা কিছুমাত্র কম ছিল না। তার প্রচুর প্রমাণ আছে তাঁর তৎকালীন অনেক কবিতায় ও গানে। এস্থলে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এত অল্পবয়সের বালকের পক্ষে প্রেমগীতি রচনা বা প্রেমের কবিতার সমর্থন অনধিকারচর্চা বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত আজন্মপ্রতিভাশালী বালকের পক্ষে তা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই তাঁর তৎকালীন অনেক রচনাতেই প্রেমপ্রসঙ্গের অভাব ঘটেনি, যদিও স্বভাবতঃই সে প্রেমের মধ্যে অবাস্তবতা ও অপরিণতির লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যা হক, তাঁর এই প্রথম সমালোচনা নিবন্ধটিতেও প্রেমরচনার সমর্থন পাওয়া যায় বলিষ্ঠ ভাষাতেই। 'দুঃখসঙ্গিনী'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> দুঃখসঙ্গিনীতে আর্যসংগীতে নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই।· ·এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে, প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না।

এই উক্তি বালকের। কিন্তু আশা করি পরিণতবয়সের কোনো সমালোচকও এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করবেন না। পরিণতবয়সে রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই বালকবয়সের অভিমতকেই সমর্থন করেছেন তাঁর বিচিত্র রচনায়। 'প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে' আলোচ্যমান প্রবন্ধে তিনি এই অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন সরল ভাষায়, যুক্তির যোগে। পরিণতবয়সে তিনি ঠিক এই অভিমতেরই প্রতিবাদ করেছেন ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, পরিহাসের সুরে।—

বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ। —'মানসী', দেশের উন্নতি (১৮৮৮)

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী,
হে প্রেয়সী!
বলচে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে।
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকচে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা॥ —'ক্ষণিকা' (১৯০০), ক্ষতিপূরণ

৬

একমুখীনতা ও আতিশয্য রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সর্বতোমুখীনতা ও বিচিত্রের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষা, এই হচ্ছে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান বিশিষ্টতা। তাঁর অল্পবয়সের এই প্রথম প্রবন্ধটিতে এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণেই।

তখনকার দিনে যাঁরা স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনায় দেশকে মাতিয়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের কাছে প্রেমের কবিতা ছিল অপাংক্তেয়, রবীন্দ্রনাথ সে বয়সেই প্রেমের কবিতার সমর্থনে কুণ্ঠিত হলেন না। অথচ তিনি নিজে 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবির মত একমাত্র প্রেমকেই কখনও তাঁর রচনার উপজীব্য করেন নি। পূর্বেই বলেছি তাঁর বাল্যরচনায় স্বদেশপ্রীতির উৎসাহও কম ছিল না। আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতে স্বদেশপ্রীতিবিষয়ক রচনার প্রতি তাঁর অন্তরের আনুকূল্য প্রকাশ পেয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। মধ্যযুগে 'জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত' করেছিল। কিন্তু 'আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা অধীনতা তেজস্বিতা স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন'। এই ভাবধারা অবলম্বনে রচিত মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত কি, তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে এগুলি সবই ব্যর্থ এবং ব্যর্থহতে বাধ্য, কারণ তা কালধর্মের বিরোধী। কিন্তু এই নূতন ভাবধারা নিয়ে রচিত নূতন গীতিকাব্যের সার্থকতাও সংশয়াতীত। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই।—

> কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সব ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির প্রথম অশ্রুজল।

এই অংশটুকুতে রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতির বিশিষ্টতা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে তাও লক্ষণীয়। যা হক, এই উক্তি থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির স্বরূপটিও সংশয়াতীতরূপেই প্রকাশিত

হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই যে তৎকালে বাঙালিদের স্বদেশপ্রীতির লক্ষ্য ছিল, তাও এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। 'মিলে সব ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত— এই বাক্যটি একটি ঐতিহাসিক উক্তি বলে গণ্য হবার যোগ্য। 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল পূর্বেই 'মহাগীত' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (বঙ্গদর্শন ১২৭৯ চৈত্র)। বালক-রবীন্দ্রনাথ এই গানটিকে 'ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত' নামে অভিহিত করলেন। এই স্বীকৃতির ঐতিহাসিক মর্যাদা কম নয়। অন্যত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতেও এই গানটির ছায়াপাত ঘটেছে এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটি 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানেরই যথার্থ উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ, আধুনিক ভারতবর্ষের দুটি জাতীয়সংগীতই এই গানটির অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথ যে সেই অল্পবয়সেই এই গানটির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পূর্বে বলেছি রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর যথোচিত পরিমাণবোধ। স্বদেশপ্রীতির প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর এই পরিমাণবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই। তৎকালীন স্বদেশপ্রীতির অনুভূতিকে অন্তরের সহিত অনুমোদন করলেও তিনি তার কৃত্রিম বাড়াবাড়িকে ধিক্কার জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এ বিষয়েও তাঁর উক্তি উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

> আজিকালি বাঙ্গালা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নির্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জলন্ত অনল। 'মিলে সব ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজকালি বালক পর্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক। সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে, ও সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসংগীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই ; তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একইরূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না, যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। ·তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে, নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

কিঞ্চিদধিক পনেরো বৎসর বয়স্ক লেখকের মুখে 'বালক পর্যন্ত' 'বালকগণ' 'উপদেশ দিই' প্রভৃতি কথা উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, উদ্‌ধৃত অংশটুকুর মধ্যে নবীন লেখকের যে চিন্তাগত প্রবীণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তৎকালে অনেক পরিণতবয়স্ক লেখকের মধ্যেও তার অভাব ছিল। ফলে ওই সহজাত প্রবীণতার প্রেরণাতেই তাঁর লেখনী থেকে উক্ত আপাত-অশোভন কথাগুলি বোধহয় এসেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪ জুলাই) এবং 'সরোজিনী' (১৮৭৫ নবেম্বর) নাটক 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদির পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি

নাটকেরই উপজীব্য স্বদেশপ্রেম। পুরুবিক্রমে বীররসেরও অভাব ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়' (বঙ্গদর্শন ১২৮১ ভাদ্র)। 'ভারতমাতা, উঠ, জাগ, যবন' ইত্যাদি যেসব কথার অতিরিক্ত প্রয়োগ থেকে ক্ষান্ত হতে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়েছিলেন, 'পুরুবিক্রম' নাটকে তারও অভাব নেই। যথা—

ওঠ! জাগ! বীরগণ দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সব এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥ · ·
স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে। ইত্যাদি

দেখা যাচ্ছে বালক-রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের লেখনী থেকেও স্বদেশপ্রীতি বা বীররসের অতিরিক্ততা পছন্দ করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে অনেক সময় কনিষ্ঠের এসব অভিমত শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর আত্মস্মৃতি গ্রন্থে 'সরোজিনী' নাটকের ইতিহাস প্রসঙ্গে। এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে বা কবিতায় এ ধরণের স্বাদেশিক উত্তেজনাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি।

বলা বাহুল্য, বালক-সমালোচকের এই 'উপদেশ' কখনও গ্রাহ্য হয় নি। ফলে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এসব কৃত্রিম উত্তেজনাকে নিরস্ত করবার অভিপ্রায়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ
রয়েছে রেশ কানে,
কী যেন করা উচিত ছিল
কী করি কে তা জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন groan,
এ-হেন কালে ভীষ্ম-দ্রোণ
গেলেন কোন্খানে॥ —'মানসী', দেশের উন্নতি (১৮৮৮)

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধে উক্ত 'ভারতমাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ' প্রভৃতি কথার প্রতি কটাক্ষ এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই 'দেশের উন্নতি' কবিতাটিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের যথার্থ স্বরূপ স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।—

সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই।
দশজনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,

কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে
তাদের আমি নই।

স্বদেশসেবা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে অপ্রমত্ত মনোভাব, তা তাঁর বাল্যবয়সে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি রচনার কালেও যেমন সত্য ছিল, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়েও তেমনি সত্য ছিল। তাঁর এই মনোভাব সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল স্বদেশী-আন্দোলনের প্রচণ্ড উত্তেজনার সময়ে। যে পরিমাণবোধ ও সংযমের নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধটিতে, সে নির্দেশই তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়েছিল স্বদেশী-আন্দোলন তথা গান্ধী-আন্দোলনের যুগে। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত অভিমতের শেষাংশটুকু এ প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেননা, তার মধ্যে রবীন্দ্রচিত্তের একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

এ কথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত ছিল সুগভীর ইতিহাসবোধ তথা সংস্কৃতি-বোধের উপরে। তাঁর এই ভারতীয় ইতিহাস, তথা সংস্কৃতি, বোধের পরিচয় আছে এই 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-ইত্যাদি রচনাটিতেই। বৈদিক ঋষি, ব্যাস্, বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্য—একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে-ভাবে এসব নামের অবতারণা করা হয়েছে তা তাৎপর্যহীন নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রপ্রতিভা যে বিশিষ্টতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম সুস্পষ্ট আভাস আছে এই প্রবন্ধেই। এই প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষির উল্লেখ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।—

> ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই।

এই উক্তি যেমন অতর্কণীয় ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি রবীন্দ্রচিত্তের একটি বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বৈদিক ঋষিদের তথা তপোবনের আদর্শ বাল্যকালেই রবীন্দ্রচিত্তে বদ্ধমূল হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, পরিণতবয়সেও এই প্রবণতা তাঁর চিত্ত থেকে তিরোহিত হয় নি।

৭

রবীন্দ্রমানসের যে পরিমাণবোধ, সংযম ও অপ্রমত্ততার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি নানা প্রসঙ্গে, আলোচ্যমান প্রবন্ধে তার আরও কিছু পরিচয় আছে বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রসঙ্গে। গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পঞ্চাশ বৎসরের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে যদিও পনেরো বৎসরের রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কথা একটু হেসে-উড়িয়ে-দেওয়ার সুরেই উল্লেখ করেছেন তবু স্বীকার করতে হবে যে, গীতিকাব্য ও মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তীকালের অভিমত ও কিশোর বয়সের অভিমত থেকে খুব ভিন্নরূপ ধারণ করে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করতে পারি। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেও দেখি নবীনচন্দ্রের ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, রাজকৃষ্ণের অবসরসরোজিনী ও হরিশ্চন্দ্রের দুঃখসঙ্গিনী কাব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে যে সহজাত রসবোধের ও নিপুণ বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে আজও তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রবন্ধটি

পড়লেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই রচনাটিতেই মাঝে মাঝে যে মুন্‌সীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

> একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা স্থমার্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর-একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা-কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোনো কোনো স্থলে আবার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন।

এই উক্তিটুকুর মধ্যে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। অন্য ধরণের দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

> কবিরা যেখানেই পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাবে লেখেন সেইখানেই ভালো হয়, কেননা, তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভালো করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিম্বা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংস মধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে।

> কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না।

এইসব উক্তির সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক কালের বাংলা কবিতা সম্বন্ধেও এসব মন্তব্য অনেকাংশেই প্রযোজ্য। যে অব্যর্থ ও সহজাত সাহিত্যিক রসবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন, উদ্ধৃত উক্তিগুলি তারই নির্দেশক।

রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর যেসব কবিতা ধার-করা ভাব নিয়ে রচিত সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভালো; পক্ষান্তরে 'তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই।' এই দ্বিতীয় উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, এটি বালক-রবীন্দ্রনাথের ছন্দসচেতনতার পরিচায়ক। যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বাংলা ছন্দে বিস্ময়কর অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর ছন্দচেতনাসূচক এই প্রথম উক্তিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর এই উক্তিটির দ্বিতীয় গুরুত্ব এই যে, ভাবের দীনতা সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণ উত্তরকালে নব নব বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি পরবর্তী কালেও সত্য বলে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। বস্তুতঃ এই অভিমতটি শুধু 'অবসরসরোজিনী' নয়, রাজকৃষ্ণ রায়ের সমগ্র সাহিত্য সম্বন্ধেই স্বীকার্য। যা হক, এই উক্তিটি বালক-রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত সাহিত্যদৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে।

৮

অতঃপর এই প্রবন্ধটির সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্যকর ও কৌতুককর বিষয়টি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন উক্তি তাঁর জীবনস্মৃতি থেকে এই প্রবন্ধের গোড়াতেই উদ্‌ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' কাব্যখানি কোনো মহিলার লেখা বলে সাধারণের ধারণা জন্মে গিয়েছিল এবং অক্ষয় সরকার মহাশয় ও ভূদেববাবু এই মহিলা কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করছিলেন। তদুপরি তাঁর কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুও এই মহিলা কবির রচনায় অতিরিক্ত মাত্রায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বালক-রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বাড়াবাড়ি ভালো লাগে নি। তা ছাড়া, এই কবিতাগুলির মধ্যে ভাব ও ভাষাগত অসংযম দেখে এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলে মনে করতে তাঁর ভালো লাগত না। তদুপরি উক্ত বন্ধুর নিকট লিখিত 'ভুবনমোহিনী' সই-করা পত্র দেখেও লেখককে স্ত্রীজাতীয় বলে মনে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল। তাই তিনি এই কাব্যখানির সমালোচনা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতে কোথাও এই কাব্যের কবি স্ত্রীজাতীয় নয় বলে স্পষ্ট ভাষায় সংশয় প্রকাশ করা হয় নি। বরং এই কবিকে 'একজন অশিক্ষিতা রমণী' বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, অবসরসরোজিনী ও ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে দ্বিতীয়টির প্রতিই কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে ভুবনমোহিনীর কবিতা কিঞ্চিৎ অমার্জিত বা অমসৃণ হলেও তা অনায়াসলব্ধ এবং কবির হৃদয়খনি থেকে সদ্যতোলা রত্নের মত অসংস্কৃত হলেও মূল্যবান্ ও আদরণীয়। ভুবনমোহিনী যশের জন্য কবিতা লেখেন নি, লিখেছেন নিজের তৃপ্তির জন্য— এটাও একটা গুণ এবং 'একজন অশিক্ষিতা রমণী'র পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, এমন মন্তব্যও আছে এই প্রবন্ধে।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভার একটি দোষ তখনকার কালধর্মানুযায়ী কৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি ও আর্যগর্ব-ঘোষণা।—

> ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্যসংগীত আছে, কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে, দুর্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন।

এই উক্তির মধ্যে কিশোর লেখকের যে বিজ্ঞজনোচিত আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে তা উপভোগ্য। এই উক্তির 'কেননা' ও 'বালক' শব্দদুটি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীজনোচিত এবং বালকসুলভ দুর্বলতাই আর্যসংগীত রচনা করে তেজপ্রকাশের হেতু। এখানেও ভুবনমোহিনীকে 'স্ত্রীলোক' বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা ব্যঙ্গার্থক না নিশ্চয়ার্থক বলা শক্ত। কেননা, রাজকৃষ্ণকেও বলা হয়েছে 'বালক'। বস্তুতঃ রাজকৃষ্ণ এ সময়ে (১৮৭৬) ছিলেন সাতাশ বৎসরের যুবক। 'রাজকৃষ্ণবাবু' তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিচিত ছিলেন না বলে মনে করার হেতু পূর্বেই বলা হয়েছে। তবু যে তিনি তাঁকে 'বালক' বলে অভিহিত করলেন, তার কারণ ওই আর্যসংগীতগুলোর বালকজনোচিত দুর্বলতা। সুতরাং এখানে 'বালক' শব্দটি ব্যঙ্গার্থেই গ্রহণীয়।

যা হক, ভুবনমোহিনীপ্রতিভার অপর প্রধান দোষ এই কবিতাগুলির অর্থহীন অসংবদ্ধতা ও ভাবগত স্খলতা বা উন্মত্ততা। তখনকার দিনে এসব গুরুতর ত্রুটিও অনেকের কাছে গুণ বলেই গণ্য হত;

কারণ মহিলা কবির রচনার দোষ দর্শনে পাঠকদের অন্তরের স্বাভাবিক কুণ্ঠা। কিন্তু এই মোহ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। তাঁর সহজাত সাহিত্যনিষ্ঠা তাঁকে এই কাব্যের দোষত্রুটি প্রদর্শনে বিরত হতে দেয় নি কিংবা তার গুণগুলিকেও বাড়িয়ে দেখতে প্রণোদিত করে নি। এই কাব্যখানির সামগ্রিক গুণ ও দোষ সম্বন্ধে কিশোর সমালোচকের শেষ অভিমত এই।—

> যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে ওঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহা চতুর্থাংশে কমিয়া যায়। যখন আমরা পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন 'উন্মাদিনী' পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি!

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বিচারে এই কবিতাপুস্তকের জনপ্রিয়তার হেতু নারী নামের মোহ, যথার্থ কবিত্বগুণ নয়। এই যে লেখক লেখিকা নিরপেক্ষ নির্মোহ সাহিত্যদৃষ্টি, এটাই হচ্ছে তাঁর এই প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এমনও হতে পারে যে, উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যেই এই কাব্যের কবির নারীত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের সংশয় গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সময় তখনও হয় নি। পরবর্তীকালে যথার্থ তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল বলেই তিনি জীবনস্মৃতিতে সে কথা খুলে বলতে পেরেছিলেন।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভার কবির নারীত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিশোর-বয়সের এই যে সংশয় (যা ভূদেব, অক্ষয় সরকার বা রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর মনেও ক্ষণকালের জন্য উদয় হয় নি), তা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সহজাত অনুভূতির ফল। তা ছাড়া তার অন্য একটি কারণ ছিল বলেও অনুমান করা যেতে পারে। আমরা জানি বালক-রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজাত রসবোধের উৎকর্ষের জন্য তাঁর বউঠাকুরানী ও 'সাহিত্যের সঙ্গী' কাদম্বরী দেবীর (১৮৫৯-৮৪) নিকট কতখানি ঋণী ছিলেন। সুতরাং ভুবনমোহিনীপ্রতিভার কবিতাগুলির দোষগুণ নির্ণয়ে, তথা এই কাব্যের কবির প্রকৃতি নির্ণয়ে, তাঁর এই সাহিত্যের সঙ্গীর সাহচর্য বিশেষভাবেই সহায়তা করেছিল, এ কথা মনে করা অসংগত হবে না।

পরিশেষ

অতএব, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন পরিহাসমিশ্রিত উপেক্ষা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধটি বস্তুতঃ পরিহাস বা উপেক্ষার যোগ্য নয়। এই প্রবন্ধটি যে এখন পর্যন্ত যথোচিত স্বীকৃতি লাভ করে নি তার প্রথম কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই পরিহাস ও অবজ্ঞা, দ্বিতীয় কারণ এই প্রবন্ধ-রচনাকালে লেখকের বয়সের স্বল্পতা। লেখকের বয়স অতি অল্প, এই চেতনাই প্রবীণ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের মনে এই রচনাটির প্রতি যথোচিত প্রণিধান-স্থাপনের অন্তরায় ঘটিয়েছে। 'ভুবনমোহিনী'র কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তাকে উলটো করে নিয়ে তাঁর রচনাটি সম্বন্ধে সমভাবেই

প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ বলা যায়—'যদি লেখকের বয়সের কথা মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রচনাটি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা যখনই ইহা পড়িতে যাই তখনই লেখকের বয়সের কথা মনে পড়ে। দোষ পাইলে অমনি সেই দোষ দ্বিগুণিত হইয়া মনে ওঠে। গুণ পাইলে লেখকের বয়সের কথা মনে পড়ে, অমনি তাহা চতুর্থাংশে কমিয়া যায়।' বস্তুতঃ এই হচ্ছে এ লেখাটির অবজ্ঞাত হবার একটি প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়' এই বিখ্যাত উক্তিটি।

বয়স-নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির চিন্তামূল্য বা রচনামূল্য কোনোটাই কম নয়। আমার বিশ্বাস, ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন কবিতার চেয়েও এই গদ্যরচনাটির সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেশি। তা ছাড়া, এটির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। বস্তুতঃ এই গদ্যরচনাটিই সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তাধারার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হলে শেষপর্যন্ত উপনীত হতে হবে এই রচনাটির কাছে। এই প্রবন্ধটিকে যথোচিতভাবে প্রণিধান না করে রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কেননা এটিই হচ্ছে বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের আসল ঐতিহাসিক পটভূমিকা॥

২৮ চৈত্র ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম

পরিমল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রীতি অনুসরণ করেই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, যদিও তাঁর রীতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট।

কারণ ইউরোপে প্রথম ছদ্মনাম ব্যবহার হয় রাজনৈতিক কারণে। এ রকম কোনো কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটে নি।

স্বনাম ব্যবহার যেখানে নিরাপদ নয় সেখানে ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন জরুরি। অন্যত্র, যেখানে স্বনাম প্রকাশে কোনো বাধা নেই সেখানেও অনেকক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার বিশুদ্ধ খেলার মজা উপভোগ ভিন্ন আর কিছু নয়।

আরও কতগুলি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। আদৌ লেখকের বিনয় থাকা সম্ভব। অর্থাৎ লেখাটাই তার যথার্থ নিজস্ব মূল্য পাক, লেখক ব্যক্তিটি অবান্তর।

কোনো লেখকের মনে আপন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু দাম্ভিকতা থাকতে পারে। তাঁর মনে হতে পারে লেখার মত একটি তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে নিজেকে ছোট করে লাভ কি। নিজেকে তখন এতই বড় মনে হয়, এবং লেখাটা এতই তুচ্ছ যে লেখকের নামের সঙ্গে লেখা— নিতান্তই অপমানজনক।

তা ভিন্ন আরও অনেক রকম ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। হয়তো লেখক স্বভাবতই ভীরু, বিশেষ করে নতুন লেখক। তিনি হয়তো ভাবলেন ছদ্মনামে এবং লেখক-নিরপেক্ষভাবে লেখার দাম আছে কি না দেখা যাক। দাম থাকে ভালো, না থাকলে কেউ জানতে পারল না কে পাঠিয়েছে। এ রকম সন্দেহ বা সংকোচ অনেক লেখকের থাকে, যেমন ছিল শ্রীমতী মারিয়ান এভান্‌স্‌-এর। তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস ছদ্মনামে পাঠিয়েছিলেন ব্ল্যাকউডকে, তাঁর কাগজে ছাপা চলতে পারে কিনা দেখার উদ্দেশ্যে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জন গলসওয়ার্দি প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৯৮তে তাঁর প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হয় ছদ্মনামে। তাঁর সে গল্পের বইয়ের নাম 'ফ্রম দি ফোর উইন্‌ড্‌স্‌' এবং তাঁর ছদ্মনাম 'জন সিন্‌জন'।

কিন্তু ছদ্মনাম হলেও এসব ক্ষেত্রে আসল নাম প্রকাশে বেশি দেরি হয় না। মাত্র একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম। 'জুনিয়াস' ছদ্মনামে যে সব লেখা বেরিয়েছিল ('লেটারস্‌ অব্ জুনিয়াস') তার প্রকৃত লেখক কে, তা ডিটেকটিভের মত অনুসন্ধান চালিয়েও অদ্যাবধি কেউ জানতে পারেন নি। বহু দলিল ঘাঁটা হয়েছে, বহু রকম অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু রহস্য যেমন ছিল তেমনি আছে।

লেখক নিজেই বলে গেছেন, "The mystery of Junius increases his importance"। জুনিয়াসের লেখা সত্তর খানা চিঠি লণ্ডনের 'পাবলিক অ্যাডভারটাইজার'এ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ২১শে জুন ১৭৬৯ থেকে ২১শে জানুয়ারি ১৭৭২।

নামের রহস্য লেখকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, এটা সত্য কথা। অবশ্য লেখার গুরুত্বও সেই সঙ্গে থাকা অত্যাবশ্যক। তবে অনেক ছদ্মনামই যে এখন আসল নামে দাঁড়িয়ে গেছে এ কথা সবারই জানা; যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকে তাঁর কোনো ছদ্মনামই আড়াল করে রাখে নি, এবং তিনিও সেরকম চেষ্টা করেন

নি। নইলে বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশেই যে পরিপক্ক চিন্তা এবং প্রকাশ-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা চালিয়ে গেলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন। কিন্তু মাত্র একটি রচনায় তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব বড়ই বিস্ময়ের কথা। অন্নাকালী পাকড়াশীই বা গেলেন কোথায়? তাঁরও কাব্যপ্রতিভা ছিল অসামান্য।

আজ বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সি. এল. ডজসন, মারিয়ান এভান্স্, জে. এ. থিবো, আলেক্সাই পেশকফ, ডব্‌লিউ. এস. পোর্টার, সি. এফ. ব্রাউন প্রভৃতিকে কেই বা চেনে? আজও এঁরা এঁদের এইসব নিজস্ব নামে সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে আছেন। কিন্তু এঁদের ছদ্মনাম সবারই প্রিয় পরিচিত নাম, এবং এছাড়াও যে তাঁদের অন্য কোনো নাম থাকতে পারে এ কথা কারো মনেই হয় না।

যেসব আসল নাম উল্লেখ করা হল, তাঁদের ছদ্মনাম যথাক্রমে লিউইস ক্যারোল, জর্জ এলিয়ট, আনাতোল ফ্রাঁস, ম্যাক্সিম গোর্কি, ও. হেনরি এবং আর্টেমাস ওয়ার্ড। এই নামে এঁরা সবাই পৃথিবী-বিখ্যাত। এর সঙ্গে আরও অনেক নাম যোগ করা যেত, কিন্তু প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের কথায় আসা যাক। তিনি প্রথম ছদ্মনামে লেখেন পদাবলী, ভানুসিংহের নামে। কিন্তু তিনি যে-ছদ্মনামে প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হন (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭, খ্রী. ১৮৮০), সে নামটি বড়ই অদ্ভুত। তিনি যে কবিতাটি প্রকাশ করেন তার নাম 'দু'দিন' এবং যে নাম গ্রহণ করেন তা হচ্ছে শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য।

দিক্‌শূন্য তখন উনিশ বছরের তরুণ। বাংলা নামের সাধারণত যেমন একটা অর্থ থাকে, এরও তা আছে, এবং সেইজন্যই এটি যে অর্থপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

কবি প্রথম বিলেত গিয়ে এক সময় লণ্ডনের এক স্কট-পরিবারে বাস করেন। সেই বাড়িতে স্কটের দুটি কন্যা কবির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এঁদের কথা কবি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং জীবনস্মৃতিতেও বলেছেন। সে বাড়ি এখন আর নেই, বাড়ির বাসিন্দাদেরও কোনো খবর কারও জানা নেই, কিন্তু কবির ভাষায় 'গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে'।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী প্রথম ভাগে লিখছেন—"কবির প্রতি মেয়ে দুইটি যে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পত্রধারার মধ্য হইতে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা কবুল করেন নাই। তবে দু'দিন নামক কবিতাটির মধ্যে এই ভাবটি অব্যক্ত নাই।· লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য। কবি কেন এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না।· ফুরালো দু-দিন শীর্ষক একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি কবির পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দ্র. মালতী পুঁথি: রবীন্দ্রসদন; দু-দিন কবিতাটি তাহারই সংস্কৃত রূপ। প্রথম পাঠটি ('ফুরাল দু-দিন') বোধহয় বোম্বাই-বাসকালে রচিত। এবং ইহার মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উহা প্রকাশিত হয় নাই। পরে স্কট কুমারীদ্বয়ের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন ও ভারতীতে প্রকাশ করেন।"

দু-দিন নামক কবিতাটি সন্ধ্যাসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। এ কবিতা যদি বোম্বাই-বাসকালে রচিত হয়ে থাকে তবে এর এই পরিবর্তিত রূপে তুষারপাত ইত্যাদির কথা থাকলেও তা যে সম্পূর্ণভাবে একটি বিলাতি 'মুখ' স্মরণ করে রচিত তা বলা যায় না। সব মিলে একটি জটিল মনস্তত্ত্ব আছে এর পিছনে। কোনো-একটা মুহূর্তে মনে বেদনার যে প্রেরণা উপস্থিত হয়, তা যে কোনো বিষয়কে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেতে

পারে। তার পিছনে একটিমাত্র বিশেষ উপলক্ষ থাকতেও পারে, নাও পারে। সুতরাং জোর করে কিছু বলা যায় না। যাঁরা কবি তাঁরা এ কথার মর্ম সহজে বুঝবেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে বলেছিলেন, "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত এ কথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই— কিন্তু তখন যদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।"— এ কথা অবিশ্বাস করবার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। প্রভাতকুমার লিখেছেন, "কবি দিলীপকে এই কথা যখন বলেন তখন বোধ হয় দু-দিন কবিতাটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।" এবং অন্যত্র লিখেছেন, (পূর্বে উদ্ধৃত) "পরে স্কট কুমারীদ্বয়ের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন।"

কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত দু-দিন কবিতায় দেখা যায়—

> সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
> একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা,
> একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,· ·
> শতফুল দলে গড়া সেই মুখ তার
> স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
> এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
> সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে· ·
> ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার· ·

অর্থাৎ এ কবিতায় স্কট কুমারীদ্বয়কে নিশ্চিত স্মরণ করা হয় নি। দুজনকে স্মরণ করে লিখলে একটি মুখের কথা বার-বার উল্লেখ করা সম্ভব হত কি ?

অতএব এখানে সন্দেহাতীত না হওয়াই সম্ভবত সমীচীন। কিন্তু সে যাই হোক, উদ্দিষ্টা কে, তা নিয়ে আমার ভাবনার কোনো কারণ নেই।

আমার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ শুধু ঐ একটিমাত্র কবিতা প্রকাশকালে ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন কেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে এতগুলি স্পষ্ট প্রেমের কবিতা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে ঐ একটি ভিন্ন কোনোটাতেই তাঁর ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। এবং ছদ্মনামে লেখা কবিতাটিও স্বনামে সন্ধ্যাসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে।

মনে হয়, এর প্রথম প্রকাশকালে মনে কিঞ্চিৎ ভীরুতা জন্মে থাকবে। হয়তো তাঁর নিজের মনের কাছে এ কবিতায় তিনি নিজেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ধরা দিয়ে বসেছেন বলে মনে হয়েছে। অথবা 'দিক্‌শূন্য' নাম (যার অর্থ দিশাহারা) ব্যবহারের মধ্যে নিজের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণামিশ্রিত তিরস্কার প্রচ্ছন্ন থাকাও অসম্ভব নয়। অর্থাৎ নিজেকে একটি অবিমৃষ্যকারী দিগ্‌ভ্রান্ত ছোকরারূপে দেখার মাতব্বরিটুকু উপভোগ করা।

> লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
> সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

কবিরূপে এমন স্বীকারোক্তির পরেও উক্ত লাজুক হৃদয় ছদ্মনামের আড়ালে লুকোলেন কেন, এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার কেউ নেই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ করা যায় এই যে, যে-কবিতাটিতে কবি নিজেকে দিক্‌শূন্য রূপে দেখতে চেয়েছেন, সেই কবিতাতেই আছে—

এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পূরবে ;
আর কি রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে !

অর্থাৎ দিক্‌শূন্য, অথচ তিনি যে পূব দিকে রওনা হচ্ছেন সে বিষয়ে জ্ঞান বেশ পুরোপুরিই আছে !

অতঃপর কবির ভানুসিংহরূপে আত্মপ্রকাশ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পদাবলী সন্ধ্যাসঙ্গীতের আগে রচিত কিন্তু পরে প্রকাশিত। অতএব ছদ্মনামের দিক দিয়ে ভানুসিংহের স্থান দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্যের পরেই।

এ নামেরও অর্থ আছে। ভানু— রবি। কিন্তু এ ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনে বালকোচিত দুষ্টুমি বুদ্ধি এবং সেও কিছু পরিমাণ চ্যাটারটনের অনুকরণে। এবং যদিও কবি পরে ঐ পদাবলীর বিরুদ্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ এনেছেন, তবু পাঠকেরা কিন্তু পরিণত বয়সেও সে অভিযোগ মানতে রাজি হন নি।

কবি তাঁর এই বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণকে চ্যাটারটনের মত জালিয়াতি বলেছেন, কিন্তু আসলে দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। টমাস চ্যাটারটন (১৭৫২-১৮৭০) যখন মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের বালক তখন তিনি তাঁর সময়ের প্রায় তিন শ বছর পূর্বের কবিতা-লিখনভঙ্গি অনুকরণ করে সাহিত্যসমাজে তর্কের ঝড় তুলেছিলেন। কাব্যরচনার সহজাত ক্ষমতা তাঁর ছিল অসামান্য। এ পর্যন্ত বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে। কিন্তু চ্যাটারটন তাঁর 'আবিষ্কৃত' 'প্রাচীন পাণ্ডুলিপি'গুলি যে সত্যই প্রাচীন তা প্রমাণের জন্য অনেক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সবটাই ধাপ্পা। মনে হয় এ ধাপ্পার তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ চ্যাটারটন ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, এবং তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে কবিতা লিখে কিছু উপার্জন করা সে যুগে অসম্ভব ছিল। এবং জালিয়াতি করেও তিনি যে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন নি, তার প্রমাণ তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর বাসস্থানে, অর্থাৎ এক চিলেকোঠার দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশে, নিজের লেখা যাবতীয় পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ দিক দিয়ে কোনো তুলনাই চলে না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছদ্মনামের আড়ালে পাঠকসমাজে একটুখানি আলোড়ন তোলা, একটুখানি মজা সৃষ্টি করা। এ প্রবৃত্তি নিতান্তই দুষ্টু ছেলের প্রবৃত্তি। অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর নামও একস্থানে কবি ব্যবহার করেছেন, যদিও সে-নামে কোনো লেখা আমি নিজে দেখি নি।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ছদ্মনাম বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামটি এমন একটি (মাত্র) রচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাতে পাঠকের মনে না হয় যে এটি ছদ্মনাম। তখন এর দরকার ছিল, যদিও দরকারটি খুব জরুরি ছিল বলে মনে হয় না। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি এক অনুপ্রাসমাধুর্য ভিন্ন অন্য কোনো সার্থকতা বহন করছে না। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীটি পূর্বপুরুষের, ঠিকই আছে।

বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ১৩৩৪ (১৯২৭ খ্রী.) সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার নাম 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টমসনের বহি'। নিজের সম্পর্কে রচনায় ছদ্মনাম ব্যবহার এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যায় হয় নি কিছু। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর মনে যে কোনো-রকম মজা সৃষ্টির বাসনা জাগে নি, ঐ প্রবন্ধের জরুরিত্বেই তার প্রমাণ। অতএব এ ছদ্মনাম এ প্রবন্ধের পক্ষে সংগত হয়েছে সন্দেহ নেই। হতে পারে এ লেখা মূলতঃ অন্যের, কিন্তু সেক্ষেত্রে কবি এর নিশ্চিত পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। এ লেখা যে তাঁরই এ কথা স্বীকার করতে কোনো বাধাই নেই। তবে নিজের বিরুদ্ধেও তিনি

শেষের কবিতায় একবার নিবারণ চক্রবর্তীকে খাড়া করেছিলেন, সে নিবারণ চক্রবর্তীও আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই। অর্থাৎ তাঁকে তিনি পুরোপুরি শত্রু বানাতে পারেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকেই দু ভাগ করে নেগেটিভ আর পজিটিভ -ধর্মীর মিলনে নিরপেক্ষ সাজতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য প্রস্তাব।

এডওয়ার্ড টমসন পূর্বে ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজের অধ্যাপক। বাংলা দেশে বাস করে কিছু বাংলা চর্চা করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার উদ্দেশ্যে উপকরণ-সংগ্রহ-মানসে তিনি একবার শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।

অতঃপর তাঁকে দেখা যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার লেকচারার রূপে। তার বই *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*— অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। এ বইতে বহু ত্রুটি। স্পষ্টই বোঝা যায় বাংলা-ভাষা-শিক্ষা তাঁর অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান নিয়ে এবং সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করে (মহৎ ইচ্ছা সত্ত্বেও) যেভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত গভীর ভাব এবং অতি কোমল এবং সূক্ষ্ম ভাবরসের কবিকে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যায় বিকৃত করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। প্রবাসীর ঐ প্রবন্ধটি সেই অস্বস্তিবোধ থেকেই লেখা, অথচ কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তিপূর্ণ। তাঁর মূল উদ্দেশ্য, এ কার্যে টমসনের অধিকার কতখানি তা দেখানো। অত্যন্ত সাধারণ বোধ এবং বুদ্ধির কথায় ভরা এমন মনোহর একটি রচনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই লেখা সম্ভব। অতএব এ রচনার লেখক বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিটি যে কে তা এর প্রথম প্যারাগ্রাফটি পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।—

"বাঙালীর পক্ষে বাংলাদেশের গঙ্গা শুধু তো জলের ধারা নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। জলের ধারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সেই অনেক বেশিটি অনির্বচনীয়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজন্য গঙ্গা বাঙালীর মনে প্রাণে যে বিচিত্র ও গভীর আনন্দ আনে, তাহার প্রতি আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী যে নিরতিশয় মমত্ববোধ আছে, ঠিকটি তাহার রস বোঝা এমন কোনো বিদেশীয়ের পক্ষে সম্ভবপর নয় বাঙালীকে অন্তরঙ্গভাবে যে জানে না। এই জন্য ডাণ্ডিবাসী বণিক টেমস নদীর তীরকে উৎপীড়িত ও তাহার জলপ্রবাহকে কলুসিত করিতে যে পরিমাণে সংকোচ বোধ করে, গঙ্গাতীরে তাহা করে না।"

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে কথাগুলি আরও ব্যাখ্যাত —

"ভাষামাত্রের মধ্যেই একটা আভিধানিক অর্থের এবং ব্যাকরণগত নিয়মের ধারা আছে, বিদেশী শব্দতত্ত্ববিদ্‌দের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে আর একটি ঐশ্বর্য আছে, যাহা তাহার বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি, যাহা পৃথিবীর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলের মতো, যাহার ভিতর দিয়া আলো আসে, বর্ণ বিভাসিত হয়, যাহা প্রাণকে সমীরিত করে, অথচ যাহাকে পকেটে লওয়া যায় না, সিন্দুকে ভরা চলে না, যাহাকে রক্তের মধ্যে পাই, নিঃশ্বাসের মধ্যে অনুভব করি, যাহা আমাদের প্রাণের সামগ্রী।" ইত্যাদি।

বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকভাবে এর লেখক সেজেছিলেন, একটু দূর থেকে রবীন্দ্রনাথ ও টমসন —উভয়কেই দেখার উদ্দেশ্যে। লেখাটি সেজন্য দ্বিধাসংকোচহীন সত্যভাষণে মূল্যবান হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে।

এ প্রবন্ধে যেমন রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ভঙ্গি বা ভাষা অনুকরণ করেন নি, আন্নাকালী পাকড়াশী সেজেও তাই করেছেন। ঐ লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথ যে অভিন্ন এ কথা গোপন রাখবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি তাঁর নিজস্ব ব্যঙ্গ-লিখনভঙ্গিটি বজায় রেখে।

আন্নাকালী পাকড়াশীর লেখা এই ব্যঙ্গ কবিতাটির নাম 'নারীর কর্তব্য'— বেরিয়েছিল অলকা মাসিক পত্রে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (খ্রী. ১৯৩৯), পরে 'প্রহাসিনী'র অন্তর্ভুক্ত।

'নারীর কর্তব্য' আন্নাকালী পাকড়াশী নিজে লিখলে তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এতখানি সফল অনুকরণ কি সম্ভব হত? কোনো নতুন লেখক বা লেখিকার পক্ষে এতখানি অনুকরণসিদ্ধ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

কাঠের বয়স নির্ণয়ের মতো ভাষাভঙ্গিরও বয়স নির্ণয়ের একটা উপায় আছে। লেখকের বয়স নির্ণয়ও ঐ একই উপায়ে করা যায়। কারণ লেখার ভঙ্গির একটা বিবর্তন আছে, খুব চেষ্টা করলে কিছু পরিমাণ বয়স লুকানো যায়, যেমন ভানুসিংহের পক্ষে বা চ্যাটারটনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সত্য আন্নাকালী পাকড়াশী হবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। ঐ নামের মস্‌লিন-আবরণখানির ভিতর দিয়ে পরিপক্ব কবির পাকা চুলদাড়ি দেখা যাচ্ছে।—

'নারীর কর্তব্য' আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—

> পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্র মন্ত্র মিছে
> মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
> বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ
> খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

এই চারটি ছত্রের মধ্যেই কবিকে চেনা যায়। এর পর বাকি কবিতা তো পড়েই আছে।

এর এক জায়গায় আছে—

> সন্ধ্যাবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে
> জপমালা ঘোরে হাতে।
> বউ তার চুলের জটায়
> চিরুনি আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
> পাড়া প্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
> হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
> ও-পাড়ার বোসগিন্নি; চোখাচোখা বচন বানায়ে
> স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

এ ভঙ্গি, এ ছবি, এ ভাষা, সর্বাঙ্গে লেখকের পরিচয় বহন করছে। স্বামীপুত্র-খাদনের কথাটিও গ্রাম্য ভাষার মার্জিত রূপ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা গল্পের ভাষা স্মরণ করিয়ে দেয়: "কোথা হইতে এক চক্ষু-খাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী অষ্টকুষ্ঠির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে" ইত্যাদি।

'আন্নাকালী পাকড়াশী'র মূলে নিছক কৌতুকসৃষ্টির প্রবৃত্তি। সাধারণ পাঠকপাঠিকা পড়তে গিয়ে চমকে যাবে, বলবে, 'তাই তো! এমন মেয়ে-কালাপাহাড় এল কোত্থেকে?' এ কথা ভেবে নিশ্চয় কবি মনে মনে হেসেছিলেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছদ্মনাম গ্রহণ করা নতুন কিছু নয়। তিনি তাঁর বহু নাটকে ঠাকুর্দার ছদ্মনামে, শেখরের ছদ্মনামে, অন্ধ বাউলের ছদ্মনামে, অথবা গোরা উপন্যাসে (শেষ অধ্যায়ের মোহমুক্ত) গোরার ছদ্মনামে, বারবার দেখা দিয়েছেন। এসব ছদ্মনাম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা, পাঠককে বিভ্রান্ত করার ছদ্মনাম নয়, কিন্তু তবু এগুলিকে ছদ্মনাম অবশ্যই বলা চলে। এইভাবে কখনও বা নিজের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে, কখনও বা নিজের হাতে ভিন্ন নাম সহি করার মধ্যে কবি নিজেকে দেখে মাঝে মাঝে আনন্দ পেয়েছেন।

এর কোনোটার মধ্যেই কাউকে স্থায়ীভাবে ঠকাবার মতলব তাঁর কোনোদিনই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা

অমিয়কুমার সেন

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তার সূচনায় তিনি বলেছিলেন—

"মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়টির সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি। কিন্তু, সেই নিমন্ত্রণ তো বিদ্যালয়ের দুই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।"

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে তাঁর এই ভাষণ আজকের দিনের সমস্ত মানুষের প্রতিই প্রয়োগ করা চলে। এ যুগের মহামনীষীদের মধ্যে যাঁরা সমস্ত পৃথিবীর প্রতিভূ হিসেবে মানুষের জগতে ভ্রমণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের স্থান তাঁদের মধ্যেও একক। বাইরের পৃথিবীটাকে নিজের মধ্যে ভরে আনবার সাধনায় যাঁরা জীবন ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রগণ্য। পৃথিবীর নগণ্যতম মানুষও তাঁর কাছে অপরিসীম মূল্য পেয়েছে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের মানুষকেও তিনি গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে নিকট করে তুলেছেন। মানুষের দুঃখ-বেদনার এমন নিখুঁত প্রতিধ্বনি, মানুষের অন্তরজগতের এমন নিপুণ ভাষ্য, মানুষের অগণিত সমস্যা সম্বন্ধে এমন নিবিড় সহানুভূতি, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এমন দূরদৃষ্টি, এমন সংহত আকারে আর কোথাও একটিমাত্র মানুষকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে কি না সন্দেহ। শুধু তাই নয়, মানুষের দুঃখ-বেদনা-বিফলতাকে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সফলতাকে তিনি এমন গভীর এবং ব্যাপক করে দেখেছেন যে, ভবিষ্যতে বহুদিন পর্যন্ত মানুষের যে-কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব ; তাঁর রচনা তাঁর চিন্তা আমাদের পথের সন্ধান দেবে।

আজ সামাজিক অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা মানুষকে পীড়িত করছে। অ্যাটম্‌কে বিশ্লিষ্ট করার পদ্ধতি মানুষের অধিগত হয়েছে সত্য কিন্তু অন্তরে অন্তরে দেউলে মানুষের কাছে বিশ্লিষ্ট অ্যাটমের বিরাট শক্তি পশুশক্তিরই প্রতিরূপ। পুরাণে বর্ণিত ভস্মাসুর মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পেয়েছিলেন যে তাঁর স্পর্শে মানব-দেবতা-গন্ধর্ব সকলেই ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারবুদ্ধিহীন অসুর এই অমিত শক্তিকে নিজের উপকারে নিযুক্ত করতে পারেন নি। এই শক্তির অপব্যবহার করতে গিয়ে নিজেরই মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। মানুষও আজ ভস্মাসুরের মত অপরিসীম শক্তির বর লাভ করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে এই শক্তিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করতে পারবে না ; হয়তো-বা নিজের ধ্বংসের জন্যই এই শক্তিকে সে নিয়োজিত করবে। মানুষের এই দুর্দিনে অল্পসংখ্যক যে-কটি মানুষ মানুষের জন্য অনির্বাণ বিশ্বাসের আলো জালিয়ে তার শুভবুদ্ধিকে উদ্বোধিত করতে চেষ্টা করছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের

অন্যতম। তাঁর চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাঁর দৃষ্টি দিয়ে মানুষের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হতে পারলে মানুষের বিরাট সম্ভাবনাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতি অল্পবয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ অনুভব করেছেন। বাল্যে এবং কৈশোরে এই যোগ শুধু একটা কবিত্বময় অনুভূতির আকারেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরিণত মনের কাছে এই অনুভূতি একটি গভীর বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর জীবনের পরম ব্রত মানবমৈত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিণতির ইতিহাসও বিস্ময়কর।

মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে। অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র রবীন্দ্রনাথ; তবু সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের প্রতি যে গভীর দরদ তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা নেই। এই সহানুভূতি তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মানুষের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। এই গভীর শ্রদ্ধার পরিণতি হিসেবেই তিনি ধনী দরিদ্র জাতি বর্ণ এবং দেশকাল-নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরম মূল্য দেবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কর্মবিভাগের প্রয়োজন এবং ধনতান্ত্রিক সুবিধার দিক দিয়ে তিনি কোনো সময়ে ভারতবর্ষের বর্ণবিভেদের পক্ষ সমর্থনও করেছিলেন, কিন্তু বর্ণবিভেদের বিপক্ষে তাঁর সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল এই কারণে যে, এই সামাজিক রীতি মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিপন্থী। এই বাধাকেই মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের সবচেয়ে বড় অপমান বলে মনে করতেন। বর্ণবিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে যে-সব অভিযোগ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তাই একদিন তাঁর লেখায় নিঃসৃত হয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে এই সামাজিক ব্যাধির পরাজয়ের সূচনা করেছিল। এ পাপ যে ভারতবর্ষ থেকে কিছু পরিমাণেও দূরীভূত হয়েছে তার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভারতবর্ষের বর্ণভেদের প্রতি সচেতনতার ফলে পশ্চিমের দেশগুলিতে নূতনতর বর্ণভেদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক বিভেদ এবং জাতিবৈর পশ্চিমের আধুনিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। ভারতবর্ষের বর্ণভেদের প্রতি যেমন, আধুনিক ইউরোপীয় বর্ণভেদের প্রতিও তেমনি যুক্তি এবং নীতির দিক দিয়ে তিনি কঠোর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে ততটা ছিল না যতটা ছিল মানুষের ব্যক্তিত্বের দিক থেকে। শুধু প্রবন্ধে নয়, বহু নাটকে এবং কাব্যেও তিনি পশ্চিমের আধুনিক সভ্যতার ব্যক্তিত্বনাশী দিকটির প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। মুক্তধারা রক্তকরবী ইত্যাদি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যন্ত্রযুগের কল্যাণকর দিকটির প্রতি তিনি যে অন্ধ ছিলেন তা নয়; কিন্তু যন্ত্র যেখানে মুখ্য হয়ে উঠে ব্যক্তিকে গ্রাস করে ফেলে সেখানকার যান্ত্রিকতাকে তিনি ক্ষমা করেন নি।

জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি এবং শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ইউরোপ বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ উন্নতির প্রায় অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সে পেয়েছে অন্যান্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধা। উন্নতিলাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে যে অকল্যাণকর প্রতিযোগিতা চলেছে, তার ফলে পশ্চিমের দেশগুলি ক্রমশই অন্তরের দিক থেকে একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, যে দেশগুলি বিজ্ঞানের উন্নতির আলোক পায় নি তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ইউরোপের জাতিদের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। অন্য জাতির প্রতি এই বিদ্বেষ

এবং অশ্রদ্ধা সভ্যতার পরম শত্রু। এই শত্রু ইউরোপের দেশগুলিকে অধিকার করে প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যেও জাতিবিদ্বেষের বিষ বহুলপরিমাণে সঞ্চারিত করেছে।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ একটি সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। সেটি হল এই যে, ভারতবর্ষ যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল তখনও সে অন্য জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ পোষণ করে নি। যেসব জাতি ভারতবর্ষকে পদানত করার অভিপ্রায় নিয়েও এদেশে এসেছিল তাদেরও ভারতবর্ষ পর বলে শত্রু বলে দূর করে দেয় নি। তাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্তম উপাদানগুলি নিজের জীবনযাত্রায় গ্রহণ করে ভারতবর্ষ পরকে আপন এবং শত্রুকে মিত্র করে নিয়েছে। পশ্চিমের আধুনিক উন্নতির ইতিহাসে এই গুণটির একান্ত অভাব। সর্বমানবের মৈত্রীর পথে এটি একটি প্রকাণ্ড অন্তরায়। সর্বজাতির মিলনের যে মহাস্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তার তুলনা মানুষের সমগ্র ইতিহাসে বড় বেশি নেই। সে-মিলন শুধু সম্পূর্ণ হতে পারে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের দ্বারা। কোনো জাতি যদি আপনার উন্নতির অভিমানে এই কথা মনে করে যে তার অন্য জাতির কাছ থেকে গ্রহণ করার মত কোনো কিছুই নেই, তবে অন্য জাতিকে দান করার অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হবে। আবার অন্যদিকে জাতীয় দুর্দিনের পঙ্কে নিমগ্ন কোনো জাতি যদি নিজেকে হীন মনে করে, যদি ভাবে অন্যজাতিকে দান করার মত কোনো পুঁজিই তার নেই, তবে অন্য জাতির থেকে যে-দান সে গ্রহণ করেছে তাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিক্ষাসংস্কৃতির পণ্য শুধু আমদানী বা শুধু রপ্তানী করা চলে না। আমদানী এবং রপ্তানী, দেওয়া এবং নেওয়া, একই সঙ্গে চলতে থাকে। যে-কোনো একটি বন্ধ হয়ে গেলেই অন্যটি বিফল হয়। আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বাণিজ্যকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহারিক পণ্যের বাণিজ্যের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান্ মনে করতেন। ১৯৩০ সনে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তিবাদী সম্মেলনে প্রেরিত তাঁর একটি বাণীতে এই চিন্তাটি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—

"The human world is made one, all the countries are losing their distance every day, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a world-wide commerce of heart and mind, sympathy and understanding and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of individual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness."

এক জাতির মানুষের প্রতি আর-এক জাতির মানুষের বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ ব্যথিত করত তার পরিচয় আছে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিতর্কের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ শেষ পর্যন্ত ইংরেজ জাতির প্রতি ভারতবর্ষের অসহযোগ এবং বিদ্বেষে পরিণত হবে। গান্ধীজিকে তিনি তাই বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজিও প্রত্যুত্তরে এই সাবধানবাণীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যের আহ্বান বা Call of Truth নামক প্রবন্ধে সংকীর্ণ-জাতীয়তার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের জাতীয় উদ্বোধন বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের অঙ্গ হবে—

"আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার-অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ভাবের যোগ্য সাড়া দেওরার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ।"

মহাত্মা গান্ধী এই প্রবন্ধের উত্তরে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি Great Sentinel বা মহাপ্রহরী আখ্যা দিয়েছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের সম্পর্কেই যে রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রহরীর কাজ করেছেন তা নয়। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মহাপ্রহরীর ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পন্থা ছিল মানুষের প্রতি মানুষের অপমান দূর করে, জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধা অপসারিত করে সমগ্র মানবজাতিকে এক নূতন জগতের দ্বারে উত্তীর্ণ করে দেওয়া।

জাতিবিদ্বেষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন যে বর্তমানে প্রাচ্যের জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্য এবং প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্ত্যের জাতিসমূহের মধ্যে জাগতিক উন্নতি থেকে জাত আত্মাভিমান এবং অবিনয়ই এর মূল কারণ। এই দুটি মূল কারণের প্রতি জাতিপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। বহুবার পৃথিবী-পরিক্রমার পথে পথে তিনি এই কারণগুলি দূর করার জন্য সক্রিয় এবং একক প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির সূচনা তাঁরই কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত ছিল। প্রাচ্যের দেশগুলি পরিভ্রমণ করার সময় তিনি তাঁদের বিস্মৃত প্রাচীন ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের সকলের মধ্যেকার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করার প্রয়াসী হয়েছেন। কারণ নিজস্ব ঐতিহ্যে বলীয়ান না হলে প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানবাহিনী সভ্যতা তাঁদের কাছে সর্বগ্রাসীরূপে প্রতিভাত হবে। অপর পক্ষে পশ্চিমের দেশগুলিতে গিয়ে তিনি এ কথাই প্রচার করতে চেয়েছেন যে, পশ্চিম যেন না মনে করে যে পূর্বদেশের থেকে গ্রহণ করার মত তার কোনো কিছুই নেই। পশ্চিমের আছে জ্ঞান, পূর্বের আছে বিজ্ঞতা। জ্ঞানকে বিজ্ঞতার বিনয়ে পরিশোধন না করলে জ্ঞান একদিন মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের এই স্বপ্ন সফল করার জন্যই তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ হল, To study the the mind of man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view,· · সমস্ত পৃথিবীকে তিনি শান্তিনিকেতনের নীড়ে আমন্ত্রণ করে এনে বিশ্বমানবমৈত্রীকে সফল করতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্রকে (সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায় বা সু-বাবু) তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের প্রাঙ্গণ থেকে লেখা একটি চিঠিতে যে-আহ্বান পাঠিয়েছিলেন, সে আহ্বান সমগ্র বিশ্বের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হবার যোগ্য।—

"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটি মাত্র

দেশ আছে, সে হচ্ছে বসুন্ধরা; একটি মাত্র নেশন আছে, সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন পৃথিবীর উদয়গিরির কাছে, সেখান থেকে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করছি। তারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর— হৃদয়কে উন্মুক্ত কর।"

রবীন্দ্রনাথ মানবমৈত্রীর উপায় হিসেবে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের গুরুত্বকে স্বীকার করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যা বুদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সহযোগিতা। অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্বার্থপ্রণোদিত, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রকে স্বার্থকলুষিত করে নি। এদের সহযোগে মিলনই প্রকৃত মিলন। তাঁর 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধে তিনি এই বাণীই প্রচার করেছেন। যদি মানুষের মিলন এবং সহযোগিতাকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে হয় তবে মানুষের শুভবুদ্ধিকে হৃদয়াবেগ এবং স্বার্থের উর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে।

বহু যুগ আগে আর-এক মহামানব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনি চরম মূল্য দিয়েছিলেন, তিনি বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথও মানবমৈত্রীর যে-পথের কথা বলেছেন তাতেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকেই সবার উপরে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এঁদের যুক্ত-সাধনা পথভ্রান্ত মানুষকে পথের সন্ধান দেবে, একদা সর্বদেশের এবং সর্বকালের মানুষের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্র রচিত হবে, আজকের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ এই কামনাই করুক।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি

শান্তিদেব ঘোষ

ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি ছিল গ্রাম। এইখানেই প্রাণের নিকেতন। মনুষ্যত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত ছিল। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা না ছিল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রগত পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। এমনি ভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে-গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি। তখনকার সমাজ বিদ্যার যে-কোনো বিষয়কেই শিক্ষণীয় রক্ষণীয় ব'লে জানত। শিক্ষার বিশেষ চর্চা ছিল টোলে চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমনকি, যেসকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। যাত্রাগানের পালায়, বাউল-বৈরাগীদের গানে, কথকতায় শোনা যেত দেহতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব। তারই সঙ্গে থাকত নাচ-গান-কৌতুকের দ্রুত মুখরিত ঝংকার। বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ ইত্যাদি কাহিনী। এ ছাড়া গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার ব্রত পার্বণ পূজা জন্ম মৃত্যু ও বিবাহাদি উৎসবের মাধ্যমে নানা প্রকার শিল্প ও নৃত্যগীতবাদ্য ছিল স্বতউৎসারিত। গ্রামে-গ্রামে মন্দির তৈরি হয়েছে, তা আজ ভগ্নপ্রায় হলেও তার স্থাপত্য ও পোড়ামাটির শিল্পকলার উৎকর্ষ আজও আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। এ সবের শিল্পীদের বাস ছিল গ্রামে। গ্রামসমাজের প্রতিদিনকার ব্যবহৃত বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্যে আমরা সে যুগের একটি অতিউন্নত শিল্পরুচির প্রকাশ দেখি।

তখনও দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন-একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয় উজ্জ্বল করেছে।

গ্রামসমাজের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল স্বৈচ্ছিক। তার পিছনে কোনো আইন ছিল না, বাইরের কোনো তাগিদ ছিল না। তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে-ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হয় সর্বদেহে। এই ভাবে গ্রামবাসীরা কর্মে ও কৃষিকাজের সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দের আবেষ্টনে গ্রামগুলিতে সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ প্রাণবান আবহাওয়া রচনা করতে পেরেছিল।

কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন গ্রামসমাজের যে চিত্র আমরা আজ আঁকি প্রকৃতপক্ষে গ্রামগুলি নাকি সেইরূপ ছিল না। জাতিভেদ ও সর্ববিষয়ে কূপমণ্ডুকতার দূষণীয় মনোভাব আঁকড়েই গ্রামসমাজ কোনো রকমে বেঁচে ছিল; অর্থাৎ সে সমাজ ছিল প্রবাহহীন বদ্ধ জলাশয়ের মত দূষিত। এ কথার সত্যতা ইংরেজ-যুগের গ্রামগুলির অবস্থা দেখে আমরা হয়তো স্বীকার করে নিতে পারি। কিন্তু তার পূর্ববর্তী

যুগের গ্রামসমাজের পক্ষে তা সত্য বলে মানতে পারি না। মুসলমান-যুগের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ধাত্রীভূমি যে ছিল গ্রাম, এ কথার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে ইচ্ছা করি।

ভারতীয় সভ্যতা মূলে চিরকালই ধর্মকেন্দ্রিক। ভারতীয় সমাজকে অতি প্রাচীনকালে চালনা করেছেন বর্ণাশ্রমের মুনিঋষিরা। বৌদ্ধযুগে করেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বৌদ্ধবিহার নামক বড় ও ছোট শিক্ষাকেন্দ্রগুলি; মধ্যযুগে করেছেন হিন্দু ও মুসলমান সন্ত ও সুফী সাধকেরা, বড় বড় তীর্থকেন্দ্রের গুরুরা। ইংরেজ-যুগে সমাজকে চালনা করেছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই প্রায় কোনো-না-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের গুরু বা ধর্মমতের প্রকৃত ভক্ত। যার শেষ উদাহরণ এ যুগে হলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। দেখা গিয়েছে যে, ধর্মাত্মা মহাপুরুষেরা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকে চালিয়েছেন; সমাজের নানা সমস্যার সুরাহা করবার চেষ্টা করছেন। ইরেজপূর্ব যুগ পর্যন্ত প্রায় সব ধর্মাত্মাই ছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতির সৃষ্টি। এঁদের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামের পরিবেশে। একমাত্র বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন নগরে, বড়ও হয়েছিলেন সেই আবহাওয়ায়। কিন্তু তাঁকে সেই শহরের আবহাওয়া থেকে পালিয়ে যেতে হল গ্রামাঞ্চলে। তিনি নিজে তাঁর সাধনার প্রচার করলেন গ্রামে ও তীর্থে যা ছিল উচ্চস্তরের সাধনার কেন্দ্র। ধর্মকে কেন্দ্র করেই নানা শিল্পকলা সংগীত নৃত্য অভিনয়ের চর্চা হয়েছে প্রাচীন যুগে, গ্রামে-গ্রামে। তাই সে যুগে রাজাদের আনতে হত জ্ঞানী গুণী ও শিল্পীদের নিজেদের দরবার সাজানোর জন্যে গ্রাম থেকে। কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামের কবি। তিনি গৌড়েশ্বরের দরবারে যখন গেলেন তখন তাঁর নাম কবি হিসেবে গ্রামসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাম যদি কূপমণ্ডুক হত তাহলে গ্রামের কবি চণ্ডিদাস লিখতে পারতেন না 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। চৈতন্যদেবের জন্ম গ্রামে, শিক্ষা তীর্থক্ষেত্রে, ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র তীর্থে ও গ্রামে। অদ্বৈতবাদী ধর্মপ্রচারক শংকরাচার্যের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামে, তার প্রচার রাজধানীতে নয়, তীর্থে ও গ্রামে। ভক্তিমার্গের গুরু মাধবাচার্যের জন্ম ও কর্ম গ্রামে। আসামের বৈষ্ণবাচার্য শংকরদেব জন্মেছিলেন গ্রামে, তাঁর প্রচারস্থান মঠগুলিও ছিল রাজাদের রাজধানীর বহু দূরে, তিনি নৃত্য গীত অভিনয় ও চিত্রকলার প্রচার করেছিলেন ঐ মঠের সাহায্যে গ্রামের শিল্পীদের দিয়ে। কবীর নানক প্রভৃতি সন্তদের আবির্ভাব গ্রাম থেকে, গ্রামই ছিল এঁদের কর্মস্থল। ধর্মনেতারা যুগের প্রয়োজন সাধনের জন্যেই এসেছিলেন। গ্রামসমাজের সাহায্যেই তাঁদের কাজ এগিয়েছিল।

এইভাবে বিচার করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রাচীন গ্রামসমাজের যে চিত্র গুরুদেব এঁকেছেন এ নিছক ভাববিলাস বা প্রাচীনের প্রতি মোহবশে নয়। সে সমাজ জীবন্ত ছিল বলেই যখন যেভাবে যুগের প্রয়োজনে তার পরিবর্তন দরকার হয়েছে তখনি বিনা দ্বিধায় তা করেছে। মুসলমান-যুগের শেষ পর্যন্ত এই ছিল গ্রামজীবনের প্রকৃত স্বরূপ। প্রথম বাধা পেল যখন থেকে ইংরেজরা নগরকে কেন্দ্র করে তাদের সভ্যতাকে ভারতের উপর আরোপ করল। নতুন সভ্যতার সঙ্গে যোগ রক্ষার সুযোগ না পেয়ে স্থাণুবৎ হয়ে রইল গ্রামগুলি। এত যুগ ধরে যা পেয়েছিল তাকে কোনো মতে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা ছাড়া গ্রামের যেন আর কোনো কাজই রইল না।

ইংরেজ-শাসনের যুগে শহরে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে দেখা গেল গ্রামগুলি শহরকে চারিদিকে যদিও ঘিরে আছে তবু শত যোজন দূরে। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে শহরবাসী আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি

ছোটলোক, ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোট। ছোটরা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল ; অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনাই অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না। মোট কথা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা মান সেই সব লোকের সঙ্গে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের দেশ এক নয়। গ্রামের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই। ওরা ছোটলোক ; আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে ক'রে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নানা আন্দোলন চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই— কেননা তাতে পরীক্ষা পাসের মার্কা মেলে না। এই কারণেই— দেশ থেকে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দের প্রবাহ ক্ষীণ, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল ; ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর করে তুলছে।

উপরের কথাগুলি গুরুদেবই বলেছিলেন। বলতে পারার কারণ হল, বারো বৎসরের উপর একটানা পূর্ববাংলার পল্লী-অঞ্চলে বাস ও পল্লীর সমাজব্যবস্থা স্বাস্থ্য অর্থ শিক্ষা ও তার আনন্দের জীবনের সঙ্গে ভালোবাসার দ্বারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ। সেই পরিচয়েই ইংরেজ সভ্যতা ভারতের নগরসমাজ ও গ্রাম-সমাজের কতখানি ক্ষতি করেছে সহজেই তা তিনি বুঝতে পারলেন। ভাবতে লাগলেন উপায়। এবং বুঝলেন যে, এ যুগের বিদেশী সভ্যতা যতই উজ্জ্বল বা নিজেদের দেশের পক্ষে যতই প্রাণবান হোক-না কেন, আমাদের দেশে তার অনুকরণ বৃথা হয়েছে। আমরা তাদের সাজ পরেছি, বুলি শিখেছি, কিন্তু খাঁটি ইংরেজ বনে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ইংরেজ জাতির চরিত্রের গুণগুলির কিছুই আমরা নিতে পারি নি। ভাবলেন, যে সমাজব্যবস্থার প্রভাবে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল সেই দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। নতুন যুগের সভ্যতা গড়ে তোলবার কথা চিন্তা করেই শহরবাসী ভদ্র-লোকদের ডাক দিয়ে 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) ও 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) বক্তৃতার মাধ্যমে বলেছিলেন গ্রামের দিকে ফিরে তাকাতে, তার হৃদয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করতে। শিক্ষায় স্বাস্থ্যে ধনে মানে গ্রামবাসী যতই ক্ষুদ্র হোক-না কেন তাদের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত স্বরূপটি এখনো বেঁচে আছে। সেইখানেই আসল ভারতবর্ষ। বলেছিলেন, নগরের মুষ্টিমেয় ভদ্রসমাজই একমাত্র ভারতবর্ষ নয়। যদি দেশের মুক্তিসাধন করতে হয় তবে পল্লীসমাজের আত্মশক্তিকে জাগাতে হবে। গ্রামকে অবহেলা করে নয়, তার সঙ্গে ভালোবাসার দ্বারা এক হয়ে। শহর ও গ্রাম সকলেই যেন এক হয়ে বলতে পারে— আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচতে চাই না, আমাদের যা প্রয়োজন আমরা নিজেদের শক্তিতেই তা গড়ে নেব। দেশনেতারা তাঁর পরামর্শ বুঝি গ্রহণ করলেন না। কিন্তু গুরুদেব নিজে দেশবাসীকে উদ্দেশ করে যখনই যা বলেছেন সে কথা দেশ গ্রহণ করল কি না-করল তার অপেক্ষায় তিনি কখনো বসে থাকেন নি। নিজে হাতে-কলমে কাজ করে সেই চিন্তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। এ পথেও তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন একলা গুটিকতক অনুরাগী সহচর নিয়ে নিভৃতে, পূর্ববাংলার পল্লীতে। ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ যে পদ্ধতিতে ঘটেছিল, স্থির করলেন, সেই প্রকার একটি আদর্শ কেন্দ্র ভারতের কোথাও তাঁকে গড়তে হবে— যা হবে ভারতীয় সাধনার বিকাশ-কেন্দ্র, প্রাচীনের অন্ধ অনুকরণ

নয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ একটি চিন্তা থেকেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের উদ্‌ভব। এবং এ দুইয়ের সমষ্টি হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ইংরেজ-যুগে প্রবর্তিত স্কুলকলেজের রুটিন ও সিলেবাসের সাহায্যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত। শহরের প্রয়োজনে তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হল না। কিন্তু ছাত্রছাত্রী ও কর্মী-সমাবেশে যে এক মানবসমাজ বিশ্বভারতীতে দেখা দিল তার জীবনধারার প্রতি একবার ধীর ভাবে সকলে চেয়ে দেখতে পারেন। এখানে বিভিন্ন জ্ঞান কর্ম মানবসেবা ও নানা প্রকার আনন্দচর্চার যে সম্মিলিত পরিবেশ রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আপনা থেকেই এ সমাজ নানা দিকে শক্তি সঞ্চয় করে। নিত্য চেষ্টা হচ্ছে নিজের প্রয়োজনের সব-কিছুই যেন নিজের চেষ্টায় মেটাতে পারে। এবং তা যেন হয় স্বেচ্ছিক। তিনি চেয়েছিলেন, স্কুলকলেজের পড়া ছাড়াও এখানকার নানাপ্রকার সভাসমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চা নানা শাখায় এই সমাজে বিকশিত হয়ে উঠুক, বিচিত্র পথে কর্মের সাধনা সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাক, আনন্দের আয়োজন বিচিত্র পথে বিস্তারিত হয়ে এই সমাজ ভারতের কাছে দৃষ্টান্তরূপে খাড়া হোক। তাঁর এই চিন্তা ভারতের ইংরেজ-যুগে প্রবর্তিত সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া নয়। কোনোদিক থেকেই সে সমাজের সঙ্গে এর মিল নেই। পুরাতন গ্রামীণ সমাজের যে চিত্র তিনি মনে এঁকেছিলেন এ হল তারই রূপান্তর। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। বিশ্বভারতী গড়ে উঠেছে প্রকৃত দেশজ আদর্শকে অবলম্বন করে। গুরুদেব যে কেবল ভাববিলাসী কবি নন, সত্যকার দেশপ্রেমিক কর্মী এর দ্বারাই তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করে গেলেন।

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ভদ্রসমাজের বিশ্বাস ছিল— পল্লীজীবন মৃতপ্রায়, পূর্বের মত সচল প্রাণপ্রবাহ তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পক্ষে নতুন যুগকে সাহায্য করা বা নতুন যুগের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই চিন্তার প্রতিবাদ কার্যকরভাবে প্রথম গুরুদেবই করলেন। এবং প্রমাণ করে দেখালেন যে এখনো গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে পারলে সমগ্রভাবে এ যুগের ভারতবর্ষ লাভবান হবে। এই কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করছি।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল মেলা। ভারতের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেসব জায়গার প্রধান উৎসবে এইরূপে মেলাকে স্থান দিয়েছেন বলে শুনি নি। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী একক। এই মেলা-প্রচলনের ধারণা গুরুদেব পেয়েছিলেন আমাদেরই এই দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত মেলাগুলি দেখে ও তার কথা শুনে। 'মেলা' যুগে যুগে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে যে কত দিক থেকে সমৃদ্ধ করে এসেছে তা বুঝেই তার কথা বলেছিলেন স্বাধীনতাকামী দেশনেতাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' নামে লিখিত ভাষণে। তাঁরই ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রধান দুটি উৎসবসূচীর প্রধান অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে মেলা। 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোক'দের মিলনের ক্ষেত্র রচনা করে জ্ঞান কর্ম ও আনন্দের আদানপ্রদান করে যাচ্ছে এই মেলা। 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় মেলাগুলিকে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বড় উপায় হিসেবে সাজাবার যে প্রস্তাব গুরুদেব করেছিলেন, বিশ্বভারতীর এই মেলা দুটি সেই আদর্শেই গঠিত হয়ে কতখানি কার্যকর হয়েছে আজ আমরা তা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি।

গুরুদেবের গানের কথা সকলেই জানেন। এদিক থেকে দেশকে তিনি দিয়ে গিয়েছেন অনেক। তাঁর এই বিরাট সৃষ্টির পথে যে দুটি প্রাচীন ভারতীয় সংগীতধারা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল তার একটি হল ভারতের উচ্চাঙ্গ হিন্দি সংগীতের আর দ্বিতীয়টি হল বাংলার পল্লীসমাজে প্রচলিত নানা প্রকার সহজ সরল গান— যার মধ্যে বাউল সম্প্রদায়ের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাবে ভাষায় সুরে ও ছন্দে বাউলদের গানের প্রভাব গুরুদেবের গানে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়া নতুন পথেও গুরুদেবের গান এগিয়ে গেছে এই সম্প্রদায়ের গানের সাহায্যে। নাটকে এই বাউলদের জীবনকে খাড়া করলেন আদর্শ চরিত্র হিসেবে। তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবনে যে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল তার কথাও আমাদের অজানা নয়।

বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান সভাসমিতির সাজসজ্জার একটি বিশেষ ধারা আছে। সেই সজ্জার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে আলপনা। এ শিল্পচর্চা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যুগে-যুগে চলে এসেছে। এর প্রাণশক্তিকে গুরুদেবই প্রথম অনুভব করলেন এ যুগে। এবং বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব ও সভাসমিতিকে এই আলপনা দ্বারা সাজানোর জন্য উৎসাহিত করলেন। শিল্পাচার্য নন্দলালের নেতৃত্বে সেই অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামীণ শিল্প আজ দেশের প্রায় সর্বত্র পরিবেশিত।

এ যুগের শিক্ষিত সমাজের নৃত্য-আন্দোলনের গুরু হলেন গুরুদেব স্বয়ং। তাঁর এই আন্দোলনের পিছনে নানা দেশের পল্লীসমাজের সহজ সরল নাচের প্রভাব আছে। বাংলার বাউলদের নাচের আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে 'ফাল্গুনী'তে (১৯১৬) অন্ধ বাউলের চরিত্র রচনা করে সেই চরিত্রের অভিনয় করলেন তিনি নিজে। নাচে গানে ও অভিনয়ে গুরুদেব দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

'রাঁয়বেশে' নাচ যখন নতুন করে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হল তখন আমাদের শেখাবার জন্যে গুরুদেব 'রাঁয়বেশে' নর্তকদের আনালেন। নাচ হিসেবে এ হল পুরুষদের অতি সাধারণ দলবদ্ধ নাচ। কিন্তু গুরুদেবের দৃষ্টিতে তার মূল্য ধরা পড়েছিল।

তিনি বললেন, বাংলার গ্রামাঞ্চলের যাত্রা তাঁর ভালো লাগে। তার একটি বড় কারণ হল যাত্রার চিত্রপটহীন মঞ্চ। চিত্রিত দৃশ্যপট যে নাটকের অভিনয়ে না হলেও চলে এ চিন্তা গুরুদেবের মনে জাগে এই যাত্রা দেখে। বিশ্বভারতীতে তাঁর নাটকের অভিনয়ে চিত্রিত দৃশ্যপটের ব্যবহার তাই তিনি তুলে দিলেন। তাঁর নাটকে কথার সঙ্গে বহুলপরিমাণে গান যোজনার রীতিটি তিনি গ্রহণ করলেন যাত্রা থেকে।

এই ভাবে গুরুদেবের প্রেরণায় পল্লীসংস্কৃতি বিভিন্ন দিকে প্রবল শক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পেয়ে প্রমাণ করল যে সে রক্ষণশীল নয়, সেও জানে যুগের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে।

এই পথে আমরা যদি না যাই, তাদের কাছে উপস্থিত হই শহরের ভদ্রলোকরূপে কেবল উপদেশবাক্য দানের উদ্দেশ্যে, তবে এতদিন তারা আমাদের যেমন দূরের মানুষ বলে জেনেছে আজও তাই জানবে। মনে করবে, তারা ছোটলোক, তাদের সব কিছুই ছোট। এই মনোভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সুযোগ পেলেই তারা চেষ্টা করবে তাদের ছোটলোকত্ব দূর করে ভদ্রলোক হতে। এবং নিজের সমাজকে ভুলতে ও অবহেলা করতে।

এমন অনেক পল্লীবাসীর কথা জানি যাঁদের পূর্বপুরুষ বংশপরম্পরায় নিজেদের সমাজের প্রয়োজনে নৃত্য গীত, অভিনয় ইত্যাদি নানা কলার চর্চা করে এসেছেন, কিন্তু তাঁদেরই এ যুগের বংশধরেরা স্কুলকলেজের

শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে, গ্রামে ফিরে নিজেদের উৎসবাদিতে অন্যদের সঙ্গে একত্রে নাচ গান ও বাজনায় যোগ দিতে লজ্জা বোধ করেছেন। স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি। চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখে হাল-লাঙল ধরতে লজ্জা পায়, এ ঘটনা আমরা সর্বদাই দেখছি। সাঁওতাল-সমাজের ছেলে বর্তমানে শহরে বিদ্যালয় থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখে বিদ্যালয়ের ছুটির দিনে নিজের বাপ-মার কাছে যেতে চায় নি, এমন ঘটনাও ঘটেছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে আমরা দরিদ্র পল্লীবাসীর সেবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাতে কোথাও গলদ আছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে, পল্লীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে যদি এ কাজ করা হত তবে তার ফল হত অন্যরকমের। নিজেদের ছোট করে ভাববার যে সংস্কার গত প্রায় দু শতাব্দী ধরে তাদের মনে বসে গিয়েছে সেটিকে দূর না করা পর্যন্ত কাজ সফল হবে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, গ্রামের আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য ভদ্রলোক-সমাজ নিজেরাই নাচ গান ও অভিনয়ের আসর সাজান, গ্রামে গ্রামে। জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে এ ধরণের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রাণের যোগ এর দ্বারা ঘটে না। কারণ তারা ছোট হয়ে ভদ্রলোকের জিনিস দেখছে।

গুরুদেবের গান এদের মধ্যে প্রচার করার কথা উঠেছে। কিন্তু এই গান যদি গ্রামের সামনে আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে উপস্থিত হয় তবেই সর্বনাশ। গুরুদেবের গান উচ্চস্তরের, তবুও গুরুদেবের মত সেও চায় গ্রামের গানের সঙ্গে এক-মাটিতেই বসতে। পংক্তিভোজনে যেন তাকে যোগ দিতে দেওয়া হয়। এর জন্যে আলাদা করে টেবিল-চেয়ার এনে পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা যেন না হয়।

শহরের নবপ্রবর্তিত কিছু কিছু উৎসব গ্রামাঞ্চলে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু যাঁরা সে কাজে নিযুক্ত তাঁরা গ্রামে প্রচলিত উৎসবগুলিকে তেমন মর্যাদা দেন না। সে সময়ে তাদের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকবারই তাঁরা চেষ্টা করেন। এর জন্যেই নবপ্রবর্তিত উৎসবগুলিকে গ্রামবাসীরা যে খুব আপনার করে নিতে পারছে তা মনে হয় না। এখনো পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি তা হয় নি। ভদ্রলোকদের খুশি করবার জন্যে সন্তোষ জানিয়েছে তারা, ধন্যবাদ জানিয়েছে ভদ্রতা করে। কিন্তু আপনার করে নেয় নি।

বিচিত্রা-পর্ব স্মৃতিকথা

সুকুমার বসু

একালের অনভিজ্ঞ পাঠক আর উত্তরকালের কৌতূহলী পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানকালের বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করি।

'বিচিত্রা'র জন্ম এবং তার স্বল্পপরিসর অথচ অসামান্য প্রদীপ্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। এই স্থানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ, যে-দিন আদিব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে সেখানে প্রথমবার যাই। সে আজ ৪৭ বছর আগেকার কথা।

মধ্য-কলকাতায় চিৎপুর রোডের এক জায়গা থেকে পূব দিক দিয়ে একটা হ্রস্ব রুদ্ধ পথ বার হয়ে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পড়ে প্রকাণ্ড একটা ফটক। পথটার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের— কী? লেন না স্ট্রীট? আগেও ছিল লেন, আজও আবার সেই লেনই। কিন্তু একটা সময়ে, যখনকার কথা আজ বলছি, তার নাম হয়েছিল 'স্ট্রীট'। [আমন্ত্রণলিপির ছবি দ্রষ্টব্য। এ গলিকে সে সময়ে স্ট্রীট নামে গৌরবান্বিত করার কারণ হয়তো এই যে, তখন এখানে ব্রিটিশরাজের দ্বারা সম্মানিত 'নাইট' উপাধিধারী সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাসস্থল ছিল। এ সম্মানের বোঝা তিনি চার বছরের বেশি বহন করতে পারেন নি। তবু স্ট্রীট নাম যে ১৯২৭ সালেও ছিল তার প্রমাণ আছে ঐ সময়ে আমার কোনো আত্মীয়াকে লেখা তাঁর একটা চিঠির উপরকার ছাপানো হেডিং। কবি ১৮৯০ সালে তাঁর 'ছোট বৌ'কে Paris থেকে যে পোস্টকার্ডখানা লিখেছিলেন তাতে কিন্তু ঠিকানা লিখেছিলেন 6 Dwarkanath Tagore's Lane.]

ফটক দিয়ে প্রবেশ করে পড়তে হয় একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, যার তিন দিক বেষ্টন করে আছে বড় বড় বাড়ি। সামনেরটি পুরাণো ধরণের তৈরি বৃহৎ এক অট্টালিকা—৬ নম্বর ভবন; ডান দিকের ত্রিতল অট্টালিকাটির নম্বর ৫।

কলকাতা শহরে চিৎপুরের মত কোলাহলপূর্ণ জনবহুল অঞ্চলের মাঝখানে সহসা প্রাচীরবেষ্টিত নিস্তব্ধ ও নির্জন সেকেলে জমিদারবাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করে সেদিন মনে একটা বিস্ময়ের ভাব এসেছিল, তা আজও মনে আছে।

সামনের ৬ নম্বরের গৃহই কবি রবীন্দ্রনাথের বাস্তুভিটা, তাঁর জন্মস্থান, শৈশব ও যৌবনের আবাসস্থল, সারাজীবনের নিবাস ও ঠিকানা। বাড়ির একতলার সামনের প্রবেশদ্বার ভূমিসংলগ্ন, ভিতরে গেলে চক-মিলানো ঠাকুরদালানের উঠোনে গিয়ে পড়তে হয়, উপরটা খোলা, উৎসব আর অভিনয়াদির সময়ে চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। ১১ই মাঘের উপাসনাও এইখানে হত, সন্ধের সময়। আদিব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করতেন বলে বহুলোক তাতে যোগ দিতে উৎসুক হত। কিন্তু স্থান তো সংকীর্ণ, তাই হট্টগোল নিবারণের জন্যে যত জনকে স্থান দেওয়া সম্ভব কর্তৃপক্ষ ততসংখ্যক প্রবেশপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করতেন।

প্রবেশপত্র পেতে বেগ পেতে হয় নি। তখন আমাদের ছাত্রজীবন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার

সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীচারু রায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ছবি শিখতে যেতেন। সেই কালেই তাঁর আর্টিস্ট বলে নাম হয়েছে, এমনকি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর ছবিও একবার প্রদর্শিত হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে প্রবেশপত্র যোগাড় হয়ে গেল।

১৩২১ সালের ১১ মাঘের (জানুয়ারি ১৯১৫) সন্ধের উপাসনায় আমরা কয়জন রবিভক্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিক বন্ধু একত্রে ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে দিনের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সেখানে অনেক গণ্যমান্য ও বিদ্বজ্জনের সমাগম হয়েছিল। কবি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে। সঙ্গে এনেছিলেন বালকদল আর তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' স্নেহাস্পদ নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপাসনায় গান করবার জন্যে। কবি আচার্যের আসনে উপবেশন করলে সমস্ত স্থানটাতে একটা সম্ভ্রমের আবহাওয়ার সৃষ্টি হত। দিনেন্দ্রনাথ অর্গ্যানে বসতেন, ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত, তখন গান আরম্ভ হত। তাঁর আকৃতি ছিল বৃহৎ, গান পরিচালনার সময় তাঁর একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ হাবভাব ফুটে উঠত। সে দৃশ্য যাঁরা না দেখেছেন আর সে গান না শুনেছেন তাঁদের কাছে ভাষায় সে ছবি ফোটানো যাবে না।

কবির নতুন-রচিত অনেক গান মাঘোৎসবের সময় গাওয়া হত। আমি তাঁর ১১ই মাঘের উপাসনায় তিনবার উপস্থিত ছিলাম— ১৩২১ ১৩২২ আর ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। ১৩২৩এ তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, —এ কয় বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। কোন্ গান কোন্ বার গাওয়া হয়েছিল তা আমার আর স্মরণ হয় না। তবে, 'এই তো তোমার আলোক-ধেনু' 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ' 'মেঘ বলেছে যাব যাব' ইত্যাদি তখনকার নতুন গান সেখানে শুনেছিলাম বলে মনে আছে। কবি ১৩২১ বঙ্গাব্দের উপাসনার উদ্বোধনে আর উপদেশে যা বলেছিলেন তা "যাত্রীর উৎসব" আর "মাধুর্যের পরিচয়" শিরোনামায় তাঁর "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। তিনি অবশ্য মুখেই বলেছিলেন, কিছু পাঠ করেন নি।

কিন্তু এইভাবে স্মৃতিরোমন্থন করবার স্থান এ নয়। কবিসান্নিধ্যের স্মৃতিকথা যদি আমার কখনও শোনাবার সুযোগ হয় তো সে কথা একদিন শোনাবো। উত্তরকালের লোকে তা আগ্রহ করে শুনবে তা জানি। কারণ আমরা হলাম সেই দলের— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়— যারা "নিজেদের এই পরিচয়টুকু দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেছি, তাঁর কথা কানে শুনেছি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয় সে দিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।" কিন্তু আজ বলব শুধু বিচিত্রার কথা। আর সেই উত্তরকালের বেচারাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে চেষ্টা করব যথাসাধ্য, যাতে তথ্যের দিক দিয়ে নির্ভুল লিখি, প্রবন্ধ যাতে নির্ভরযোগ্য হয়।

জোড়াসাঁকোতে সাহিত্যিকদের যে মিলনসভাটি গড়ে উঠেছিল তার একটু পূর্ব-ইতিহাস ছিল। ই. বি. হ্যাভেল (E. B. Havell) কলকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ থাকা-কালে তিনি ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশের মধ্যে তার পুনঃপ্রবর্তনে সচেষ্ট হন। তদুদ্দেশ্যে তাঁরই চেষ্টায় স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলার শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে নতুন বিভাগ খোলা হয়, আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত করে সহকারী অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করা হয়।

'বিচিত্রা'
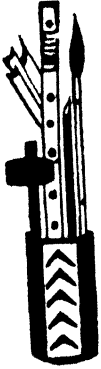
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার প্রচার ও প্রসারের জন্যে কয়েকজন ধনী গুণগ্রাহী আর উচ্চপদস্থ লোকের চেষ্টায় কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হই তখন এর আস্তানা ছিল কর্পোরেশন স্ট্রীটের 'সমবায় ম্যানসন' নামক বৃহৎ ভবনের একাংশে আর এর কর্ণধার যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পী ভ্রাতারা, কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ জজ সার্ জন উড্রফ (ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী ও গবেষক ছিলেন), কোনো বিলেতি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ইংরেজ শিল্পদরদী নর্মান ব্লাউণ্ট্ আর ও. সি. গাঙ্গুলি নামে খ্যাত শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং চিত্রশিল্পী, আর্ট ক্রিটিক এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠানের ছবির প্রদর্শনী প্রতিবৎসর শীতকালে বহু গুণী ও জ্ঞানী জনকে আকৃষ্ট করত।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ভিতর ভারতীয় চিত্রকলার আদর তখনও মোটেই হয় নি। আর আর্টে যাঁদের রুচি ছিল তাঁরাও ভারতীয় আর্টের সমঝদার হওয়া দূরে থাক্— তাকে অনাদরের চক্ষে, এমন কি, বিদ্রূপের চক্ষে দেখতেন। সেই জন্যে অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুলের কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ যে শিল্পীদল গড়ে উঠেছিলেন তাঁদের মুশকিলে পড়তে হয়। দেশের লোকের রুচি বিমুখ হলে আর্টিস্টের জীবিকা অর্জন হয় কী করে? এই অসহায় দলের সহায় শেষে অবনীন্দ্রনাথই হলেন। ঠাকুরভ্রাতারা তাঁদের অনেককে ডেকে নিয়ে নিজেদের পৈত্রিক ভদ্রাসন দ্বারকানাথ ঠাকুর স্ট্রীটে স্থান করে দিলেন আর তাঁদের দিয়ে দুই ঠাকুরবাড়ির ছেলে-মেয়ে বৌ-ঝিদের শিল্পশিক্ষা দিতে নিযুক্ত করলেন। ক্রমে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী জুটে গেল, সবশুদ্ধ হল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন। এই ঘরোয়া ব্যাপারটার নাম হল 'বিচিত্রা স্টুডিও'। এ ঘটনা ১৯১৬ সালের।

রবীন্দ্রনাথ এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে এনড্রুজ, পিয়ার্সন আর বিচিত্রা স্টুডিয়োর একজন তরুণ শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-কে সঙ্গে নিয়ে জাপান ও আমেরিকা সফরে বেরিয়ে যান। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন কলকাতাবাসী।

রাস্তা থেকে ঠাকুরবাড়ির ফটক দিয়ে প্রবেশ করে যে মুক্তপ্রাঙ্গণে পড়া যেত তার সামনে ছিল ৬ নম্বর আর দক্ষিণে ৫ নম্বর গৃহ, আগে সে কথা বলেছি। আরও ছিল বাম দিকে একটা লম্বা দুতলা বাড়ি যার এক প্রান্ত গিয়ে ৬ নম্বর বাড়ির প্রান্তের বারান্দায় যুক্ত হয়েছে। এই দুতলা কোঠার রং লাল তাই 'লালবাড়ি' নামে এটি খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকসংগ্রহ ছিল লালবাড়ির একতলায়, আর দুতলার প্রায় সমস্তটা জুড়ে ছিল একটা হল-ঘর এবং সম্মুখে প্রাঙ্গণ-বরাবর লম্বা টানা বারান্দা। কবির পুস্তকসংগ্রহে বই ছিল প্রচুর, তা ছাড়া তিনি সর্বদা নতুন বই কিনতেন আর নানা স্থান থেকে উপহার পেতেন।

কবির বিদেশসফরের সময় তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের খেয়াল গেল যে, লালবাড়ির লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে বিচিত্রা স্টুডিয়োর আনুষঙ্গিক ভাবে একটা সাহিত্যসভা তৈরি করা যাক। সেই কাজে তিনি লেগে গেলেন, তাঁর প্রধান সহায় হলেন তাঁর জাঠতুত ভাই, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্লাব হওয়ার যোগ্য করে নীচের লাইব্রেরি আর দুতলার হল-ঘর সজ্জিত করা হল। উপরে ওঠার সিঁড়ির উভয় পাশ আর হল-ঘরের দেওয়াল পাঁচ-ছয় ফুট পর্যন্ত উঁচু করে শীতলপাটি দিয়ে মুড়ে কাঠের বেটম দিয়ে আটকে দেওয়া হল। হল-ঘরের দেওয়ালে দুটি বৃহৎ ছবি টাঙানো হল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

-অঙ্কিত 'সাগী' আর শ্রীনন্দলাল বসুর 'স্বপ্ন'। 'বিচিত্রা' লেখা একটা সীল আঁকলেন শ্রীনন্দলাল বসু বাংলাদেশের পল্লীকুটিরের আদর্শে। ক্লাবের চিঠি আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদিতে সীলটি মুদ্রিত থাকত। ক্রমে ক্লাব বেশ গড়ে উঠল, এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হতে লাগল। কবির জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে লিখেছেন, "ইহাই বিচিত্রা নামে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতার অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র হয়।"

এহেন মিলনকেন্দ্রে আমার প্রবেশলাভ হয় বন্ধু শ্রীঅমল হোমের দৌলতে। তিনি এ সময়ের কয়েক বছর আগে থেকেই তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যরসপিপাসু যুব-সমাজে, ছাত্রসভায়, ইংরেজি ও বাংলা বিতর্কের ক্ষেত্রে bright youngmenদের অন্যতম ছিলেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের অন্তরঙ্গ, কবির ভক্ত আর তাঁর স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন।

বিচিত্রাসভার অধিবেশন সপ্তাহে একবার হত— প্রায়ই বুধবারে। সভ্যদের কাছে 'আমন্ত্রণলিপি' ডাকে পাঠানো হত বিচিত্রার সীল-মুদ্রিত সরু লম্বা বাদামী রঙের পোস্ট কার্ডে। বিপরীত দিকে থাকত ঠিকানা আর এক পয়সা মূল্যের (হায় রে সেকাল!) ডাকটিকিট।

আমি একজন 'সভ্য' ছিলাম। কিন্তু এই 'সভ্য' হওয়ার ব্যাপারটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হয়তো তখনকার সুপরিচিত সাহিত্যিকদের নামের একটা তালিকা তৈরি হয়েছিল আর তাঁদেরই কাছে পাওয়া আরও নাম সেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আমার কাছে 'বিচিত্রা পুস্তকাগারে'র একখানা কার্ড (নং ৩৮) রয়েছে— তাতে হাতে লেখা আছে আমার নাম, "সভ্যের নাম :—" মুদ্রিত আছে তার আগে; নীচে মুদ্রিত— "পুস্তকাগারে প্রবেশের জন্য এই কার্ড দেখানো আবশ্যক"। কোনো দিন এ কার্ডটি দেখাতে হয় নি, মুখচেনা ছিলাম। 'সম্পাদক' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরিত চিঠির সঙ্গে এই কার্ড খামে এসেছিল। চার-পাঁচ বছর আগে একদিন রথীন্দ্রনাথের কাছে বিচিত্রার সভ্যের কথা তুলেছিলাম। দেখা গেল তাঁর স্মরণ নেই। "Formally কাউকে সভ্য করা হয়েছিল কিনা" তিনি সন্দেহ করলেন।

এ এক মজার 'সভ্য' হওয়া। আমার কাছে কেউ কোনো দিন চাঁদা চান নি, আমিও দিই নি, অথচ নিয়মিত 'আমন্ত্রণলিপি' ডাকে পেতাম। অধিবেশনের শেষে সর্বদা জলযোগের আয়োজন থাকত। প্রথম কয়েকটা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর জলযোগের আগেই পলায়নের চেষ্টা করে কৃতকার্য হই নি— সিঁড়ির কাছে মোতায়েন রথীন্দ্রনাথের অনুচরের হাতে ধরা পড়তে হয়েছে।

অধিবেশনের সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা। নাটকের অভিনয় হলে সেই ঘরেই হত স্টেজ বেঁধে। অধিকাংশ অধিবেশন ছিল প্রবন্ধপাঠের। তা ছাড়া হত গানবাজনা, খোসগল্প, পুস্তকপাঠ ও আলোচনা। কোনোবার হয়তো শুধু মেলামেশার জন্যেই হত— 'বিষয়' লেখা থাকত "সদালাপ"। এই করে অনেক নতুন বন্ধুতা সেখানে আরম্ভ হয়েছে।

স্বয়ং কবি ছিলেন বিচিত্রা-সভার প্রাণ। যাঁরা আসতেন তাঁদের কারও কারও কথা একটু বলি। তা বলতে গিয়ে নিছক তথ্য ছাড়া মতামত যা কিছু ব্যক্ত হবে তা অবশ্য আমার নিজস্ব। সেজন্য সে বিষয়ে মতদ্বৈধতার অবকাশ কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তা থাকে তো থাক্, নয়তো প্রবন্ধটি স্মৃতিকথা হয় না, হয় শুধু তথ্যের রসহীন বিবৃতি।

আগে একালের নবীন পাঠকদের জন্যে সেকালের কথা একটু বলে নিই।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় কলকাতার পথেঘাটে লোকচলাচল ঢের কম ছিল। যানবাহন অনেক অল্প, তখনও ঘোড়ার গাড়ির যুগ চলছে, বড়লোকের মোটরগাড়ি চলত, কিন্তু মোটরবাসের নামগন্ধও ছিল না। আজকের মত সর্বত্র পথেঘাটে সভাসমিতিতে মেয়েদের দেখা যেত না— তাঁদের গতিবিধিতে স্বাধীনতার অভাব ছিল। ছাত্রদের মেলামেশার জায়গা ছিল মাত্র দুটি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউট আর Y.M.C.A., উভয়ে একই পাড়ায়— কলেজপাড়ায়। আর ছাত্রসংখ্যাই বা কত ছিল! আজকের শুধু সিটি বা বঙ্গবাসী কলেজে যত ছাত্র পড়ে আমাদের সময়ে কলকাতার সবকটা কলেজে তত ছাত্র ছিল কিনা সন্দেহ। আর ছাত্রী ছিল তো মুষ্টিমেয়। বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতার স্থান ছিল— এখন ভাবলে কৌতুক বোধ হয়— গোলদিঘির পাড়ে, বীডন উদ্যানে, কাশিমবাজার রাজ-বাড়ির বাগানে, পশুপতি বসুর বাড়ির উঠোনে, পান্তির মাঠে (যেখানে এখন বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেল)— এই কয়টা খোলা জায়গার কথা মনে পড়ছে; আর Albert Hall, Overtoun Hall, Student's Hall আব কদাচিৎ কোনো বিশেষ ব্যাপারে কলকাতার Town Hall।

এই সব জায়গায় আমরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, গোখেলে, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি মহা মহা দেশনায়কের বক্তৃতা শুনতাম। দেশবন্ধু পার্ক বা দেশপ্রিয় পার্কের মত খোলা জায়গা কল্পনাতেও ছিল না। মাইক, রেডিয়ো, টকি তখন আবিষ্কারও হয় নি। এতেই প্রতীয়মান হবে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিমণ্ডল তখন কত সংকীর্ণ ছিল। সে তুলনায় এখন দেশের শিক্ষিত লোকের সাংস্কৃতিক প্রসারের ব্যবস্থা যে কত বেড়ে গেছে তা মনে করে অবাক হতে হয়। বিচিত্রার মত একটা মিলনকেন্দ্র সে সময়েই সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আজকের দিনে তার সম্ভাব্যতা কল্পনায় আনা যায় না। ভেবে দেখি, রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্রুতকীর্তি, সর্বজনপূজ্য, দেশজোড়া তাঁর নাম— সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়িয়েও বহুদূরবিস্তৃত। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি 'সার্ রবীন্দ্রনাথ' নামে সাহেবমহল আর রাজপুরুষদেরও শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র, মান্যগণ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ক্ষুদ্র একটা চক্রের মধ্যে মাসের পর মাস পেয়েছি প্রায় আপনার জনের মত, স্বল্পায়তন স্থানে— একটা বাড়ির দুতলায়। আজকের দিনে হলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং রবাহূতের দল তাঁকে সেখানে ঘিরে ফেলত, প্রবেশদ্বার ভেঙে হট্টগোল করে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিত তাঁকে 'দর্শন' করবার জন্যে।

বিচিত্রা-সভায় সর্বদা যাঁরা আসতেন তাঁদের কথা পরে বলব, প্রথমে বলি সেখানে যাঁদের কদাচিৎ আবির্ভাব হতে দেখেছি তাঁদের কথা।

সেখানে একবারের 'ডাকঘর' অভিনয়ে শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট, পণ্ডিত মালবীয় ইত্যাদি কংগ্রেসের কয়েকজন নেতৃবর্গ দেখতে এসেছিলেন, তবে সেদিন আমার আমন্ত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। এর কয়েকদিন আগে যখন 'ডাকঘর' হয়েছিল তখন উপস্থিত ছিলাম, সে বিষয়ে পরে কিছু বলব।

বিচিত্রায় আসতে দেখেছি সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুকে। তিনি ছিলেন কবির প্রিয়বন্ধু। দুই বন্ধুর মিলনে যে উভয়েই বেশ খুশি হয়েছেন তা তাঁদের বাক্যে ও ব্যবহারে স্পষ্টই দেখা গেল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বোধহয় একদিন দেখেছিলাম সেখানে। তিনিও কবির বন্ধু; তাঁর মডার্ন রিভিউ আর প্রবাসী পত্রিকাদ্বয় তখন অবিসংবাদিতভাবে ভারতবর্ষের দুটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা, দেশের জনমতগঠনের

বাহন। সে সময়ে তিনি শ্বেতশ্মশ্রু সৌম্যমূর্তি গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, কথা বলতেন কম— তাও ধীরে ধীরে। শান্ত মানুষটি, কোনো স্থানে নিজেকে জাহির করতে অনিচ্ছুক।

কবির আর-একজন প্রিয় বন্ধু একদিন এসেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি তখন বৃদ্ধ, সুপুরুষ, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, তাঁর হাসি বড় মিষ্ট ছিল। বিশেষত একই পাড়ার মানুষ বলে আমি তাঁকে ভালো করেই চিনতাম। তাই তিনি দুতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন দেখে আমার একটু ভাবনা হল; কারণ তখন মস্তিষ্কের পীড়ায় কখনো কখনো কিছুদিন ধরে তাঁকে শয্যা নিতে হত। আরও ভাবনা হল দেখে যে, তিনি কিছুতেই বসছেন না, কবির সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে এদিক-ওদিক আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর রথীন্দ্রনাথ একটা মস্ত তাকিয়া নিয়ে তাঁর পিছন পিছন চলেছেন; উদ্দেশ্য, তিনি বসলেই তাকিয়াটা তাঁর পিছনে ঠেলে দেবেন। অবশেষে তিনি কবির কাছে গিয়েই বসলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন একটা গল্প পড়েছিলেন। ফোটোতে তাঁর যে গোঁফদাড়ি-কামানো চোখালো চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই সময়ে তাঁর সে চেহারা ছিল না। তার মাত্র বছরখানেক আগে বর্মাপ্রবাস ছেড়ে তিনি দেশে এসে বসেছেন। লেখক বলে খুব নামডাক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার সাহিত্যসমাজে তিনি তখনও ব্যক্তিগতভাবে তত পরিচিত হন নি। চেহারায় কিছুমাত্র পালিশ ছিল না। প্রচুর কালো গোঁফদাড়ি ছিল, চুল অপরিপাটি। দেহ সামান্য মোটার দিকে, সার্ট বা কোটের উপর একটা চাদর গায়ে থাকত। ফরাসের উপর আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম। সুসভ্য সুভদ্র মেয়ে-পুরুষের এমনি একটা সম্মিলন-স্থানে, সকলের ব্যগ্র কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে হয়তো তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করে-ছিলেন। কিন্তু গল্প পড়বার সময় কোনো কুণ্ঠার ভাব প্রকাশ করেন নি; যদিও গল্পটি ফাঁদা ছিল বন-বাদাড়ে; বামুনের ছেলের অবনত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সহবাস, সাপুড়ের মেয়েকে নিকা করা ইত্যাদি নিতান্ত অসামাজিক ব্যাপার নিয়ে। জিনিসটা episodic ধরণের, লেখকের পরবর্তী কালের সৃষ্টি শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের মধ্যে একটা পরিচ্ছেদ হিসেবে বসিয়ে দেওয়া যায়। গল্পে কৌতুক ও শ্লেষ যথেষ্ট ছিল— শ্রোতারা খুব হেসেছিলেন, কবি সুদ্ধ। গল্পটা শরৎচন্দ্রের মত শক্তিশালী লেখকের পক্ষে শিল্পকৃতির ভালো নিদর্শন নয়— বাঁধুনিতে ঢিলে, preachingএর আতিশয্য আছে, কিন্তু রচনাটি লেখকের নিজস্বতায় উজ্জ্বল; এর থেকে সামান্য উদ্ধৃতিও পাঠককে বুঝতে কষ্ট দেয় না— লেখাটা কার। এই গল্প পরে 'ভারতী'তে 'বিলাসী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিচিত্রায় সর্বদা আসতেন দুই ঠাকুরবাড়ির মেয়েপুরুষ প্রায় সকলেই, বিচিত্রা-স্টুডিয়োর শিল্পীবৃন্দ— গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল।

ঠাকুরভ্রাতারা বিধিদত্ত বিচিত্র শক্তির অধিকারী ছিলেন। কবি-রচিত নাটকের অভিনয়ে তাঁদের অভিনয় দেখেছি— অতি উঁচুদরের নট ছিলেন তাঁরা। আগের বছর শীতকালে (১৯১৬ জানুয়ারি) 'ফাল্গুনী'তে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁদের অভিনয় দেখেছিলাম। ফাল্গুনীর প্রথম অভিনয়ের সময় তার curtain raiser হিসেবে যে ছোট নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল সেই 'বৈরাগ্যসাধন'এ গগনেন্দ্রনাথ রাজা সেজেছিলেন, আর 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' বৈকুণ্ঠ। এই দুটি ভূমিকায় তাঁকে খুব মানাত। অবনীন্দ্রনাথও খুব ভালো নট ছিলেন, 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' তিনকড়ি সেজে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। তাঁর কথা বলবার নিজস্ব একটা ভঙ্গি ছিল, কতকটা bantering ভঙ্গি, তাই কোনো মজাদার ভূমিকায় তাঁর impersonation ভারী চমৎকার হত।

'ডাকঘরে' তিনি কবিরাজ সেজেছিলেন, আর কবি স্বয়ং হয়েছিলেন ঠাকুর্দা; অমলের ভূমিকা নিয়েছিল আশামুকুল বলে একটি ছেলে, সে অভিনয় ভুলবার নয়। শ্রীঅসিতকুমার হালদার দইওয়ালা সেজেছিলেন —এই কয়জনের কথাই ভালো করে মনে আছে।

প্রমথ চৌধুরীকে সেখানে দেখেছি। আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেন তিনি। তবে তাঁর একটা মুদ্রাদোষ ছিল, সে জন্যে তাঁর বক্তব্য সহজভাবে অগ্রসর হতে পারত না— আর লোকে শুনতে কৌতুকবোধ করত।

আর আসতেন সুকুমার রায় (চৌধুরী)। তখনকার দিনে যে যুবকদল সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় প্রয়াসী ছিলেন, তিনি তাঁদের নেতা ছিলেন বলা যায়। কোনো কোনো মানুষ দেখা যায় আত্মীয়বন্ধু-মহলে যাঁর আবির্ভাবমাত্র ছেলেবুড়ো সকলের মধ্যে একটা খুশির প্রবাহ বহে যায়, সুকুমার রায় ছিলেন তেমনি ধরণের মানুষ। তাঁর প্রকাণ্ড দেহ, ঢেউখেলানো চুল, গালের উপর একটা আঁচিল ছিল। উজ্জ্বল মুখশ্রী, ভাবভঙ্গি অতিশয় আকর্ষণীয়। জ্যেষ্ঠদের ও বন্ধুমহলে, সর্বত্র তিনি স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি আলোচনায় অনেক সময়ে যোগ দিতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনিও ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এঁর একটি আশ্চর্য স্বভাব ছিল এই যে, বন্ধু-মহলের বাইরে তিনি একেবারে মুখ খুলতেন না। একদম চুপ। বহরমপুরে একবার কোনো সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিয়ে তিনি ট্রেনে যে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের কামরায় কলকাতায় ফিরছিলেন— কৃষ্ণনগর থেকে আমি সেই কামরায় উঠি। বেশ ভিড় ছিল, তা ছাড়া সাহিত্যিকরা অনেকে ছিলেন, তাঁর বিশেষ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পাশেই বসে। তাঁদের উভয়ের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল, চারুবাবুর ইঙ্গিতেই আমি তাঁদের গাড়িতে গিয়ে উঠি। দেখলাম, সাহিত্যিকেরা হৈ হৈ করতে করতে চলেছেন, কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছনোর তিন ঘণ্টার যাত্রার মধ্যে তিনি ভুলেও একবার একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি, তাঁর পাশে উপবিষ্ট চারুচন্দ্রের সঙ্গেও না।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কিরণশঙ্কর রায়, ইন্দিরা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীমতী সীতা দেবী— এঁদের শুধু নাম উল্লেখ করেই থামতে হল। বিস্তারিত কিছু বলবার যোগ্য এঁরা নন এমন কথা অবশ্যই মনে করি না, তবে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার তাড়া আছে। তা ছাড়া, 'এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্তলোকে' তাঁদের কথা কিছু বলা এখানে শোভন হবে না। অবশ্য আমি শুধু সাহিত্যপাঠকদের কাছে পরিচিত নামই উল্লেখ করবার চেষ্টা করলাম, অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত অনেক মেয়েপুরুষ যাঁরা আসতেন তাঁদের নয়। উভয় ক্ষেত্রেই সকলের মুখও আমি চিনতাম না, আর সকলের কথা স্মরণেও নেই, তাই অনেকের নাম হয়তো বাদ গেল।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বিচিত্রার সবকয়টি আমন্ত্রণলিপি আমি সযত্নে রক্ষা করি নি। সতেরোখানা মাত্র আমার কাছে রয়েছে দেখছি, সেগুলির তালিকা দিলাম।—

অধিবেশনের তারিখ	বিষয়
১২ আশ্বিন ১৩২৪ শুক্রবার	'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়
২৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার	'ডাকঘর' অভিনয়

অধিবেশনের তারিখ	বিষয়
১২ অগ্রহায়ণ বুধবার	গানবাজনা
২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার	'পাত্র ও পাত্রী' : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪ পৌষ বুধবার	বাংলাভাষা আলোচনা : শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৫ পৌষ বুধবার	চিত্রশিল্প আলোচনা স্থান : ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী, ৭৷১ করপোরেশন স্ট্রীট
৩ মাঘ বুধবার	সাহিত্যপাঠ : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ মাঘ বুধবার	'শিল্প ও শিল্পী' : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১ ফাল্গুন বুধবার	সদালাপ
৮ ফাল্গুন বুধবার	সচিত্র প্রবন্ধ 'রূপ ও রেখা' : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ ফাল্গুন বুধবার	'বাংলা ছন্দ' : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২২ ফাল্গুন বুধবার	'আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যার সাদৃশ্য' : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯ ফাল্গুন বুধবার	'ভক্ত দাদূর বাণীশিল্পের রহস্য' : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৬ চৈত্র বুধবার	প্রবন্ধপাঠ : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার	একটি গল্প : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২০ চৈত্র বুধবার	'বাংলাভাষাতত্ত্বের একাংশ' : শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২৭ চৈত্র বুধবার	সংগীত

একবারের অধিবেশনে জনৈক অন্ধ্রদেশীয় যন্ত্রশিল্পী অধ্যাপক বীণ বাজিয়েছিলেন। দুই-আড়াই ঘণ্টা ধরে তিনি অনেকগুলি গৎ বাজিয়েছিলেন এমনি সুন্দর যে, আমার মত অজ্ঞের কানেও তা মধুবর্ষণ করেছিল, কবি এবং অন্যেরাও বেশ উপভোগ করেছিলেন। উভয়ে সংগীত-আলোচনা কিছু করলেন— ইংরেজিতে। অধ্যাপক দু-একটা ইউরোপীয় সুরও বাজালেন। সেই সন্ধ্যার মধুর স্মৃতিটুকু আমার মনে রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার জনৈক সংগীতজ্ঞ একবার ইংরেজি গীতাঞ্জলির কয়েকটা কবিতার সঙ্গে সুর বসিয়ে তার music বা স্বরলিপি কবিকে পাঠান, কবি সেটি বিচিত্রায় এনেছিলেন। বাজানো হল। কবি নিজে কবিতাটি পড়তে থাকলেন আর ইন্দিরা দেবী পিয়ানোতে ঐ সুরটা সেই সঙ্গে বাজালেন। এই ভাবে তিন-চারটা পড়া আর বাজনা হওয়ার পর কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কেমন লাগছে ?" আমাদের কারও বিশেষ সুবিধে লাগে নি, অনেককেই মাথা নাড়তে দেখা গেল। কবি তখন পড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এক কাজ করে দেখা যাক— বাংলায় এই পরীক্ষা করে দেখা যাক কেমন হয়।" গীতাঞ্জলির কয়েকটা গান তিনি কবিতার মত করে টেনে টেনে কিন্তু বিনা সুরে পড়ে যেতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ গানের সুরটি এস্রাজে বাজালেন, অর্থাৎ কবির কবিতা পড়ার পশ্চাৎপটে গানের সুর এস্রাজে বাজতে লাগল। এবার ফল ভালোই হল, সকলেই খুশি। আমার মনে আছে কবিকণ্ঠে 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' পাঠের সঙ্গে বেহাগ সুরে এস্রাজ বাজনা অতীব উপভোগ্য হয়েছিল।
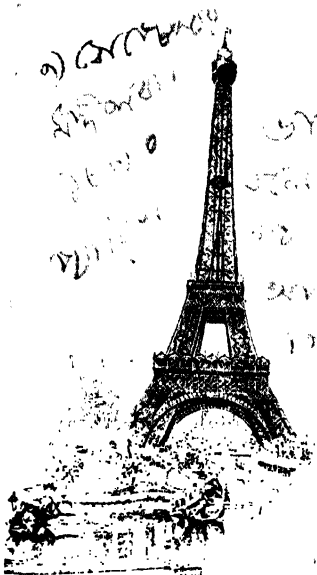
ওঁ
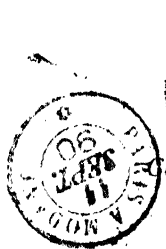
CARTE POSTALE

Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.

Mrs R. Tagore
6 Dwarkanath Tagore's Lane
Jorasanko
Calcutta
India

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র
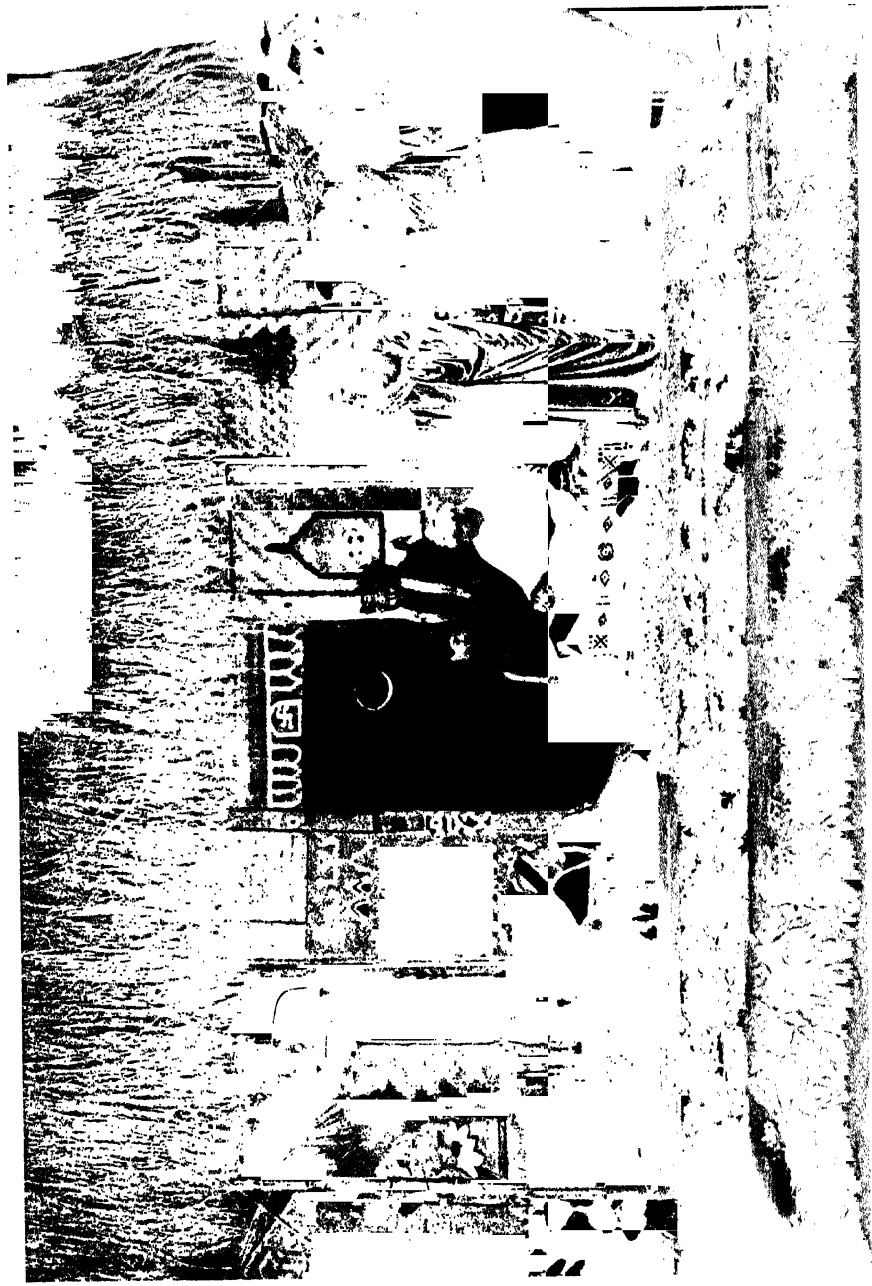
'ডাকঘর' অভিনয়ের শেষ দৃশ্য

গগনেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ

আশামুকুল

১৯১৭ (১৩২৪) সালে জোড়াসাঁকো বিচিত্রা-ভবনে অভিনয়মঞ্চে গৃহীত ফটোগ্রাফ : কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে

আইরিশ কবি A.E.-লিখিত *The National Being* নামক বই থেকে কবি স্থানে স্থানে টিপ্পনী সহকারে পড়ে একদিন আলোচনা করেছিলেন। আর একদিন ঐভাবে Sir Horace Plunkett-রচিত সমবায়নীতি-বিষয়ক কোনো একটা নিবন্ধ পড়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেদিন তাঁর ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেদিন আমি বিচিত্রায় ছিলাম না। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে প্রচুর সুন্দর সুন্দর উদাহরণ সমেত রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি যেদিন পড়েন সেদিন উপস্থিত ছিলাম। সেদিনকার আলোচনার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এই যে, প্রবন্ধপাঠের পর সুকুমার রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন "গদ্যে কি ছন্দ আছে?" এ কথা শুনে সকলেই মৃদু হেসেছিলেন। কবি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সাধারণ গদ্যের কথা যদি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned prose তার মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়।" কবির তখনকার এই উক্তিটি আমি significant বলে মনে করি। বাংলা গদ্যে ছন্দের সম্ভাব্যতা বিষয়ে এখন বোধ হয় কারো মনে জিজ্ঞাসাই ওঠে না। আর তা সম্ভব হয়েছে স্বয়ং কবিরই জন্যে, তিনি কত অল্পসময়ের মধ্যে জিনিসটা বাংলা ভাষায় আরম্ভ করে তাকে চলন্ত করে দিয়ে গেছেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

গানবাজনা, সদালাপ, খোসগল্প—এ সবও বিচিত্রায় হত। কবির নতুন রচিত গান মাঝে মাঝে হয়েছে। একবার অনেকগুলি গানের মধ্যে 'কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' -গানটি মিলিতকণ্ঠে অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীকালিদাস নাগ আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গেয়েছিলেন, বড় ভালো লেগেছিল। দিনেন্দ্রনাথ এস্রাজ বাজাতেন, অবনীন্দ্রনাথও একবার বাজিয়েছিলেন মনে হয়। কবিকে অনুরোধ করা হল প্রবাসীতে কয়েকদিন আগে প্রকাশিত 'বল বল বন্ধু বল'[১] গানটি গেয়ে শোনাতে। তিনি একটু গুন গুন করে শেষে বললেন—"হবে না, সুরটা মনে আসছে না।"

আর আর যেসব অধিবেশনে গিয়েছি সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু মনে আসছে না।

বিচিত্রা-সভা বেশি দিন চলে নি। কেমন করেই বা চলবে। কবি ক্রমশই কলকাতায় আর উপস্থিত থাকতে পারতেন না। ১৯১৮ সালের শেষে অজিতকুমার চক্রবর্তী পরলোকে গেলেন। রথীন্দ্রনাথের ক্লাব চালানোর উৎসাহ কমে এল; এমনি করে আস্তে আস্তে, শ্রীনন্দলাল বসুর ভাষায়, "পাত্তাড়ি গোটাতে হল—শুনলুম গুরুদেবের ফাও্ ফুরিয়েছে।" এমন অবস্থা আসবার আগে আমাকেও চলে যেতে হল কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে, তাই বিচিত্রার শেষ অবস্থা আমি আর দেখি নি।

শেষ বার এই লালবাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে যখন দেখি তখন আরও ২১ বছর পার হয়ে গেছে। লালবাড়ি তখন বিচিত্রার শুধু স্মৃতি বহন করছে। আমার তৎকালীন কর্মস্থান থেকে কয়েক দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলাম। ২৩ কার্তিক ১৩৪৬ (১৯৩৯ সালের ৯ নভেম্বর) তারিখে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোয় কবি-সন্দর্শনে যাই, সেদিন কবি সেই বিচিত্রার ঘরে তাঁর আত্মীয়স্বজন আর অনেক সাহিত্য-রসিক ভক্ত পাঠকে পরিবৃত হয়ে একটি নতুন রচিত গল্পের প্রথম খসড়াটা তাঁদের পড়ে শোনালেন। গল্পটির নাম 'শেষ কথা'[২]। কবির তখন জরার অবস্থা, সেই দিনই অথবা হয়তো তার আগের দিন মাত্র

১ প্রবাসী ১৩২৪ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২ গল্পটি 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। রচনা তারিখ—৪, ১০, ৩৯।

মংপু থেকে কলকাতায় ফিরেছেন শান্তিনিকেতনের পথে। বেশ ক্লান্ত ছিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে তাঁর পাঠ আমি ভালো করে শুনতে পাই নি। কবির পাঠ শেষ হলে অনেক কাল পরে আমাদের অনেকগুলি পুরানো বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে সেখানে মিলন হয়েছিল। তার মধ্যে মনে পড়ছে কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁর নবপরিণীতা সুন্দরী বিদেশিনী স্ত্রীকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিলেন। খানিক বিশ্রম্ভালাপের পর কবিকে প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম— সেই আমার কবিকে শেষ দেখা।

6 DWARKANATH TAGORE STREET
CALCUTTA

শ্রীযুক্ত অমল হোমের ভগিনী
শ্রীমতী বীণা বসুকে লিখিত

কল্যাণীয়াসু

তোমরা শান্তিনিকেতন থেকে খুসি হয়ে গেছ শুনে খুসি হলুম। এমনি করেই আমাদের আশ্রমের মাঝে তোমাদের হৃদয়ের যোগ থাক এই কামনা করি। ২৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল প্রায় একলা একলা এখানে আমরা নীড় নির্মাণ করতে লেগেছি — এই আশ্রম আমাদের গান, এরই আকাশে আমাদের মুক্ত বিহার, এরই সঙ্গে যুক্ত আমাদের দুঃসাধ্য চেষ্টা। এই মনে করেই সব ভেবেছিলুম যে, দেশের লোক খুসি হবে। অবশেষে দিন যখন ফুরিয়ে আসে, ছুটি নেবার সময় গোধূলি বেলা এল তখন তোমরা

কেউ কেউ পথিকের মত তোমাদের
জীবনপথের পাশে ক্ষণকালের
ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, বসেছে, খুশি
হলো। আমার মনে তোমাদের মুখের
এই কথা সন্ধ্যাবেলার পূরবী সুরের
মত শোনালো। তোমরা থাকবে
চলে গেছ, আমি থাকব, আবার
আরো দূরে যাবার সময় এলো।
ইতি ১০ চৈত্র ১৩৩৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ব্যাপক অর্থে কোনো বিশেষ জ্ঞানকেই বলি বিজ্ঞান। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলব। কবিরা পরীক্ষা করেন না; তবে পর্যবেক্ষণ করেন। এই অর্থে কবি মাত্রেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে বৈজ্ঞানিক। মহৎ কবিদের পর্যবেক্ষণ করবার এক-একটা বিশিষ্টতা থাকে। তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যটুকু পর্যবেক্ষণের সেই বিশিষ্টতার মধ্যে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। শুধু ব্যতিক্রম বলি কেন, পর্যবেক্ষণের বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা একক ও অনন্যপ্রকৃতির। রসের আনন্দসাগরে তরী ভাসিয়েছেন কবি। তাঁকে আনন্দ যুগিয়েছে বিজ্ঞানও। তাই বলে রসের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দিক হারান নি কবি। বরং বিজ্ঞানই অনেক সময় তাঁকে পথ দেখিয়েছে; অযথা উচ্ছ্বাসের জোয়ার থেকে তাঁর কাব্যতরীকে সামলেছে। কবির কাছে বিজ্ঞান একদিকে যেমন আনন্দের উপচার, অন্যদিকে তেমনি উচ্ছ্বাসের নিয়ামক। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে পাণ্ডিত্য অর্জন নয়, বিজ্ঞান-শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার দিকেই ছিল তাঁর প্রবণতা। অর্থাৎ, অনেক কিছু জেনে ভারী হওয়া নয়, অল্প কিছু জেনে তৈরি হতে চেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।[১]

কবির এই অনুমান যথার্থ। কল্পনার জগতে বিজ্ঞান তাঁর কোনো লোকসান ঘটায় নি; যুক্তি ও বিচারের রসদ যুগিয়ে বরং তাঁকে উপকৃতই করেছে। এই লাভ সম্ভব হত না, যদি তিনি জ্ঞানপিপাসুর লোভী দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞানের রাজদরবারে হানা দিতেন। শিক্ষার্থীর কৌতূহল আর রসিকের তৃষ্ণা ছিল বলেই বিজ্ঞান তাঁর কাছে খাদ্য নয়, আনন্দ। বৈজ্ঞানিক সত্যের রসটুকু পেয়েই তিনি খুশি, তত্ত্বের ভারবাহী হতে তিনি অনিচ্ছুক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয় বলে যথা লাভ।[২]

প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে শুধুমাত্র জ্ঞানের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই অনীহা ছিল। তাই দেখি, জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানকে যাঁরা শুধুমাত্র প্রয়োজনের

---

১ বিশ্বপরিচয়, ২য় সংস্করণ (মাঘ, ১৩৪৪)। ভূমিকা পৃ. ।৵৹

২ . উপরি-উক্ত গ্রন্থ। ভূমিকা পৃ. ।৵৹

বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে জ্ঞানচর্চায় নিরত থাকতে উৎসুক, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বাগত জানাতে পারেন নি। সন্ধ্যাসংগীতের (১২৮৮) 'গান সমাপন' কবিতায় জ্ঞানী বৈজ্ঞানিকদের প্রতি কটাক্ষের পরিচয় সুস্পষ্ট—

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসার-তলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি'
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি' অতীতের কারা।

জ্ঞানকে বোঝা হিসাবে গ্রহণ করতেই আপত্তি। কিন্তু যখন জ্ঞানের রাজ্যে বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের প্রকাশ ঘটে, কবির কাছে তখন তা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের প্রতিমূর্তি। জগৎজোড়া নিয়মের রাজ্যে আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিভ্রমণশীল গ্রহ-নক্ষত্রাদির সুনির্দিষ্ট কক্ষপথের কথা কল্পনা করে কবিমানস বিস্মিত ও আনন্দিত। প্রভাতসংগীত (১২৯০) কাব্যের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় ভগবানের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন—

চক্র পথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্র পথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।

উল্লিখিত দু-একটি কবিতার কথা স্মরণে রেখেও মানসীর পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করলে মনে হয়, এই পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞানের প্রভাব খুবই সামান্য। কি সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত এবং কি ছবি ও গান (১২৯১), ও কড়ি ও কোমল (১২৯৩), কোনো কাব্যেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিচয় নেই। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভাব এবং কবির রোমান্টিক দৃষ্টির প্রাধান্যই এজন্যে দায়ী এবং বোধ করি, এই কারণেই একমাত্র কড়ি ও কোমল ছাড়া এই পর্বের অন্যান্য কাব্যে উচ্ছ্বাসের আধিক্য সুস্পষ্ট। কড়ি ও কোমলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে।" কিন্তু কবিতাগুলো আলোচনা করলে মনে হয়, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং জগৎ ও জীবনকে স্বাভাবিকভাবে দেখবার প্রয়াস এই কাব্যে থাকলেও বিজ্ঞানের প্রভাব এতে নেই।

কড়ি ও কোমলের পরবর্তী পর্বে দেখি, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির পরিচয় নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিদৃষ্টিও সংযত ও সংহত হচ্ছে। অতএব, সংগত কারণেই এই পর্বে বিজ্ঞানের আরও সুস্পষ্ট প্রভাব থাকার কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য মানসীর (১২৯৭) বেলায় এ কথা

সর্বাগ্রে প্রযোজ্য এবং সর্বাধিক প্রযোজ্য পরবর্তী কাব্য সোনার তরীর (১৩০০) ক্ষেত্রে। মানসীর, কোনো কোনো কবিতায় বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। যেমন 'মরণস্বপ্ন' কবিতায়—

চিরযুগরাত্রি ধ'রে শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগনমাঝার ;

সোনার তরী প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত মহাজগতের চিরচঞ্চল স্বরূপটি 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় পরিব্যক্ত—

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া ॥

কিন্তু জ্যোতির্ময় নক্ষত্রলোক অপেক্ষা স্নেহময় ভূলোক কবির বেশি প্রিয়। ধরিত্রীর সঙ্গে কবির অন্তরের যোগসূত্র, নাড়ীর টান। তাই এ পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, মাটি-মানুষ, গিরি-নির্ঝর সব কিছুই তাঁর পরম প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ প্রকৃতি-প্রীতির ও মানবপ্রেমের ভিত্তিমূল সৃষ্টিরহস্যের গভীরে প্রসারিত। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, উপনিষদের রসলালিত ক বর এই চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর, দার্শনিক তত্ত্বের উপর নয়। বৈজ্ঞানিক বলেন, সৃষ্টির আদি-পর্বে পৃথিবী ছিল আগুনের এক পিণ্ড। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্য প্রদক্ষিণ করল এই অগ্নিময় পৃথিবী। সূর্য-পরিক্রমার পথে আগ্নেয় পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল জল ও বায়ু, প্রাণ ও পাথার। তাই, স্বীকার করতে বাধা নেই, আজকের সকল প্রাণই সেদিনের সেই পৃথিবীতে বিলীন হয়ে ছিল। আজকের সকল কিছুই সেদিনের সেই পৃথিবী-প্রসূত। আজকের দুনিয়ায় প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের যে বৈচিত্র্য নজরে পড়ে, তা ক্রমবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলেও সব কিছুরই মূলে রয়েছে লক্ষ বছর আগেকার সেই পৃথিবী। পৃথিবীর সঙ্গে তাই আমাদের নাড়ীর যোগ। এই বৈজ্ঞানিক মহাসত্যকে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পৃথিবী তাঁর কাছে মায়ের মতো। লক্ষ কোটি বছরের গর্ভধারিণী, পুরাতনী, মমতাময়ী মা। তাই সমুদ্রের অশ্রান্ত ধ্বনি শুনে তাঁর মনে পড়ে—

মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে—
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন

তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।[৩]

জন্মের পূর্বে ভ্রূণ হয়ে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম। আবার মৃত্যুর পরেও এই পৃথিবীরই মাটির সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে থাকব। আমাদের জন্ম, জীবন ও মরণের আশ্রয় এই পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর ধরে আমাদের নিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বললেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা- সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

তাই তৃণ-লতা, তরু-গুল্ম, ফুল-ফল সব কিছুরই মধ্যে যে এক অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বিরাজিত, সত্যদ্রষ্টা কবি তার সঙ্গে নিজের জীবনের এক অকৃত্রিম যোগসূত্র অনুভব করেন। বারবার তাঁর মনে জাগে, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি বস্তুই তাঁর চিরসঙ্গী, তাঁর সুখদুঃখের নিত্যসহচর। সৃষ্টির উষাকাল থেকে একই বন্ধনে সকলে আবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠ এই বিশিষ্ট ভাবটি রবীন্দ্রকাব্য-জগতের বহু স্থানেই খুঁজে পাই। চৈতালি (১৩০৩ সালে লিখিত) কাব্যের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় দেখি, ভরা দুপুরে শান্ত পল্লী-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবির নিজেকে এক একবার 'পরবাসী' বলে মনে হয়। মনে হয়, এই স্নিগ্ধ-সুন্দর পরিবেশের সঙ্গে তিনি নেহাৎ-ই যেন যোগসূত্রহীন এক আগন্তুক। কিন্তু এ আশঙ্কা সাময়িক। যখনই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আদ্যিকালের যোগসূত্রের কথা স্মরণ করেন, তখন নিজেকে আর প্রবাসী বলে মনে হয় না। তখন মনে হয়, সৃষ্টির প্রভাতে, জীবন-সৃষ্টির আদি-পর্বে পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, নদী-পর্বত সকলের সঙ্গেই তিনি একদিন এক হয়ে ছিলেন। তাই যখন আদিম যুগের সেই সৃষ্টি-রহস্যের কথা মনে জাগে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সকল কিছুই তাঁর পরম প্রিয় ও একান্ত অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় দেখি—

প্রবাসবিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে;
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে— ধরণীর বক্ষতলে

---

৩ সোনার তরী। সমুদ্রের প্রতি।

পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে— জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

একই মহাসত্যের প্রকাশ ঘটেছে উৎসর্গ (১৩১০ সালে লিখিত) কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতায়। বিশ্বভুবন আমাদের জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী। হাজার বাঁধনে এর সঙ্গে আমরা আবদ্ধ। এ সত্যকে অনুভব করলে এ জগতে নিজেকে আর প্রবাসী বলে মনে হয় না—

এ সাতমহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে—
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে!
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে!

বিশ্বজগতের সঙ্গে আদিকালের আত্মীয়তার কথা স্মরণে রাখলে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সাদৃশ্যও ধরা পড়ে। কবি এ সাদৃশ্যের কথাই বলেছেন বিচিত্রিতা (১৩৪০) কাব্যের 'পুষ্প' কবিতায়। নারীকে লক্ষ্য করে পুষ্পের উক্তি—

তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল স্বর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল॥

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিবর্তনবাদ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধকে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। সোনার তরী থেকে এ ভাবনার সূত্রপাত। তারপর চৈতালি ও উৎসর্গ হয়ে বিচিত্রিতা পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। সুদীর্ঘকাল ধরে এই বিশেষ ভাবনা রবীন্দ্র-কল্পনাকে প্রভাবিত করলেও সোনার তরীর পরবর্তী রচনা চিত্রায় (১৩০২) বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব নেই। চিত্রায় কবি যে বিশুদ্ধ ও বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ সত্য অপেক্ষা আদর্শনির্ভর কল্পনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। চিত্রার সমসাময়িক কালে লেখা চৈতালির কোনো কোনো কবিতায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকলেও চৈতালির পরবর্তীকালে লেখা কণিকা (১৩০৬), কথা (১৩০৬) ও কাহিনীর (১৩০৬) কোনো কবিতায়ই বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। কণিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় কবি জগৎ ও জীবনের মহান সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এদিক থেকে এবং কবিতাগুলির

সংহত রূপায়ণের দিক থেকে চিন্তা করলে কবির বৈজ্ঞানিকসুলভ পরিমিতিজ্ঞান এখানে বিস্ময়কর। কিন্তু কথা ও কাহিনীর কবিতাসমূহে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, পুরাণ ও ঐতিহাসিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে কবি যে মহান আদর্শের অনুধ্যান করেছেন সেখানে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক; এবং বস্তুতঃ নেই-ও।

কাহিনীর পরবর্তী কাব্য কল্পনায় (১৩০৭) পরিহাসপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পরিহাসছলে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা প্রথম দেখেছিলাম চিত্রায়। কিন্তু চিত্রার 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় যা ছিল অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র, কল্পনার 'উন্নতি-লক্ষণ' কবিতায় তাই সুস্পষ্ট বিদ্রূপে বিলসিত। বস্তুতঃ, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করলে মনে হয়, যখনই ভোগসুখে পরিপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কবির মহত্তর জীবনাদর্শের বিরোধ ঘটেছে, তখনই বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব তাঁর কাছে অসার ও অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। চিত্রা থেকে শুরু করে কল্পনা হয়ে ক্ষণিকা (১৩০৭) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। ক্ষণিকার 'অতিবাদ' কবিতায় কবি তীক্ষ্ণ পরিহাসছলে গাণিতিক তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন—

> সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
> শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
> জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
> কারো ইথে আপত্তি নেই,—

এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত সরল ও অনাড়ম্বর কয়েকটি কাব্যেও ব্যঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পলাতকা (১৩২৫), ছড়ার ছবি (১৩৪৪), প্রহাসিনী (১৩৪৫) ও ছড়া (১৩৪৮)। পলাতকা কাব্যের 'আসল' কবিতায় মানচিত্রের নীরস তথ্যের প্রতি কিশোর কবির অনাসক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। ছড়ার ছবির 'যোগীন্‌দা' কবিতায় দেখি, সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় যোগীন্‌দার কাছে অদ্ভুত সব গল্প শোনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোর প্রতি কবি-মানস বিরূপ হয়ে উঠেছে—

> সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
> দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্‌ট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।

রেল, মোটর ও বিদ্যুৎ-প্রভাবিত প্রগতিমুখর আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় প্রহাসিনী কাব্যের 'নারীপ্রগতি' কবিতায়ও সুস্পষ্ট। ছড়ার 'মামলা' কবিতায় কবি ব্যঙ্গচ্ছলে বিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন।

কল্পনা কাব্যে পরিহাসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে ব্যবহারের কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন কাব্যে ব্যঙ্গচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করা গেল। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবই কল্পনায় বিজ্ঞান-প্রভাব সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার পরিচয়ও এই কাব্যে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক কবিতায় বন্ধু জগদীশচন্দ্রের প্রতি কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রিয় বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কৃতিত্বে মুগ্ধ কবি লিখেছেন—

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

কল্পনার সমসাময়িক কাব্য ক্ষণিকার (১৩০৭) দু-এক জায়গায় কবি ব্যঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা বলেছেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো বিজ্ঞানের প্রভাব এ কাব্যে নেই। পরবর্তী রচনা নৈবেদ্যের (১৩০৮) কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ ও মহত্তর জীবনাদর্শ-প্রণোদিত হলেও বৈজ্ঞানিক সত্যের সংহত প্রকাশ এ কাব্যে রয়েছে। ইতিপূর্বে প্রভাতসংগীত কাব্যের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় ভগবৎ-মহিমার বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ দেখেছিলাম। কিন্তু প্রভাতসংগীতে যে ভাবনা ছিল ধূসর ও অস্পষ্ট নৈবেদ্যে তা' আরও সুসংহত ও কবিত্বময় বাণীরূপ পেল। নৈবেদ্যে বিশ্বপিতার মহিমার বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক সত্য স্থান পেয়েছে। উদাহরণ প্রসঙ্গে 'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর' গানটির কথা ধরা যাক। এখানে কবি বলেছেন, সব কিছু ভগবানে নিবেদন করলে হারাবার ভয়ে অনুক্ষণ উতলা হতে হয় না। কারণ, অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া, লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্যে ভরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই হারায় না—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু

গ্রহ-সূর্য থেকে শুরু করে মানবদেহ এমনকি তৃণ পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে এই অণু-পরমাণু। জগদীশ্বরের গড়া এই বিশ্বভুবনে তাঁকে কেন্দ্র করে অনন্তকাল ধরে একই অণু-পরমাণুর চাঞ্চল্য। তাই হেমন্তের শান্ত দুপুরে জনশূন্য দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর আর ক্ষীণরেখা নদীর দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়—

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।[৪]

নৈবেদ্যের কোনো কোনো কবিতায় কবিমানসের বিশেষ এক একটি ভাবনাকে ব্যক্ত করার কালে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে 'আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি' নামক গানটিতে শীতে পাখির দেশান্তর যাত্রার বর্ণনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে যায়, হংস দলে দলে

৪ নৈবেদ্য (পৌষ ১৩৬২) ২৩ সংখ্যক।

সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে ;

নৈবেদ্যের পরবর্তী রচনাসমূহ খেয়া (১৩১৩), গীতাঞ্জলি (১৩১৭), গীতিমাল্য (১৩২১) ও গীতালিকে (১৩২১) ঘিরে রবীন্দ্রকাব্যের যে অধ্যাত্মযুগ, সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। তবে খেয়ার 'প্রতীক্ষা' কবিতায় জোয়ারের বর্ণনায় কবির পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রাকৃতিক জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। গীতাঞ্জলি ও গীতালির কোনো কবিতায়ই উল্লেখ করবার মতো বিজ্ঞানের কোনো প্রভাব নেই। একমাত্র গীতিমাল্যের 'এই যে এরা আঙিনাতে' নামক গানটির শেষদিকে কবির বিজ্ঞান-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়—

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।

এই সময়ে (১৩১০-১৩২১) লেখা অপর তিনটি কাব্য শিশু (১৩১০ সালে লিখিত), স্মরণ (১৩১০ সালে রচিত) ও উৎসর্গ (১৩১০)। এদের প্রথম দু'টিতে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। একমাত্র উৎসর্গের কোনো কোনো কবিতায় বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব পড়েছে।

গীতিমাল্যের পরবর্তী কাব্য বলাকায় (১৩২৩) বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব নেই বটে, কিন্তু কাব্যটির মূলে যে প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে, সে দিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, এই কাব্যেই বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের যে গতিচাঞ্চল্যকে কবি জীবনধর্ম ও উন্নতিলক্ষণ বলেছেন, তা বৈজ্ঞানিকের চিন্তাদর্শের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। বিজ্ঞানের মতেও গতিই জীবন, চাঞ্চল্যই প্রাণধর্ম। হংসবলাকাকে কেন্দ্র করে গতিময় বিশ্বচরাচরের চিরন্তন চাঞ্চল্য কেমন করে কবির চোখে ধরা পড়ল, কবি-প্রদত্ত বিজ্ঞান-সত্য-নির্ভর বর্ণনা থেকেই তা জানতে পারি—

> সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল— এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে ; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী— 'এখানে নয়' 'এখানে নয়'।[৫]

বলাকার পরবর্তীকালে প্রকাশিত কয়েকটি কাব্য পলাতকা (১৩২৫), শিশু ভোলানাথ (১৩২৯), লেখন (১৩৩৪), মহুয়া (১৩৩৬) ও স্ফুলিঙ্গ (১৩৫২)। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ছাড়া আর কোনোটিতেই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই।

---

৫ বলাকা (শ্রাবণ ১৩৬৩) পরিশিষ্ট ; পৃ: ১১৯।

মহুয়ার পরে প্রকাশিত পর পর কয়েকটি কাব্যেই বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব নজরে পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বনবাণী (১৩৩৮)। এই কাব্যে বৃক্ষ ও লতা-গুল্মের সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় যোগসূত্রের কথা বর্ণনার কালে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতার একাংশ—

সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে—
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।

বনবাণীর পরবর্তী রচনা পরিশেষ (১৩৩৯) কাব্যের 'প্রণাম' কবিতায়ও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। প্রায় একই সময়ে লেখা পুনশ্চের (১৩৩৯) কোনো কোনো কবিতায় উপমা-প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বীথিকা (১৩৪২) ও সানাই (১৩৪৭) কাব্যের কোনো কোনো কবিতায়ও উপমা-প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক সত্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ সানাই কাব্যের 'জ্যোতির্বাষ্প' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুনশ্চের কথা বলছিলাম। এর পরবর্তী কয়েকটি কবিতাগ্রন্থেও বিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। পুনশ্চের সমসাময়িক রচনা বিচিত্রিতা ও বীথিকায় বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আগেই বলেছি। এবার সমসাময়িক কালের অপর কয়েকটি কাব্য শেষ সপ্তক (১৩৪২), পত্রপুট (১৩৪৩) ও শ্যামলী (১৩৪৩) নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শেষ সপ্তক কাব্যের 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' কবিতায় দেখি, সুদূরের রহস্যময় শুকতারার সঙ্গে কবির এক নিগূঢ় প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। তবে বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে নয়, এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জীবনের সত্য ও সুন্দরকে ভিত্তি করে। শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত তত্ত্ব নয়, গ্রহটির অনাবিষ্কৃত রহস্যই কবির কাছে বড়—

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।

পত্রপুট কাব্যের 'পৃথিবী' ও 'উদাসীন' কবিতায় বৈজ্ঞানিক সত্য বিধৃত। 'উদাসীন' কবিতায় চাঁদের অতীত ও বর্তমান অবস্থার কথা আশ্চর্যসুন্দর কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় অভিব্যক্ত—

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হোলো সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী॥

পত্রপুটের প্রায় একই সময়ে লেখা বিশ্বপরিচয়েও (১৩৪৪) চাঁদ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য রয়েছে।[৬]

চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছিল যে চাঁদ তার বাতাসের পরমাণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে বলে আমরা জানিনে। চাঁদকে একটা তাল-পাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।

কবির আশ্চর্য-সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ বিশ্বপরিচয়ের সমসাময়িক কালে লেখা শেষ সপ্তক ও পত্রপুটেই শুধু নয়, এই পর্বের শ্যামলী কাব্যেও বিজ্ঞানবিষয়ক সত্য ও অনুমানের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ, বিশ্ব-পরিচয় রচনাকালে কবির মনে বিজ্ঞানচিন্তার যে জোয়ার এসেছিল তার প্রতিফলন পড়েছে সেই সময়ে রচিত বিভিন্ন কাব্যে। শ্যামলীর 'আমি' কবিতায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। শ্যামলীর অন্যত্রও বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'তেঁতুলের ফুল' কবিতায় দেখি, উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে কবির জ্ঞান শুধুমাত্র গ্রন্থপাঠের মাধ্যমেই নয়, পর্যবেক্ষণ-প্রসূতও বটে।

শ্যামলীর ঠিক পরে প্রকাশিত কয়েকটি কাব্য হল খাপছাড়া (১৩৪৩), ছড়ার ছবি (১৩৪৪), প্রান্তিক (১৩৪৪) ও সেঁজুতি (১৩৪৫)। ছড়ার ছবিতে বিজ্ঞানের প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। খাপছাড়া, প্রান্তিক ও সেঁজুতির কোনো কোনো কবিতায়ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ রয়েছে।

---

৬ বিশ্বপরিচয়, ২য় সংস্করণ, মাঘ ১৩৪৪। পৃ. ৯৬।

সেঁজুতির পরবর্তী কাব্য প্রহাসিনী। ব্যঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ-প্রসঙ্গে কাব্যটির কথা আগে বলেছি। কিন্তু প্রহাসিনী কাব্যের বিভিন্ন কবিতা আলোচনা করলে দেখি, ব্যঙ্গচ্ছলেই শুধু নয়, নির্মল রসসৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই কাব্যে কবি বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'মাছিতত্ত্ব' কবিতাটি স্মরণীয়।

প্রহাসিনীর সমসাময়িক কালে প্রকাশিত প্রায় সকল কাব্যেই কমবেশী বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে। সানাই ও ছড়ায় বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আগেই বলেছি। এই সময়কার অপর কয়েকটি কাব্য আকাশপ্রদীপ (১৩৪৬), নবজাতক (১৩৪৭), রোগশয্যায় (১৩৪৭), আরোগ্য (১৩৪৭), জন্মদিনে (১৩৪৮) ও শেষলেখার (১৩৪৮) কোনো কোনো কবিতায় দেখি, চরাচরপ্রসারী কল্পনাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। আকাশপ্রদীপ কাব্যের 'বধূ' কবিতার শেষাংশ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। নবজাতকের 'কেন' ও 'প্রশ্ন' কবিতায় কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টির পরিচয় আরও সুস্পষ্ট। সূর্যের আলোর সামান্য একটা অংশ এসে এই পৃথিবীতে পড়ে। নক্ষত্রের বেলায়ও তাই। বিশ্বভুবন জুড়ে আলোকের এই বিরাট অপচয় সম্বন্ধে কবির জিজ্ঞাসা,[৭]—

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিস্রাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।

নবজাতকের 'প্রশ্ন' কবিতায় দেখি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের কথা উপলব্ধি করে আপন ক্ষুদ্রতায় কবি অভিভূত। বিরাট বিশ্বভুবনের কথা বলতে গিয়ে নীহারিকা ও তারকাপুঞ্জের বর্ণনায় কবি লিখেছেন,—

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে,
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।

---

৭ নবজাতক : 'কেন'।

কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে॥

আরোগ্য কাব্যের 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে' ও 'বিরাট মানবচিত্তে' শীর্ষক কবিতা-দু'টিতেও কবির চরাচরব্যাপী কল্পনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টির পরিচয় আছে। 'শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে' একমাত্র সত্য আদি জ্যোতি। এই আদি জ্যোতির মধ্যেই কবি নিরপেক্ষ সত্য খুঁজে পেয়েছেন। 'বিশ্বপরিচয়ে' কবির মন্তব্য—

> নিত্য ব'লে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

আদিজ্যোতিতে আরম্ভ, আদিজ্যোতির মধ্যেই আবার সমাপ্তি। এ সমাপ্তি-প্রাঙ্গণ অমৃতের প্রতীক, অমরত্বের আধার—

এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে॥[৮]

অতএব, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, সুদীর্ঘ কাব্যসাধনার বৈচিত্র্যময় তীর্থপথে বিজ্ঞান নানাভাবে কবিকে প্রভাবিত করেছে। তবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গূঢ় সত্যই কবির কাছে বড়। যে বিজ্ঞান বিশ্বভুবনের রহস্যের খবর রাখে, জগৎচক্রের মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে সে বিজ্ঞানই কবির প্রিয়। তাই দেখলেম, একদিকে ভুবনসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধকে প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে তেমনি জ্যোতির্ময় বিশ্বলোকের রহস্যময় বিজ্ঞান-বার্তা সমৃদ্ধ করেছে কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনাকে।

---

৮ রোগশয্যায়: ২০ সংখ্যক কবিতা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৮৬১-১৯৪২

শ্রীসুনীতি দেবী

বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদন-বিভাগ আমার পিতৃদেব বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। আমার অক্ষম লেখনী তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবে না জানি, তবু সন্তানের কর্তব্য হিসাবে যা পারি লিখে যাব।

১৮৬১ সাল— ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, গৌরবোজ্জ্বল প্রভাত নিয়ে উদিত হয়েছিল। নব-প্রভাতের নবরবিরশ্মি পরে ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কত মনীষী কাব্য সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি চিকিৎসাশাস্ত্র— এ সবই তাঁদের বুদ্ধির দীপ্তিতে দীপ্ত করে তুললেন। আমার পিতৃদেব তাঁদের মধ্যে একজন। গত ১৯৬১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দ্বারভাঙ্গা-হলে তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

এখানে তাঁর পারিবারিক ও কবিজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। তবে তাঁর জীবনকথা বলতে বসলে প্রথমেই মনে পড়ে যে তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে বড় কুণ্ঠিত হতেন। তাঁর বহু পুরাতন খাতায় এ বিষয়ে একটি লেখা পেয়েছি। সেটি এই : "যিনি শিবস্বরূপ হইলেও মহাকাল, তিনি এ সংসারে আমাদের জন্য চিরজীবনের ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের দেশের সমাজও মৃতের জন্য অগ্নিসংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্মৃতিস্তম্ভ নয়।· ·আমরা যে-কেহ বাংলাভাষায় দু কথা লিখিয়া থাকি, সকলেই যদি জীবনচরিত লিখিয়া অমর হইতে পারি, তাহা হইলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় সিংহাসনচ্যুত হইবেন।"

বিজয়চন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখন বলি। তাঁর পিতৃপুরুষেরা নাটোরের বারেন্দ্রব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাদশাহী আমলে 'মজুমদার' খেতাব পেয়ে ফরিদপুরে খালকুলা গ্রামে জমিদারি স্থাপন করেন। তাঁদের আসল পদবী ছিল 'মৈত্র'। এই বংশের হরচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র আমার পিতা। তাঁর মায়ের নাম নবদুর্গা দেবী। বিজয়চন্দ্র পিতামাতার অপূর্ব রূপলাবণ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতৃব্য এমন তেজস্বী ছিলেন যে, শোনা যায়, তাঁদের জীবদ্দশায় সে গ্রামে কখনও ডাকাতি হয় নি। হরচন্দ্র সেই যুগে গ্রাম্য পাঠশালায় মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন শুনে একটু অবাক লাগে। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বিজয়চন্দ্র কৃষ্ণনগরে পড়তে আসেন। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর সহপাঠী হন, ও সেই থেকে এই দুজনের সখ্যবন্ধন চিরজীবন অটুট ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে পিতৃদেব 'দ্বাদশী-স্মৃতি' নামে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর অম্লান বন্ধুপ্রীতির পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কলেজী শিক্ষার জন্য পিতাকে কলকাতায় আসতে হয়। সেখানে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপাসনায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই কারণে পরিবারবর্গের বিরাগভাজন হওয়াতে বি. এ. পরীক্ষার পরই উড়িষ্যার বামড়া রাজ্যে চাকরি নিয়ে চলে যান। বাইশ বছরের যুবক শ্বাপদসংকুল দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে একা যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। পথে কটকে ভক্তকবি মধুসূদন রাও-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

মধুসূদন এঁর গুণে এত মুগ্ধ হন যে পরে তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বাসন্তী দেবী গৃহেই শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং নিজ পিতার নিকট সংস্কৃত-সাহিত্য ভালোরূপেই পড়েছিলেন। বিজয়চন্দ্রের বিবাহের পর তাঁর প্রিয়বন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকার হেসে বলেছিলেন, "বিজয় সংস্কৃত-পণ্ডিত বিয়ে করে আমাদের বিপদে ফেলল। আমরা তো নূতন বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পাব না।"

বিবাহের পর কিছুদিন পুরী ও সম্বলপুর জিলা স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাজ করে আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। সে জন্য কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনা করতে হত বলে পত্নীকে চুঁচুড়ায় প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গৃহে রেখে আসেন। ভূদেববাবুর পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। বাবার কাছে শুনেছি, ভূদেববাবুর কাছে তাঁর স্বাদেশিকতার দীক্ষা। স্বদেশী-আন্দোলনের আগে থেকেই তিনি যথাসম্ভব স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতেন। স্বদেশী যুগে তাঁর 'ভারতপতাকা' গানটি খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল।

বি. এল. পরীক্ষা পাস করে তিনি সম্বলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন ও অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেন। পারিবারিক মনোমালিন্য ইতিমধ্যে দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁর জননী তাঁর কাছে থাকতে আসেন ও পরে তাঁর গৃহেই দেহত্যাগ করেন। এর পর তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যু হলে অন্য ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সকল ভার তিনি গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁর কাছে থেকেই লেখাপড়া শিখে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

সম্বলপুরের নিকটবর্তী উড়িষ্যার কয়েকটি মিত্ররাজ্যেরও তিনি আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। এর মধ্যে সোনপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজপরিবার দু-তিন পুরুষ ধরে তাঁকে যে শুধু 'গুরু' বলে ডাকতেন তা নয়, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এঁরা তাঁকে অন্তরের ভক্তি-ভালোবাসা দিয়ে এসেছেন। ওকালতি করতে করতে নৃতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এমন গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন যে, সময়ে সময়ে নিজের জীবিকার্জনের উপায়কেও উপেক্ষা করেছেন। সংস্কৃত পালি ওড়িয়া উর্দু এসব ছাড়া আদিবাসীদের ভাষাও তিনি জানতেন। তারই মধ্যে প্রবন্ধ কবিতা উপন্যাস ও নাটক লেখাও চলত। গুরুগম্ভীর বিষয়ে গবেষণার মধ্যে কি করে অমন সরস মধুর কবিতা লিখতেন ভেবে আমাদের আশ্চর্য বোধ হত। এই সময়ের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ সালে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি লণ্ডনের ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

সম্বলপুরে তাঁর বাড়ি একদিনের জন্যও অতিথিশূন্য থাকত না, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাসের পর মাস, এমনকি কয়েক বছরও, আমাদের বাড়িতে থেকে একেবারে নিজের হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের সেবাতে আমার মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

শত কাজের মধ্যে বাগানে বাবার নিজ হাতে ফুল ফল তোলা ও মালীদের কাজ তদারক করা বাদ যেত না। বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে কত যে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সম্বলপুরের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতে শিখিয়েছেন। সংগীত ও চিত্রকলাও তাঁর কম প্রিয় ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল আমায় কোলের কাছে টেনে তাঁর নবরচিত গান শেখাচ্ছেন, আর বাবার উদাত্ত কণ্ঠ এসে তাতে মিশে বাড়ি গম্‌গম্‌ করছে— এসব স্মৃতি ভুলবার নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আবার তোরা মানুষ হ' গানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ তেজস্বী মন সব ক্ষুদ্রতার গণ্ডি এড়িয়ে এর মধ্যে বিশ্বপ্রেমের

আবেদনটুকু গভীরভাবে উপলব্ধি করত। রবীন্দ্রনাথের 'একলা চল রে,' গাইতে গাইতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। চোখ যাবার পর 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ' -গানটি শুনতে শুনতে তাঁর চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটে উঠত যেন পরমসুন্দর তাঁর চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আমাদের বাড়িতে এমন-একটি সংস্কৃতির আবহাওয়া তিনি রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে বেড়ে ওঠাতে আমরা পুরাতন ও নবীন সব কবি ও সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে বিনা আয়াসেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মজার কবিতা, হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কবিতা, মাইকেলের গম্ভীর অমিত্রাক্ষর কবিতা সবই তিনি যথোপযুক্ত স্বরে পড়ে যেতেন। কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য তিনি যে সুরে ফোটাতেন তা লেখায় প্রকাশ অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতা আমাদের তখন বুঝবার বয়স হয় নি, তাও তাঁর কণ্ঠে শুনে আমরা যেন কাব্যের মধুর রসে ডুবে যেতাম। তাঁর আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যেক ভাষা তার বিশিষ্ট উচ্চারণে বলতেন। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরাজি উর্দু সংস্কৃত প্রভৃতি আর কারও মুখে শুনেছি বলে মনে হয় না।

তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে প্রতিদিন স্মরণ করতেন। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল মনীষীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁর সুহৃদ্‌ ও সখা ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির সকলের মধ্যে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা দেবীর সঙ্গে। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্বদাই পত্রবিনিময় হত। তার অনেকগুলি 'প্রবাসী'তে[১] প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি পড়লে দুজনের আন্তরিক যোগের কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। ১৯১৪ সালে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে তিনি সম্বলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন।

একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষের প্রতিকৃতি বেশ ভালো আঁকতেন। যে যে মুখশ্রী তাঁর মনে ছাপ রাখত একটি খাতায় সেইসব মুখের ছবি এঁকে রাখতেন। পিতার প্রতিভাদীপ্ত ললাট ও আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল বলে প্রথম আলাপেই তিনি তাঁর সেই খাতায় বাবার প্রতিকৃতি এঁকে রাখেন। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং শেষজীবনে অনেকদিন আমাদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে একত্র বাস করে গিয়েছিলেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি যে কি আদর্শপুরুষ ছিলেন তা বলবার ভাষা আমার নেই। তাঁর বড় নাতনি বলেছে, 'দাদা আমাদের জীবনের সূর্য ছিলেন'। এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই। তিনি বড় থেকে ছোট সকলের অন্তর ও বাহিরের সব অন্ধকার দূর করে আলোকময় করে রেখেছিলেন। শিশুদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতেন যে তারা তাদের সব কথা নিশ্চিন্তমনে তাঁকে বলত ও তাঁকে সব রকম খেলার সাথি করে নিত। খাবার সময়ে সকলে একত্র বসলে কত মজার মজার ছড়া কাটতেন— মাছ ফল মিষ্টান্ন এসব নিয়ে মুখে-মুখে কবিতা রচনা করে তাদের মনোরঞ্জন করতেন। আবার পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও কেউ উঠতে চাইতেন না। যুবকের দলও তাঁর কাছে কত যে আসতেন তার

১ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

ইয়ত্তা নেই। অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও লোকের কাছে পাণ্ডিত্য ফলাও করতেন না। সকলের মতামত ধৈর্য ধরে শুনতেন, নিজের মত জোর করে কারও উপর চাপাতেন না। শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারেও 'গুরুগিরি' করতে দেখি নি তাঁকে। তাঁর মত মজলিসী লোক এ যুগে দুর্লভ। জমিদারি ছেড়ে আসার অনেক পরেও যখন গ্রামে গিয়েছেন, প্রজারা দলে দলে এসে তাঁর কাছে সুখদুঃখের কথা বলেছে, প্রাণের প্রীতি জানিয়েছে।

জীবনে যখন পূর্ণোদ্যমে কাজ করছেন তখন অতিরিক্ত চোখের শ্রমে চক্ষু দুটি অন্ধ হল। তখন বিধাতার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও তাঁর মুখে শোনা যায় নি। দিলীপকুমার রায় 'ভারতজ্যোতি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৩৬৫ শ্রাবণ মাসে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "সব মানুষই দুঃখে একটু 'আহা-উহু' শুনতে ভালোবাসে, কিন্তু বিজয়চন্দ্র এসবের উর্ধ্বে ছিলেন।" কেউ তাঁর অসহায়তা নিয়ে শোকপ্রকাশ করলে সে কথা চাপা দিয়ে হাসিমুখে অন্য গল্প করেছেন। তাঁর 'হেঁয়ালি' কাব্যগ্রন্থে 'অন্ধের মৃগয়া' শীর্ষক কবিতাগুলিতে এই দুঃখজয়ী বীরের বিরাট মনুষ্যত্ব ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অন্ধ অবস্থায় আঠাশ বছর বেঁচে ছিলেন। সে বছরগুলি একটিও বৃথায় যায় নি। সে যেন এক ঐশ্বর্যময় যুগ। কলকাতায় আসার পরই সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন-চারটি বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁর ছাত্রদের কাছে শুনেছি তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কথা। কোন্ বইয়ে কোন্ পাতায় কি আছে বলে দিতেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে পড়াবার উপায় ছিল না বটে, তবে ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন, এমন ছিল তাঁর সময়জ্ঞান। এই বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করেছেন, 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, গবেষণামূলক বাংলাভাষার ইতিহাস, ওড়িয়া প্রাচীন কবিতা সংকলন, জীবনবাণী (প্রবন্ধমালা), কবিতার বই হেঁয়ালি, রুচিরা, ছিটেফোঁটা ও আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, স্কুল ও কলেজ পাঠ্য বইও লিখেছেন। সোনপুর রাজ্যের আইন-উপদেষ্টার কাজও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়েছেন। যখন অবিশ্রাম মুখে বলে যেতেন, লেখক বা লেখিকা বদল হত বারবার, কারণ একজন অত লিখে উঠতে পারত না— কিন্তু তাঁর বলায় শ্রান্তি ছিল না। মনের শক্তির সঙ্গে শারীরিক শক্তিও যেন তাল রেখে চলত। অন্ধ হয়ে চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হলেও, কারও হাত ধরে মাইলের পর মাইল স্বচ্ছন্দগতিতে হেঁটে যেতেন। চোখ থাকতে তাঁর সঙ্গে সাঁতারে কেউ পেরে উঠত না। অন্য ব্যায়াম করতে দেখি নি, তবে হাঁটা বা টেনিস্ খেলা দৈনিক কাজ ছিল।

তাঁর বিরাট গ্রন্থাগারের কথাও একটু বলি। জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য বিষয়ে নতুন কিছু প্রকাশিত হলে তখনই কিনতেন। বাড়ির এমন ঘর ছিল না যেখানে বই ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য সংস্কৃত ও পালি এবং ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে।

তাঁর সব বইয়ের আলোচনার স্থান এটা নয়। বাংলাভাষার গবেষক ছাত্রেরা তাঁর লেখা নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেছেন। তাঁর সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা, খাঁটি সংস্কৃত কবিতা, তাঁর ছন্দ মিল প্রভৃতির কথা নানা পত্রিকায় আলোচিত হতে দেখেছি। তাঁর কবিতার মিষ্টত্ব এখনও অনেক প্রবীণেরা ভোলেন নি। তাঁর 'ঠাকুরমা সেই' দীর্ঘ কবিতাটি সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন "এত মিষ্টি কবিতা কমই পড়েছি।" তাঁর কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।—

ঠাকুরমা সেই ছেলেবেলায় ঘুম-পাড়ানর ফন্দিতে,
এক যে রাজার মজার গল্পের হুঁ-হুঁ-জোড়া সন্ধিতে
এমনি করে ঢেলে দিতেন নিদ্রালসের আবল্লি,
নেতিয়ে পড়তে হ'তই ঘুমে রাজা রানী যা বল্লেই।· ·

নানা উপন্যাসের গ্রন্থে ভরা এখন আলমারি ;
রুদ্ধ তাহে কেবল শুদ্ধ বাতাসটুকু জানলারই।· ·

নেইক তাজা শাঁসাল প্রাণ! গল্পে এখন শানায় কই ?
পরীর রাজ্যে ওড়ার মত শক্তি আমার ডানায় কই ?
হারানো সে পরান কোথা কৌতূহলে কান-খাড়া ?
মিইয়ে আছি বাসি মুড়ি, কিংবা চিটে ধানঝাড়া।

কাব নজরুল একবার বলেছিলেন, "আপনার লেখায় যে অপ্রত্যাশিত মিলগুলি এসে পড়ে তা পড়তে ভারি চমৎকার লাগে।"

তার পর গ্রামের নদী চন্দনার বিষয় যে লিখেছেন—

আয় রে ছুটে প্রাণের তটে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা

তাও যেন প্রত্যেকের মনে ঢেউয়ের দোলা দিয়ে যায়। নববধূ-বরণে শাশুড়ী যখন বলছেন —

পরের মেয়ে ? ও মা, কথা বললি তোরা কাকে ?
পরের মেয়ে হলে তুলে নিতে কোলে
উঠত কি রে সুখের ঢেউ বুকের থাকে থাকে ?

তখন সেই কোমলহৃদয়া মায়ের সঙ্গে আমাদেরও বুক ভরে ওঠে না কি ?

সত্যই তাঁর হৃদয় যেমন বিশাল তেমনই কোমল ছিল। আত্মীয় ছাড়াও বহু লোক তার সাক্ষ্য দেবেন। একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলছিলেন, "আমরা কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরলে তাঁর চোখ-দুটি আনন্দে এমন দীপ্ত হয়ে উঠত যে মনেই হত না তিনি অন্ধ।"

তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হল সবটুকুই তাঁর নিজস্ব। অন্য কারও ছাপ তাতে নেই। শুধু গম্ভীর, শুধু মিষ্ট, শুধু নিখুঁত ছন্দ ও মিলই তাঁর কবিতা নয়। তা ছিল একেবারে প্রাণবন্ত। হাসি ও ব্যঙ্গের কবিতায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর 'সৃষ্টির রহস্য' 'বাঙ্গালার পলিটিক্‌স্‌' 'হায় রে সেকাল' এই কবিতাগুলি এখনও অনেকের কণ্ঠস্থ।

বাংলার পলিটিশিয়ান যে ভেবে মরেন —

প্লেগে নাকি হয় মাটি
হনলুলু, ওটাহাটি,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোমলা স্কাইনে ?
কি হবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাই নে।

কিংবা

আইরিশ বিলে নাকি
লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি,
মেরেছে থাপ্পড় বেলী ধরিয়া ও'ব্রাইনে।
যায় দিবা অনিদ্রায়,
পলিটিক্‌স্‌-ভাবনায়

ইত্যাদি ১৯০০ সালে লেখা কবিতা এখনকার রাজনীতিবিদ্‌দের সম্বন্ধেও খাটে না কি? 'হায় রে সেকাল' কবিতায় বৃদ্ধ যখন আধুনিকদের গালাগালি দেওয়া শেষ করবার সময় স্বগতোক্তি করেন: 'সেকালেই বা কি করেছি তাও তো জানি নে' তখন কি না হেসে থাকা যায়? ১৮৯২ সালে লেখা 'শাব্দপ্রেম বা শ্রীমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী' কবিতাটির দুটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করছি—

নামটি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা,
শ্বশুর বলেন, মন্দ কি?— তবে একটু লম্বা।

বাকিটা পাঠকপাঠিকা নিজেরা পড়ে উপভোগ করবেন।

তাঁর বই এখন বাজারে দুর্লভ। বিজ্ঞাপনের যুগে তাঁর বই বিনা-বিজ্ঞাপনে বিক্রী হয়ে যেত, এটা তাঁর লোকপ্রিয়তারই পরিচয়। তাঁর শেষবয়সের কবিতাগ্রন্থ 'যজ্ঞভস্ম' ও 'রুচিরা' এখনও কিছু পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকা তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। এখন সেসব খুঁজে পাওয়াও কঠিন। শিশুসাহিত্যেও তাঁর দান কিছু কম নয়। পুরনো মুকুল সন্দেশ ও রামধনুতে সেগুলি পাওয়া যাবে। তাঁর ধাঁধাগুলিও ভারি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ ছিল।

তাঁর 'জীবনবাণী' বইটি তাঁর জীবনদর্শনের মূর্ত ছবি। তিনি চোখ বুজে ধ্যানাসনে বসে ভগবানকে খোঁজেন নি, কিন্তু ভগবানে কতটা বিশ্বাস থাকলে এমন বীরের মত সব অসহনীয় ব্যথাও হাসিমুখে বহন করা যায় তা আমরা সবাই বুঝতে পারি। তাঁর একটি গানে প্রশ্ন আছে:

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?

তার উত্তরে নিজেই বলেছেন যে—

ধ্যানে, জ্ঞানে, সুখের ফুল্ল বুকে বা নিজের বেদনার আকুলতায় তাঁকে পাই নি।

কবে কোথায় পরের ব্যথায় আকুল হয়ে কেঁদেছি,
মন ভুলায়ে হাত বুলায়ে কখন কাকে সেধেছি,
সেথায় বুঝি আমায় খোঁজে এসেছিলে প্রেমময়!

—

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ

ফুলশর, ১৯০৪ ॥ যজ্ঞভস্ম, ১৯০৪ ॥ পঞ্চকমালা, ১৯১০ ॥ কালিদাস, ১৯১১ ॥ হেঁয়ালি, ১৯১৫ ॥ প্রাচীন সভ্যতা, ১৯১৮ ॥ গীতগোবিন্দ: মূল ও অনুবাদ, ১৯১৯। জীবনবাণী, ১৯৩৩ ॥

সম্পাদিত গ্রন্থ

সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী ॥ বঙ্গবাণী ॥

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৮৬১ - ১৯৪২

নীলরতন সরকার
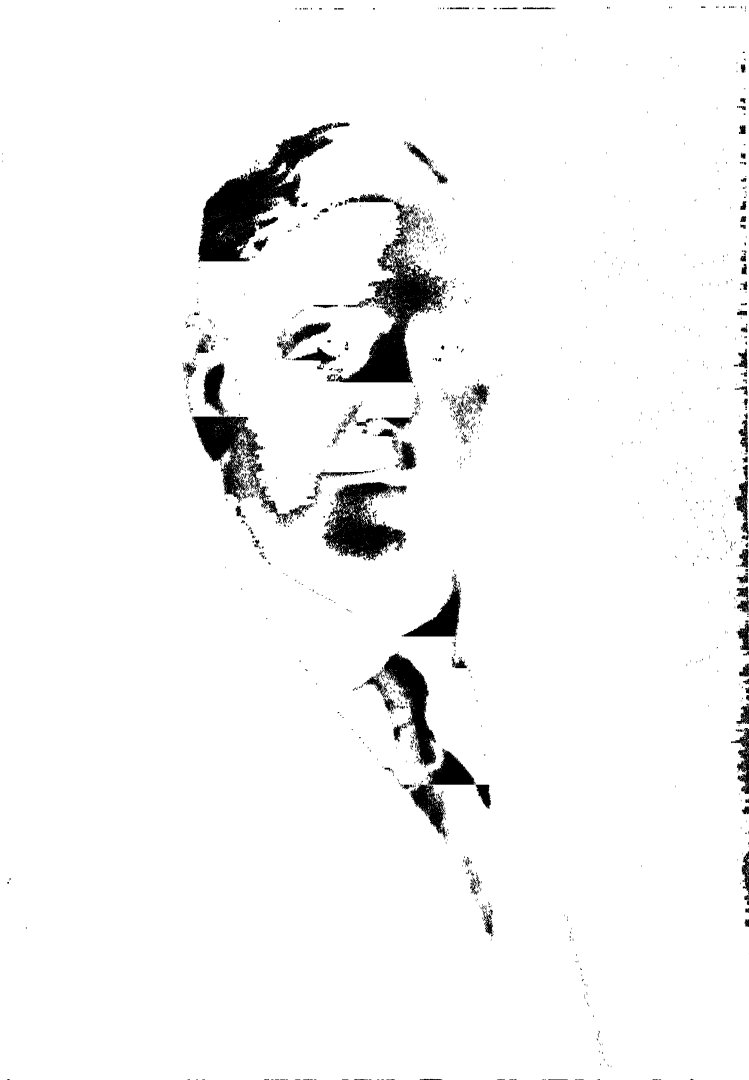
১৮৬১ - ১৯৪৩

নীলরতন সরকার ১৮৬১-১৯৪৩

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জীবনের মূল্য কি?

অবশ্য মানুষমাত্রেই এবং প্রাণীমাত্রেই, নিজের জীবনকে অমূল্য মনে করে— অন্ততঃপক্ষে যতদিন না তাহার জীবন রোগে বা ব্যর্থতায় বা শোকেতাপে দুর্বহ হইয়া পড়ে। কিন্তু সমাজ দেশ ও জাতি কাহারও জীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে তাহার যাচাই করে বিভিন্ন পন্থায়। মান-মর্যাদা খ্যাতি-প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য-প্রতাপ এ সকলের সাময়িকভাবে মূল্য পাইয়া থাকেন প্রায় সকল ধনীমানী বা যশঃপ্রতাপ-শালী লোকমাত্রেই, বিশেষ, সমাজের এক শ্রেণীর লোকের কাছে। কিন্তু সেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা ঐশ্বর্য-প্রভাব যদি লোকহিতকারী কোনো কাজে নিযুক্ত না হয়, দেশের ও দশের কোনো উপকারে না আসে তবে তাহার মূল্য কয়জনে কতদিন দেয়?

সমাজ যদি উন্নত বা উন্নতিকামী হয়, দেশ ও জাতি যদি জাগ্রত ও প্রগতিশীল হয়, তবে সেই জীবনকেই মূল্যবান বলা হয় যে-জীবনের লক্ষ্য দেশ জাতি ও সমাজকে প্রগতির পথে ও উন্নততর জীবনের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা। সেই জীবনকেই মহামূল্য বলা হয় যাহা সমগ্র জীবনযাত্রা পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হয় নাই, অন্যদিকে সে জীবনের পরিণতি যাহাই হউক না কেন। যে জীবনের যাত্রাপথ নিরুদ্দেশযাত্রার মত বা স্বার্থসিদ্ধির অন্বেষণের মত, তাহার মূল্যই-বা কি মানই-বা কি?

আমাদের বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্যক্রমে গত শতাব্দীতে এরূপ কয়েকজন মনীষী মহাপুরুষ এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা একদিকে যেমন জ্ঞানেগুণে প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ধনেমানে দেশ-দেশান্তরে খ্যাতিলাভ করেন অন্যদিকে তেমনই তাঁহাদের সকল শক্তিসামর্থ্য ও মনীষা দেশের ও জনসাধারণের উন্নয়নে ব্যাপক ও পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন একই বৎসরে আগে পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আজীবন সৌহার্দ্য ছিল। ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মধ্যম ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার।

জন্মকালে ইঁহাদের তিন জনের জীবনপথের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, কিন্তু পূর্ণবয়সের আদর্শবাদ ও আত্মনিবেদনে ইঁহাদের মধ্যে একইভাবের প্রেরণার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ধনেমানে প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। তাঁহার পরের জীবন সর্বজনবিদিত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মধ্যবিত্ত অবস্থার। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশযাত্রা করিতে তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তির সাহায্য লইতে হয় কিন্তু এ দেশে শিক্ষালাভের জন্য তাঁহাকে কোনো কষ্ট পাইতে হয় নাই। পরের জীবনে তাঁহার পথ ছিল সহজ ও সরল।

নীলরতন সরকারের জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় অতি শৈশবে। ২৪-পরগনা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ নেতরাগ্রামে ইংরাজি ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবরে তিনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার পূর্বে যশোহরে ছিল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শোভাবাজারের দেব-পরিবারের সহিত ইহার দূর-সম্পর্ক ছিল। পিতা নন্দলাল সরকারের ইনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। যখন ইঁহার বয়স

তিন বৎসর মাত্র সেই সময় এক প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসে এই পরিবারের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে চাষের জমিও নোনাজলে নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া নন্দলাল সরকার অসহায় অবস্থায় জয়নগরে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

সেখানেও সংসার সহজ অবস্থায় ছিল না। নন্দলাল সরকার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। এই বৃহৎ পরিবারের সন্তানদিগকে পালনের জন্য স্নেহময়ী মাতা থাকমণি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া ও অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া সংসার চালাইতেন। এইভাবে নিজের উপর সমস্ত অভাব-অনটনের ভার টানিয়া লওয়ায় তাঁহার শরীর ভাঙিয়া যায়। নীলরতনের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন তাঁহার মাতা দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রায় বিনা চিকিৎসায়, মৃত্যুমুখে পতিত হন। মায়ের এইরূপ অসহায় অবস্থায় মৃত্যু উঁহার কিশোরমনে গভীর রেখাপাত করে এবং সেই মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়াই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া রুগ্ন ও আর্ত মানবের কষ্টলাঘব করিতে আজীবন চেষ্টিত থাকিবেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্রের যে উদারতা, আত্মনিবেদন ও স্নিগ্ধ মিষ্ট ব্যবহার পরের জীবনে খ্যাত হয় সে সবই এই স্নেহমমতাময়ী মাতার দান।

তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয় জয়নগরে এবং সেখানেই স্কুল হইতে ১৮৭৬ সালে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি ঐ বৎসরই ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে প্রবেশ করেন। ঐ সময় হইতেই তাঁহাকে নিজের শিক্ষার ও ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সমস্ত পরিবার ঐ সময়ে কলিকাতা চলিয়া আসায় সেই পরিবার প্রতিপালনও এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র নিজের শিক্ষা বন্ধ করিয়া স্কুলমাস্টারি করিয়া ঐ সমস্যা আংশিকভাবে পূরণ করিয়া মধ্যমভ্রাতার উচ্চশিক্ষার পথ মুক্ত না করিয়া দিলে নীলরতনের বিদ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা হয়তো ব্যর্থ হইত। জ্যেষ্ঠের এই মহত্ত্ব তিনি কোনোদিন ভুলেন নাই এবং নিজে উপার্জনক্ষম হইবামাত্রই তিনি দাদাকে সম্পূর্ণরূপে সংসারভার হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের স্বার্থত্যাগ সত্ত্বেও তাঁহাকে শিক্ষকের কাজ করিয়া ও বৃত্তিলাভ করিয়া নিজের শিক্ষার খরচ ও আংশিকভাবে সংসারের খরচ মিটাইতে হয়।

তিনি ক্যাম্বেলে প্রবেশ করেন ১৮৭৮ সালে এবং ১৮৭৯ সালে কৃতিত্বের সহিত বাংলাভাষায় ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ ডাঃ এস. সি. ম্যাকেঞ্জি তাঁহার মেধা ও চিকিৎসায় দক্ষতা দৃষ্টে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতে উৎসাহ দেন। এবং সেই চেষ্টায় তিনি প্রথমে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি কলেজ ও পরে মেট্রোপলিটন (এখন বিদ্যাসাগর) কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৮৩ সালে এল. এ. (এখন আই. এ.) ও ১৮৮৫ সালে বি. এ. পাস করেন। ঐ সময় ঐ জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি কলেজে নরেন্দ্রনাথ দত্ত— পরের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ— তাঁহার সহপাঠী ছিলেন!

বি. এ. পাস করিবার পর তিনি মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার শিক্ষক ডাঃ ম্যাকেঞ্জি মেডিকাল কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইবার সুযোগ দেন। ১৮৮৮ সালে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেয়ো হাসপাতালের হাউস সার্জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে থাকিতেই তিনি ১৮৮৯ সালে এম. এ. ও এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৯ সালেই তিনি বরিশালের ব্রাহ্মপ্রচারক গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা নির্মলাকে বিবাহ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

এই শিক্ষা ও বিদ্যালাভের বৃত্তান্ত শুনিতে প্রায় যে-কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানের পড়াশুনার ইতিবৃত্তেরই মত মনে হয়। কিন্তু ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্যন্ত বিদ্যার্থী নীলরতনের জীবন যদি-বা অপেক্ষাকৃত কম অভাব-অনটনের মধ্যে চলে, ১৮৭৯ সালের পর একদিকে সংসার অচল অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার অত্যধিক খরচ— এই দুই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া উপার্জন ও অর্থসঞ্চয়ের প্রশ্ন সমাধান করিতে হয়। অটুট দৃঢ়সংকল্প ও অসাধারণ মেধা না থাকিলে তাঁহার উচ্চশিক্ষার অভিলাষে এইখানেই জলাঞ্জলি দিয়া অন্য শত শত 'ভার্নাকুলার' ডাক্তারের মত তাঁহাকে দিনগত-পাপক্ষয়ে জীবনযাপন করিতে হইত। কিন্তু 'সুখ-সোয়াস্তি'র কথা ভুলিয়া তিনি এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮১ পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তিনি কলেজে ভর্তি হইতে পারেন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৮ সালে পাস করিয়া মেয়ো হাসপাতালে কাজ পাওয়া পর্যন্ত এই অর্থাগমের জন্য পরিশ্রম ও অভাব-অনটন সমানে চলে, উপরন্তু উচ্চশিক্ষালাভের জন্য অনন্যমনা হইয়া অধ্যয়ন ও হাসপাতালে ফলিত-চিকিৎসার নিরীক্ষণ সমান অধ্যবসায়ের সহিত চালাইতে হয়। যে অসীমধৈর্য দৃঢ়চিত্ত ও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের ক্ষমতা তাঁহাকে ছাত্রজীবনে সফল করে তাঁহার কর্মজীবনে সেই সকল গুণ তাঁহাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। উপরন্তু তাঁহার উদার সহানুভূতিযুক্ত হৃদয় এবং নির্মল দ্বেষ-হিংসা মুক্ত মন তাঁহাকে ডাক্তার-বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে সর্বজনপ্রিয় করে।

তাঁহার কর্মজীবনের সীমা সুদূরপ্রসারিত ছিল। চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, স্বদেশীযুগের শিল্পজাগরণের অন্যতম কর্ণধার ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃবর্গের সহযোগী রূপে তিনি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরিচিত ও খ্যাত ছিলেন।

মেডিকাল কলেজে ছাত্র অবস্থাতেই তাঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রতিভার নিদর্শন দেখা দেয়। দারিদ্র্যের বিষম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি গুডিভ স্কলার হইয়াছিলেন এবং ধাত্রীবিদ্যা ও মেডিকাল জুরিস্‌প্রুডেন্সে অনার্স প্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনের এই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ জ্ঞান সমীক্ষা ও দক্ষতার জন্য খ্যাতিলাভের পূর্বাভাস মাত্র ছিল। এই খ্যাতির মূলে একদিকে যেমন ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্যদিকে ছিল রোগীর প্রতি সহানুভূতি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সার্‌ নীলরতনকে শ্রদ্ধা-নিবেদনে বলিয়াছেন :

"আমি প্রথম যখন তাঁহাকে রোগী পরীক্ষা করিতে দেখি তখনই রোগীর আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁহার ভদ্র ব্যবহার এবং রোগের বিবরণ শোনায় তাঁহার অশেষ ধৈর্য্য লক্ষ্য করি। সেই সময়েই আমি দেখি যে, রোগের খুঁটিনাটি ও ক্ষুদ্রতম বৃত্তান্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি কিরূপ সজাগ ও প্রখর। পরে আমি জানিয়াছিলাম যে রোগ-সম্পর্কিত সূক্ষ্মতম বিষয়ের প্রতি এইরূপ তীক্ষ্ণ সমীক্ষণই তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে এরূপ উচ্চাসন দিয়াছে।"

চিকিৎসার ক্ষেত্রে পূর্বেকার দিনে 'সাহেব ডাক্তার', অর্থাৎ আই. এম্‌. এস. ও আর. এ. এম্‌. সি. (I. M. S ও R. A. M. C.) শ্রেণীর সেনানী পদস্থ চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসক সর্বোচ্চ স্থান পাইতেন। এদেশীয় চিকিৎসক যতই বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ হউন-না কেন মর্যাদায় ও পদগৌরবে উহাদের সমশ্রেণীতে স্থান পাইতেন না। 'ভিজিট' অর্থাৎ দক্ষিণার পরিমাণ ঐ সাহেবদের বা দুই-চারিজন আই. এম্‌. এস্‌.-শ্রেণীর ভারতীয়ের বেলায় হইত ১৬৲ টাকা, দেশীয়দের ২৲ ৪৲ বা ৮৲ টাকাই যথেষ্ট মনে করা হইত। ডাক্তার

নীলরতন সরকার তাঁহার সহপাঠী বন্ধু সার্জন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে বলেন যে ইহা যথাযথ নহে এবং ভারতীয় চিকিৎসকগণের উচিত ইহাকে অপমান বলিয়া বিচার করা। এই বলিয়া তিনি স্থির করেন যে তিনিও ১৬৲ টাকাই দক্ষিণা লইবেন। কিছুদিন পরে ডাক্তার সর্বাধিকারীও তাঁহার চিকিৎসক পিতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ ভিজিটই গ্রাহ্য করেন। ভারতীয় চিকিৎসকদিগের আত্মসম্মান ও মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই প্রথম সোপান গঠন এইভাবে ডাক্তার নীলরতন সরকার করেন।

কিন্তু অর্থাগমই তাঁহার চিকিৎসক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। উপার্জন তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন এবং শিল্প-অনুশীলনে ও জনসাধারণের উন্নয়ন এবং জাতীয় প্রগতির নানা আয়োজনে জলের মত অর্থ ব্যয় না করিলে তিনি বিশাল সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন, ইহা সত্য। কিন্তু রোগক্লিষ্ট দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি এতই প্রবল ছিল যে অসংখ্য রোগী তাঁহার কাছে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা ও ব্যবস্থা পাইত। যখন তাঁহার শতবার্ষিকীর ঘোষণা হয় সেই সময় একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি পূর্বপাকিস্তান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন এক প্রকাশকের কার্যালয়ে লেখককে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে, ডাক্তার সরকারের স্মৃতিতর্পণে তাঁহারও সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার আছে।

তিনি বলেন, "আমি তখন ছাত্র; আমার সম্বল কিছু বৃত্তি এবং অন্যভাবে সংগৃহীত অতি অল্প টাকা। সেই সময় একবার আমার পিতা দীর্ঘকাল রোগে ক্লিষ্ট ও জীর্ণ হইয়া চিকিৎসার শেষ চেষ্টায় কলিকাতায় আসেন। দেশের চিকিৎসকেরা রোগের কোনও উপশম করিতে না পারিয়া সবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসা করাইতে পরামর্শ দেন। সেই শেষ চেষ্টায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া আমার মেসে উঠেন।

"আমি স্থানীয় নামকরা ডাক্তারকে ডাকিয়া তাঁহাকে দেখাই। কিছুদিন পরে ঐ ডাক্তার আমায় বলেন যে তিনি প্রতিকারের কোনও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না এবং রোগীকে একবার সার্ নীলরতনকে দেখাইলে ভালো হয়। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে সার্ নীলরতনের ভিজিট চৌষট্টি টাকা, তবে তাঁহার ঘরে দেখাইলে বত্রিশ টাকা। আমার অর্থসামর্থ্য অল্প, কিন্তু অন্যদিকে পিতার জীবনমরণ সমস্যা। কোনোক্রমে বত্রিশ টাকার ব্যবস্থা করিয়া, একদিন গিয়া সার্ নীলরতনের সঙ্গে দিন ও সময় ঠিক করিলাম। সেইদিন যথাসময়ে পিতাকে লইয়া গেলাম। সার্ নীলরতন প্রথমে রোগের বিষয় ও পরে রোগীর খাওয়া থাকা ও পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ও শুনিলেন। তাহার পরে অতি যত্নের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিয়া দিয়া আহার পথ্য ও রোগীর সেবার খুঁটিনাটি বিশদভাবে আমাদের বুঝাইলেন। পরে এই ব্যবস্থায় পনেরো দিন চলিয়া পুনর্বার তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। আমি উঠিবার সময় টাকা দিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'ওসব পরে দেখা যাইবে।' আমার তো চিন্তা বাড়িয়া গেল, আর একবার দেখানো মানে আবার ঐ টাকা, এ ছাড়া ঔষধপত্রের ও রোগীর পথ্যের খরচ তো আছেই।

"যাহা হউক ঔষধ ও পথ্য -ব্যবস্থায় পিতার বেশ উপকার দেখা গেল। সুতরাং যে করিয়াই হউক আরও বত্রিশ টাকা যোগাড় করিয়া এবং পূর্বেকার বত্রিশ টাকা সমেত চৌষট্টি টাকা লইয়া পুনর্বার সার্ নীলরতনকে রোগী দেখাইলাম। ব্যবস্থায় উপকার হইয়াছে শুনিয়া তিনি প্রসন্নমুখে আমার পিতাকে বলিলেন, 'আপনার রোগ ধরা পড়িয়াছে এবং সারিবেও, তবে সময় লাগিবে; সুতরাং আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন। ঔষধ এখান হইতে লইয়া যাইবেন, দেশে যাইলে পথ্যের ব্যবস্থা সহজ ও ভালো হইবে।'

এই বলিয়া তিনি আবার সযত্নে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে পুনর্বার পরীক্ষা করিয়া নূতন প্রেস্‌ক্রিপসন্ এবং আহারাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। উঠিবার সময় তাঁহাকে টাকা দিতে গেলে তিনি উঠিয়া আমার পিঠে হাত দিয়া চলিতে চলিতে হাসিমুখে বলিলেন 'তোমার বাবার কথায় বুঝিলাম তুমি এখানে কলেজের ছাত্র। তোমার কাছে তোমার বাবার চিকিৎসাই বড় কথা হওয়া ঠিক। ওই টাকা তুমি তাঁর ঔষধ-পথ্যে লাগিয়ো।' এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া অন্য রোগীকে লইয়া তাঁহার কন্‌সাল্টিং-ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। আমার পিতা ঐ ব্যবস্থায়ই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন প্রত্যেক পত্রে বা দেখা হইলে মুখে সার্ নীলরতনের সংবাদ লইতেন ও আমায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও মহত্ত্ব আমার পিতা কখনও ভুলেন নাই।"

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের জানা নাই এরূপ অনেক কিছুই (যেমন উপরের বৃত্তান্ত) অন্যের জানা আছে। ডাক্তার সরকার এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতেন না— অন্যের কাছে শুনিতেও চাহিতেন না।

এ দেশে রুগ্ন ও পীড়িত লোকের শুশ্রূষা ও আরোগ্য -ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট নাই, এই শতাব্দীর আরম্ভে তাহা আরও কম ছিল। এ দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য মেডিকাল কলেজও ভারতে অল্প কয়েকটি মাত্র ছিল। ডাক্তার সরকারের বিশেষ আগ্রহ ছিল এ দেশে ভারতীয় চিকিৎসকের কাছে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার চলন করার জন্য। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বেসরকারী কলেজে ঐভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রদিগের সকল দিকে সুবিধা হইবে। এই কারণে তিনি তাঁহার কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জনস অব্ বেঙ্গল স্থাপিত করেন এবং পরে আর-একজন চিকিৎসা-শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার ক্যালকাটা মেডিকাল স্কুলের সহিত যুক্ত করিয়া বর্তমান আর. জি. কর মেডিকাল কলেজের গোড়াপত্তন করেন। ঐ অন্যজনের নাম ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। এবং ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষাদানের ইতিহাসে তাঁহারও স্থান উচ্চে। প্রথমে ১৯১৫-১৬ সালে কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ নামে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কারমাইকেল সেই সময়ে বাংলার গবর্নর ছিলেন এবং ডাক্তার নীলরতন সরকারকে তিনি অতি বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধেয় লোক জানিয়া তিনি এই কলেজ স্থাপনে ও উহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দানে সম্মতি দিয়াছিলেন। এই কলেজ ও হাসপাতালের জন্য টাকা তুলিতে তিনি বহু পরিশ্রম ও নিজের অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। আমরা জানি, অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রাপ্য দক্ষিণা ছাড়িয়া দীর্ঘদিন্ চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক ধনী ব্যক্তির নিকট এইরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা আনিতেন। বস্তুতপক্ষে প্রথম দিকে এই কলেজ স্থাপনের জন্য যে সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা তুলিবার শর্ত লর্ড কারমাইকেল নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন সে টাকা ডাক্তার সরকারের অক্লান্ত চেষ্টা না থাকিলে কখনই উঠিত না।

এইভাবে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল -স্থাপনায় সাহায্য করেন। উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানেরই তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

তিনি ভারতীয় চিকিৎসকদিগকে সংঘবদ্ধ করার জন্য বহু চেষ্টা করায় ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া মেডিকাল কনফারেন্সে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ের ডাক্তার দেশমুখ উহার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরের কনফারেন্সে ডাক্তার সরকার রিসেপ্‌সন

কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে এবং পরে আলাপ-আলোচনায় এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি এরূপ যুক্তি ও তথ্য উপস্থিত করেন যে সেই কনফারেন্স সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে রাজি হয়। ১৯৩২ সালে তিনি এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকাল ক্লাবের স্থপয়িতা-প্রেসিডেণ্ট। ১৯২৩ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং তাহার পর ইহার 'পেট্রন' ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরি তিনি এই ক্লাবে দান করেন। এই ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে ডাক্তার সরকারের ৬১নং হ্যারিসন রোডের বাসভবনে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ -প্রতিষ্ঠার জন্য সার্ তারকনাথ পালিত, সার্ রাসবিহারী ঘোষ, খয়রা-রাজ প্রভৃতি ধনীগণ যে বিশাল সম্পত্তি ও বিরাট দান করেন, তাহার মূলে এই শিক্ষাব্রতী চিকিৎসকের প্রভাবই সর্বপ্রধান প্রেরণার আকর ছিল। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসায় দুর্লভ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্মল নির্লোভ ও নিরহংকার স্বভাব যুক্ত হওয়ায় এই পরম অমায়িক সজ্জন, উচ্চতম রাজপুরুষ ও ধনীমানী সমৃদ্ধ লোক হইতে সাধারণ দুঃখী দরিদ্র পর্যন্ত যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই সকলের কাছেই সম্মান মর্যাদা ও বন্ধুত্ব আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সেই কারণে ইঁহারই অনুরোধে সার্ তারকনাথ পালিত তাঁহার আপার সার্কুলার রোডস্থ (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বিশাল ভূসম্পত্তি প্রথমে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটকে ব্যবহার করিতে দেন। পরে উহা এবং বহু লক্ষ টাকা ও নিজের বাসভবন (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ্ ও বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের (এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আদি প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নীলরতন সরকার। বেঙ্গল টেকনিকাল স্থান পাইয়াছিল তারকনাথ পালিতের ঐ আপার সার্কুলার রোডের গৃহে ও উহার সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে। কিন্তু তখন আয় প্রায় কিছুই ছিল না। তখনকার ছাত্রদের কাছে শোনা যায় যে, একমাত্র আয় ছিল সকাল হইতে বেলা একটা পর্যন্ত ডাক্তার সরকারের সমস্ত উপার্জন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কার্যে তাঁহার সহায়তা ও পরামর্শ অকাতরে তিনি দিতেন। ১৮৯৩ সাল হইতে তিনি উহার ফেলো ছিলেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ তিনি উহার উপাচার্য ছিলেন। পরে ১৯২৪-১৯২৭ পর্যন্ত তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল অব্ আর্টসের প্রেসিডেণ্ট, কাউন্সিল অব্ সায়েন্সের প্রেসিডেণ্ট (১৯২৪-৪২), ডিন অব্ দি ফাকল্টি অব্ মেডিসিন (১৯৩৯-৪১) এবং ডিন অব্ দি ফাকল্টি অফ সায়েন্স (১৯৩৩-৩৯) ছিলেন। ১৯২০ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার য়ুনিভার্সিটিজ কংগ্রেসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডেলিগেট হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী ও জ্ঞানী হিসাবে তখন তাঁহার খ্যাতি বিদেশে ছড়াইয়াছে। সেই কারণে ঐ বৎসরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. সি. এল. এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় এল. এল. ডি. ডিগ্রী দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করে।

বিশ্বভারতীর তিনি 'প্রধান' ও ট্রাস্টি ছিলেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরেরও তিনি পরিচালক-সংসদের সভ্য ছিলেন। কলিকাতা জাদুঘরের তিনি একজন ট্রাস্টি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৪১

চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীকালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভৃতি-সহ নীলরতন সরকার উপস্থিত

সালে ডি. এস.সি উপাধি দেন এবং পরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের (Zoology) আসন তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিজের কৈশোর ও যৌবনে শিক্ষালাভে যে কষ্ট ও অন্তরায় তিনি পাইয়াছিলেন অন্যের ক্ষেত্রে তাহা যাহাতে না ঘটে সেই চেষ্টায় এই পরহিতকামী শিক্ষাব্রতী বাংলার শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকটির অগ্রগতির জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত ছিলেন।

তিনি নিজের চাতরার স্কুলের হেডমাস্টারির কথা এবং পরে ডক্টর অঘোর চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতা)-স্থাপিত গ্রে স্ট্রীটের স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাঁহার শিক্ষাব্রতের প্রথম সোপান মনে করিতেন। এই গ্রে স্ট্রীটের স্কুলে নরেন্দ্রনাথ দত্তও (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। শিক্ষার পথ সরল ও প্রগতিশীল করার চেষ্টা সেইজন্য তাঁহার মধ্যে কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। ১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন নিয়মাবলী-প্রণয়নে— যাহার ফলে বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইত্যাদি আই. এ. ও আই. এস.সি. এবং বি. এ., এম. এ. ও বি. এস.সি., এম. এস.সি. পরীক্ষায় ও শিক্ষা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়— ডাক্তার সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

তার পর আসে তাঁহার শিল্প-প্রযোজনার চেষ্টার কথা। নিজের শৈশব কৈশোর ও প্রথমযৌবনে বাঙালীর আর্থিক অসহায় অবস্থা প্রতিপদে অনুভব করার ফলে তাঁহার মনে ধারণা হয় যে ভারতীয় তথা বাঙালীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে তাহার একমাত্র পথ হইবে ফলিত-বিজ্ঞান অনুযায়ী শিল্প-প্রযোজনায়। তাঁহার এ ধারণাও ছিল যে বিদেশী শিল্পকে এ দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া দাঁড় করাইতে হইলে ভারতীয়দের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, কেননা এখানের কাঁচা মাল, শ্রমিক, জল, বাতাস সব-কিছুই ইয়োরোপ হইতে ভিন্ন প্রকারের এবং সেই কারণে প্রথম দিকে প্রতিপদে ভুল ও লোকসান হইবেই। বিদেশীয়েরা পারতপক্ষে সেইসকল ভুল ও লোকসান এড়াইবার পন্থা কোনো ভারতীয়কে ঠিক মত শিখাইবে না। কাজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ঐ সময় ও পয়সার লোকসান মূল খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে এই ছিল তাঁহার মত। এবং সেইজন্য বিভিন্ন শিল্পের ও ব্যাপারিক যোজনায় তিনি অকাতরে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। লাভ-লোকসানের হিসাব দেখিবার মত লোক তাঁহার কেহ ছিল না যে তাঁহার দিকটাই টানিয়া চলে। নিজের ডাক্তারী ও অন্য নানা কাজের মধ্যে অবসরও তাঁহার ছিল না যে এ বিষয়ে তিনি হিসাব বুঝিয়া সেইমত টাকা ফেলিবেন। কাজেই লাভ যাহা-কিছু এই অগাধ টাকা ঢালিবার ফলে আসে— টাকার হিসাবে বা অভিজ্ঞতার হিসাবে— তাহার সব-কিছুই পায় অন্য লোকে, তাঁহার ভাগে পড়ে খরচের ও লোকসানের অঙ্ক। ইহার জন্য তিনি কখনও এক মুহূর্তের জন্য আক্ষেপ করেন নাই।

নিজে নির্মলচিত্ত ও সৎ ছিলেন সেইজন্য অন্যের কথা সহজ ও সরল মনে বিশ্বাস করিতেন। বহু ভদ্রবেশধারী ঠগ বহুবার নূতন শিল্প প্রযোজনার বা সাধারণের উপকারের জন্য হিতকারী সভা বা অনুষ্ঠানের খরচ বলিয়া বিস্তর টাকা লইয়াছে। সেসকল তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না। তাঁহার টাকায় দেশের শিল্পপ্রগতির পথ পরিষ্কার হইল এবং সেই শিল্প বা ব্যাপারিক প্রযোজনার অভিজ্ঞতা দেশের কোনো লোক পাইল—এককথায় তাঁহার অর্জিত টাকা দেশ ও দশের অগ্রগতির সহায়ক হইল— ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, কেননা ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য।

এইভাবে তিনি ট্যানিং সাবান রঞ্জনশিল্প ও অন্য রাসায়নিক পদার্থের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ইত্যাদি কাজের কারখানা, চা-বাগান ও কয়লার খনি ইত্যাদিতে অজস্র টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব এবং অন্যের সততায় বিশ্বাস থাকায় অশেষ ক্ষতি ও ঋণের ভার বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নামিয়াছিলেন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যখন হয় সেই সময়। কংগ্রেসে অবশ্য তিনি ১৮৯০ হইতেই যোগ দিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশী-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিবার ফলেই শিল্পপ্রযোজনায় নামিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের নেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের কর্মসচিবের পদ গ্রহণ করেন। কিভাবে তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহার সামান্য বিবরণ আগেই দিয়াছি।

১৯১৯ সালে চরম ও নরম -পন্থীদের মধ্যে বিবাদ হইলে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়ান। 'লিবারেল পার্টি'র কার্যক্রমে কোনো প্রেরণা বা শক্তি না দেখায় তাহাতে তিনি যোগদান করেন নাই। বস্তুতপক্ষে তাঁহার মন ছিল চরমপন্থীদের দিকে, তবে নিজেকে জাহির করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরোধী ছিল, সেই কারণে তিনি তখনকার রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়ান। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ পূর্ণ ও প্রকাশ্য ভাবে রহিয়া যায়।

গান্ধীজি ও তাঁহার মধ্যে সশ্রদ্ধ প্রীতির বন্ধন ছিল। মতিলাল নেহরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাজে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবিত থাকিতে, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার সরকারের শর্ট স্ট্রীটের ভবনে থাকিয়া গিয়াছেন এবং পরে দার্জিলিংএ তাঁহারই গ্লেন ইডেন ভবনে থাকিয়া সেখানে কনফারেন্স করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র অসুস্থতার কারণে প্রথমবার মুক্তি পাইয়াছিলেন মেডিকাল সার্টিফিকেটে ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্বাক্ষর ছিল বলিয়া।

তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ১৯১২ সাল হইতে আনুমানিক ১৯৩০ পর্যন্ত। সেখানের কাজে বা তর্কে নিখুঁত তথ্যের উপর যুক্তি-স্থাপনাই ছিল তাঁহার রীতি। তর্কবিতর্কের মধ্যে তাঁহার অংশ গ্রহণ এতই ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ হইত যে সেখানেও তাঁহার সঙ্গে অসদ্ভাব কাহারও ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় গত শতাব্দীর শেষ দিকে। পরে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া আজীবন ছিল। দুজনেরই জীবন আদর্শবাদে ও ভগবদ্‌বিশ্বাসে প্রভাবিত ও আলোকিত ছিল, যদিও কর্মক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল দুজনার মধ্যে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অনেকেই তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তো 'ডাক্তারবাবু'র কথার ওজন দিতেন অন্য সকলের পরামর্শের উপরে, বিশেষত শারীরিক ব্যাপারে। তাহার কারণ, ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বুঝিতেন ভালো এবং তাঁহার মতামতকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে মানাইয়া লইয়া চলিতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) আশি বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। রোগের অবস্থা যখন নিদারুণ তখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় রাখা হয়। দীর্ঘ দিনের চিকিৎসায় রোগের উপশম হয়, কিন্তু তাঁহার শরীর ভয়ানক দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া আসে। রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার অভ্যাসমত স্নানাহার ও ওঠাবসা করিতে চাহেন। গৃহচিকিৎসক তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে (১৮৮২-১৯৩৫) বলেন যে উহাকে এসব বিষয়ে সামলাইতে না

পারিলে পুনর্বার ঐ রোগের আক্রমণ আসিবে এবং শরীরের এই নিদারুণ ক্ষীণ অবস্থায় তাহা মারাত্মক হইবে। কিন্তু বৃদ্ধের শরীরের অবস্থা যতই ক্ষীণ হউক মনের জোর ও জেদ অতি প্রবল ছিল এবং কোনো বিষয়ে বাধা পাইলে তিনি তাহা করিতে বদ্ধপরিকর হইতেন। দিনেন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে ঠেকাইবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁহাকে বলা যে, 'নীলরতনবাবু বারণ করিয়া গিয়াছেন'। তাহাতে কাজটা তৎক্ষণাৎ স্থগিত হইত এবং ডাক্তার সরকার আসিলে তাঁহার সম্মুখে বিষয়টা তোলা হইত। তিনি বুঝিয়া আপোস করিতেন।

একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ হুকুম করিলেন পেলেটির বাড়ি থেকে দুইরঙের আইসক্রীম আনাইতে, কেননা তিনি তাহাই খাইবেন। বাড়ির ডাক্তার বলিলেন, উহা এই অবস্থায় শুধু দুষ্পাচ্য নয়, অতটা শীতল পদার্থ খাইলে আবার ঠাণ্ডা লাগিয়া একটা বিপদ আসিতে পারে। দিনেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন 'নীলরতনবাবু বারণ করেছেন'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমে অবিশ্বাস করিলেন, কারণ আইসক্রীম সম্পর্কে কোনো কথা 'ডাক্তারবাবুর' সামনে বলার কোনোই কারণ এতাবৎ ঘটে নাই। দিনেন্দ্রনাথ তবুও পুনর্বার বলিতে রফা হইল যে ডাক্তার সরকার প্রত্যহ যেমন দেখিতে আসেন সেই রূপ আসিলে এ কথা তাঁহার কাছে তোলা হইবে। বলা বাহুল্য, ডাক্তার সরকার আসিতেই দিনেন্দ্রনাথ ও গৃহচিকিৎসক প্রথমেই এই কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

রোজ যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তাহা হইবামাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ আইসক্রীম খাওয়ার কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে তাহা আনাইয়া দেওয়া অতি আবশ্যক। ডাক্তার সরকার প্রথমে হাসিমুখেই বলিলেন 'ওটায় হয়তো কিছু ক্ষতি করবে, এখন ওটা থাক্ না'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে জোরের সঙ্গে বলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার এই শরীরটার সঙ্গে আমি ঘর করছি আজ আশি বছর। ওর কখন কোন্‌টা প্রয়োজন, কিসে ওর কতটা লাভ কতটা লোকসান, এ কথা আমার চেয়ে আর কে বেশি বুঝবে? আমি বুঝছি যে ওর এখন ঐ আইসক্রীম নিতান্তই প্রয়োজন, সেই জন্যেই বলছি।'

দিনেন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে, ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া ফলের স্বাদগন্ধযুক্ত দুইরঙা 'ওয়াটার আইস' অর্থাৎ আইসক্রীম সোডা জাতীয় পানীয় জমানো আইসক্রীম পেলেটির ওখান হইতে আনিতে বলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু কে বা কয়জন ছিলেন জানি না। কিন্তু বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া যাঁহাদের তিনি জানিতেন ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। এই সম্পর্কের কারণে ডাক্তার সরকারের সন্তানসন্ততিগণও রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ভালোবাসা যথেষ্ট পাইয়াছেন। ডাক্তার সরকারের দিক হইতে এই বন্ধুত্ব অসীম প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্বরূপ ছিল। কবিগুরু অসুস্থ হইলে বা তাঁহার বিদেশযাত্রা ইত্যাদি বিশেষ কাজ উপস্থিত হইলে ডাক্তার সরকার শত ব্যস্ততা ও দায় থাকা সত্ত্বেও সব-কিছু ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের নিকটে যাইতেন। যে বৎসর (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথ প্রথম চীনযাত্রা করেন, ডাক্তার সরকার তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া চীনযাত্রারম্ভের দিনে খিদিরপুর জাহাজঘাটায় যাইয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

যেবার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিসর্প রোগে আক্রান্ত হইয়া নিদারুণভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন,

সেবার সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার সরকার সকল কাজ ছাড়িয়া সঙ্গে কয়জন রোগনির্ণয়কারী চিকিৎসক লইয়া বোলপুর রওনা হইয়াছিলেন। সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বীজাণু ও রক্ত-পরীক্ষায় নিপুণ একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক চিকিৎসক ছিলেন যাঁহার সহিত ডাক্তার সরকারের স্নেহ ও বিশ্বাসের বিশেষ যোগ ছিল। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, সকলের জন্য প্রথমশ্রেণীর রেলটিকিট ক্রয় এবং দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান ঔষধ ক্রয়ের জন্য কয়েক শত টাকা ডাক্তার সরকার তাঁহাকে দিয়াছিলেন, যাহাতে টিকিট বা ঔষধ ক্রয়ের টাকার জন্য যাওয়াতে দেরি না হয়।

অনেক অবস্থাপন্ন 'আত্মীয় বন্ধু' সজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায় নিজের দায় নানা অজুহাতে তাঁহার উপর চাপাইয়া দিতেন। যাঁহারা প্রকৃত বন্ধু বা নিকটের আপনজন তাঁহারা ঐ কপট-বন্ধুদের এইরূপ ছলচাতুরীতে রাগ দেখাইলে তিনি শুধু হাসিয়া বলিতেন, "ও নিয়ে ভেবে কি লাভ?"

তাঁহার অতিথিবাৎসল্য ছিল ভারতবিখ্যাত। বোম্বাই মাদ্রাজ সিংহল হইতে বহুলোক তাঁহার গৃহে দিনের পর দিন, এমনকি মাসের পর মাস, থাকিয়া যাইতেন। বাঙালী বন্ধুর পরিচিত লোক সপরিবারে তাঁহার বাড়িতে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না এরকমও আমরা জানি, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজেদের সহিত ডাক্তার সরকারের মৌখিক পরিচয়ও ছিল না। দূর দেশ হইতে পরিচিত লোকের আত্মীয়-স্বজন রোগমুক্তির আশায় তাঁহার গৃহে আসিয়া বিনাখরচে চিকিৎসা ও আশ্রয় পাইত। দরিদ্র আশ্রিত জনের তো কথাই ছিল না।

প্রসিদ্ধ নগরনির্মাতা পাট্রিক গেডিসের (Sir Patrick Geddes) স্ত্রী লখনউতে টাইফয়েড-রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষ অবস্থায় সার নীলরতনের গৃহে আসিয়া মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার যন্ত্রণালাঘবের জন্য যাহা কিছু সম্ভব সবই ডাক্তার সরকার করিয়াছিলেন। গেডিস এই যত্নের কথা কখনও ভুলেন নাই, এ কথা তাঁহার পুত্র আর্থার বলিতেন।

তাঁহার ধর্মজ্ঞান প্রখর ও প্রগাঢ় ছিল। তিনি জীবন্ত ধর্মচেতনা বলিতে কি বুঝিতেন তাহা তাঁহার এক All-India Theistic Conference-এর (যাহা আগেকার দিনে নিখিলভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে হইত) সভাপতির ভাষণে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—

No form of religion has any life-value today, which fails to yield a living inspiration to social services— more specially the service of the lowly and the overburdened, the afflicted and the downcast, the oppressed and the fallen.

তিনি বলিতেন এইরূপ সেবাব্রত যাহাতে নাই সেরূপ ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস আত্মবিলাস মাত্র। এই বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনই ছিল তাঁহার জীবনবেদ, তাঁহার জীবনসংগ্রামের অস্ত্র।

বিংশ শতাব্দীর কাব্যসূচনা

ভবতোষ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলা কাব্যের ধারা পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায় বেগবতী হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই আরম্ভ হল রবীন্দ্রযুগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা আমাদের সাহিত্যে যত হয়েছে, রবীন্দ্রযুগের কাব্যপ্রবণতা ও কবি নিয়ে আলোচনা তত হয় নি। রবীন্দ্রনাথকেই একমাত্র আলোচনাযোগ্য প্রধান কবি মনে করেছি : রবীন্দ্রকাব্যের নিকষে যাঁর কাব্য যতটুকু খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁকে ততটুকুই উল্লেখ্য মাত্র বিবেচনা করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের চেয়ে এই শতাব্দীর বৃহৎকবিপ্রতিভার ছায়ায় পুষ্ট কবিদের কাব্যবিষয় ও কাব্যরীতি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এ কথাও স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই পথ প্রস্তুত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারা। গত শতাব্দীর শেষ দশকেই রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি লিখেছিলেন। এতে যে অভিনবত্ব, শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য নূতন ছন্দের ও স্তবকবন্ধের সৃষ্টিতে যে অপরিসীম নিষ্ঠা প্রকাশ পেল, তার ফলে কল্পনায় ও শব্দপ্রয়োগে অসতর্কতা বিংশ শতাব্দীতে আর ক্ষমার যোগ্য থাকল না। এই জন্যে মনে হয় বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আর যে দিক দিয়েই আসুক-না কেন, কাব্যচর্চার এটাই হয়েছে সর্বনিম্ন মান। তার একটা প্রমাণ এই যে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের শক্তিশালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়-নির্বাচনে ও অনুপ্রেরণায় হেমচন্দ্রের যুগের কবি হলেও ছন্দনির্মাণে ভাষাসচেতনতায় স্তবকরচনায় রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিল্পনিষ্ঠারই অনুগামী। হেমচন্দ্রের যুগের শৈথিল্য তাঁর কাব্যে নেই। এমন কবিও আছেন যাঁরা হেমচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় কাব্যসাধনা আরম্ভ করে অবশেষে রবীন্দ্রীয় শিল্পসৌন্দর্যবাদে আত্মসমর্পণ করেছেন। কবি কামিনী রায় এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) হেমচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে কবির নিজস্ব বিশেষত্ব থাকলেও হেমচন্দ্রের প্রভাবও সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর শেষ কাব্য 'দীপ ও ধূপ ' (১৯২৯) ও 'জীবনপথে'-তে (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের ছায়াও যথেষ্ট সঞ্চারিত। এই উত্তরণ-কাল সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্যও যথেষ্ট অর্থপূর্ণ—

'এখনকার বিচারে তাঁহার [হেমচন্দ্রের] রচনার মধ্যে অনেক ক্রটি পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু আমরা সেকালে কলাকুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।'[১]

কাব্যকে সামাজিক উপলক্ষে বদ্ধ না রেখে আর্ট হিসাবে চর্চা করবার আদর্শ রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন মানসী চিত্রা প্রভৃতি কাব্য লিখছিলেন, হেমচন্দ্র তখনও জীবিত এবং তাঁর অনুগামীরও কোনো অভাব ছিল না। বরং বলা যায় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও হেমচন্দ্রকে অনুগমনের চিহ্নই তখন সুলভ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর গুরু বিহারীলালের মতই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে ভাবমূলক কবিতা রচনা করছিলেন। অকিঞ্চিৎকর ব্যতিক্রম বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক প্রেরণায় কবিতা বিশেষ লেখেন নি। রবীন্দ্রকাব্যের এই নতুন সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। রোমান্টিকতা-বিরোধী স্পষ্ট ভাবের

---

১ 'কামিনী রায়', সাহিত্যসাধকচরিতমালা

কাব্য ও রোমান্টিক ভাবময় কাব্যের আদর্শ বাংলা কাব্যে কিছুকাল যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মোটামুটি তার একটা অবসান হল।

কিন্তু সত্যই অবসান হয় নি। কেননা এই দুই আদর্শের বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও যেমন, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেও তেমনি অব্যাহত ছিল। বিহারীলাল শিল্পপটু কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু ভাবমগ্ন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী কবি ছিলেন। এই ধরণের রোমান্টিক কল্পনা সেকালে সমাদৃত না হলেও দু জন প্রধান কবিকে প্রভাবিত করেছিল তাঁরা হচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়াল। সাধারণত আমাদের মধ্যে এই মত প্রচলিত যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে দুটি বিরোধী প্রবৃত্তি আমাদের দেশে জন্ম নিয়েছিল— মহাকাব্যের ও গীতিকাব্যের। কিন্তু বাঙালির স্বভাবগত গীতিপ্রাণতার ফলে প্রথম প্রবৃত্তি স্বল্পকালস্থায়ী একটি যুগ সৃষ্টি করে লুপ্ত হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় প্রবৃত্তিই জয়যুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথই তার প্রমাণ। কিন্তু এ কথা ভেবে দেখতে হবে মহাকাব্য লুপ্ত হয়েছে সত্য কিন্তু কল্পনারীতির দুই আদর্শ কোনো কালেই লুপ্ত হয় নি। মধুসূদন-হেমচন্দ্রের কাব্যে অশরীরী কল্পনার সূক্ষ্মতা ছিল না, ছিল স্পষ্ট স্পর্শগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গম্য কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠা। বিংশ শতাব্দীতে কাহিনীগত স্পষ্টতার আদর্শের স্থানে এল বাস্তবাশ্রিত স্পষ্ট এবং রোমান্টিকবিরোধী গীতিকল্পনা যার মধ্যে এক ধরণের রবীন্দ্রবিরোধের সুর শোনা গেল। এই নূতন রোমানটিকতাবিরোধীদের প্রথমে আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তার পর প্রমথ চৌধুরী ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মোহিতলাল মজুমদার ঠিক রোমান্টিকতাবিরোধী ছিলেন না, তবে এক অভিনব বাস্তববাদের প্রবর্তক হিসাবে এঁদেরই দলভুক্ত করতে পারি। এঁদের অনুবর্তী হচ্ছে কল্লোলগোষ্ঠী। সকলেই জানেন রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ছিল এঁদের বৈশিষ্ট্য।

২

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

'আর্যগাথায় যেমন বিশুদ্ধ গীতিমাধুর্যের নিষ্কলঙ্ক প্রকাশ আষাঢ়ে-তে তেমনি প্রকাশ নিদারুণ ব্যঙ্গরসের। একটি ব্যক্তিমনের প্রকাশ অপরটি সামাজিক মনের। অনেক সময়ে এ দুই গুণ একই মানসে থাকে, অনেক সময়ে থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা নহে, স্বাভাবিক অধিকারে ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গীতিমাধুর্য ও ব্যঙ্গরস দুটিই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক গুণ।'[২]

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতায় সামাজিক মনের এই বিশিষ্ট রূপ স্যাটায়ারের আকারে দেখা দিয়েছে বটে, 'মন্দ্র'-কাব্যে স্যাটায়ার আলাদা হয়ে আসে নি; সেখানে লিরিক এবং স্যাটায়ার মিশে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কল্পনা-ভঙ্গির সূত্রপাত করেছে। প্রমথনাথ আরও বলেছেন—

'সাহিত্যে লিরিসিজ্‌ম্‌ ও স্যাটায়ারের সার্থক সংমিশ্রণের মত কঠিন কাজ অল্পই আছে। বায়রণের ডন জুয়ান ও হাইনের অনেক রচনা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুরূহ শিল্পে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে বাংলা সাহিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভব একক।'[৩]

---

২ বাংলার কবি, পৃ ৭১

৩ বাংলার কবি, পৃ ৭৪

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরবর্তী দু জন কবিকে অনায়াসেই যুক্ত করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর কবিতাতে স্যাটায়ার এবং লিরিকের লক্ষণ একই সঙ্গে পাওয়া সম্ভব। সমালোচকমহলে মতদ্বৈধ হতে পারে এই নিয়ে যে, লিরিকের চেয়ে স্যাটায়ারের দিকেই প্রমথ চৌধুরীর কবিতার আকর্ষণ বেশি। তবু এই দিক দিয়ে তাঁর যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের নিকটসান্নিধ্যে থেকেও তিনি তা বিসর্জন দেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর কবিতার উপর মাত্র একান্ত নির্ভর না করে কাব্যবিচার দ্বারাও উভয়ের সহধর্মিতা প্রমাণ করা যায়। বিশেষ করে ভাষা ব্যবহারে উভয়ে সগোত্র। দুজনেরই ভাষা গদ্যাত্মক, সংলাপভঙ্গির অনুগত। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ক্ষুদ্রকায় বলে সংলাপভঙ্গি অত প্রকট নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র'-কাব্যের দীর্ঘ কবিতায় তা খুবই স্পষ্ট। শব্দের ব্যবহারে দুজনেই নিরঙ্কুশ। এ বিষয়ে পূর্বতন কবিতার সংস্কার দ্বারা তাঁরা কেউ নিয়ন্ত্রিত নন। নিরঙ্কুশ গদ্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ অবশ্যই শৈথিল্যজনিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শব্দ সম্পর্কে সচেতন ভাবনার যে অভাব দেখা যায়, এঁদের মধ্যে তা নেই। এ কথা বলা যায় যে সজ্ঞানেই তাঁরা এই বিশেষ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেও এ দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্তী বলে ধরে নিতে পারি। লিরিক ও স্যাটায়ারের মিশ্রণ -প্রয়াস তাঁর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সচেতন। বিশেষত তাঁর কবিতার তর্কভঙ্গি মৌখিক চলিত শব্দ ব্যবহার ও সংলাপরীতি দ্বিজেন্দ্রলালেরই পরবর্তী স্তর মাত্র। ছন্দের দিক দিয়ে এঁদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল দলমাত্রিকের সঙ্গে বিশিষ্ট কলামাত্রিকের গাম্ভীর্য মিশিয়ে এক নতুন 'স্বাভাবিক ছন্দ'ই[৪] উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বিদেশী স্তবকবন্ধ ব্যবহার করলেও নিয়েছিলেন বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিকে। যতীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছিলেন ছয়মাত্রার সরল কলামাত্রিক রীতিকে। এই ছন্দটির প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে যতীন্দ্রনাথের ছন্দব্যবহার ছিল আপাতবিভ্রান্তিকর (paradoxical)। এর সুপরিমিত ধ্বনিপর্বভাগ বরং লিরিকের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। ব্যঙ্গরসপ্রধান কাব্যে এই ছন্দটি কিভাবে সুপ্রযোজ্য হয়েছে, তা বিশেষ পর্যালোচনার বিষয়। যতীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—

'যতীন্দ্রনাথের কাছে কি পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতল ক্ষেত্রে এলেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে তিনমাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সে ছন্দেরই একটা নির্দিষ্ট সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারেব অমাবস্যার কবিতাবলী।

'আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলোজ্বলা রেশতোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন্ বারাঙ্গনা') বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন।'

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের 'সাংসারিক সমতল' 'প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্ক' এবং 'ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি'— এ সব কিছুরই

---

৪ এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। দ্র ছন্দ (১৯৬২)

সূচনা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে। কিন্তু সত্যই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবণতাকে যুক্ত করে কেউ দেখেন নি। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার মধ্যে যতীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেই যে তার সূত্রপাত ছিল, এ কথাটা শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের একটি ত্বরিত উক্তি ছাড়া আর কোথাও দেখি নি।[৫] বস্তুত কথাটা বিশদ পর্যালোচনার যোগ্য এবং প্রতিষ্ঠিতব্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে বাংলা কবিতায় যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে 'রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয়'। কারণ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ একটি অন্যনিরপেক্ষ সত্যবোধ— সে বোধ স্থির অপরিবর্তনীয়। তার থেকে গতিশীল চিন্তার সূত্রপাত হতে পারে না। কথাটা প্রকারান্তরে শশিভূষণ দাশগুপ্তও স্বীকার করেছেন। যতীন্দ্রনাথের প্রথম সুপরিচিত কাব্যগুলিতে, 'মরীচিকা' 'মরুশিখা' এবং 'মরুমায়া'য় এক কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন বিষয়ের উপলক্ষে। এই নির্বিশেষ অপরিবর্তনীয় সত্য ভাবনার ফলে তাঁর কাব্য একরকম নির্বেদকেই প্রশ্রয় দেয়। 'সায়ম্‌' থেকে কবিমনের যে পরিবর্তনের লক্ষণ পাওয়া যায় তা পরের কাব্যে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে এই পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়; এমনকি এর কারণও প্রথম দিকের কাব্যে নিহিত ছিল। তবে এ কথাও সত্য যে যতীন্দ্রনাথের কাব্যের সুরের পরিবর্তন নেহাতই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাংলা কাব্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু তাঁর কাব্যের সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি? আধুনিকতর বাংলা কাব্যের সেটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের এই সংশয় ও অবিশ্বাস একটা স্বয়ম্ভূ কিংবা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপলব্ধি রূপে আসে নি। অনেকটা পূর্বযুগের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসপ্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন। তার প্রমাণ তাঁর কবিতার বিশেষ প্রতিবাদপ্রবণ তির্যক্‌ ভঙ্গি। তিনি প্রধানত প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতিবাদই করেছেন। কোনো স্থির আদর্শ (সে আদর্শ নতুন হলেও) তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি কিংবা করতে চান নি। এদিক দিয়ে তাঁর কবিতার কোনো তত্ত্ব কিংবা বাণী নেই। পরের যুগকে প্রভাবিত করতে হলে একটি ভাবগত আদর্শ বা বাণী চাই যা অনুবর্তীদের কল্পনা ও চিন্তাকে রূপান্তরণে ও গঠনে সাহায্য করতে পারে। যতীন্দ্রনাথ যে সময়ের কবি, সেই সময়ে আর-একজন কবি পরবর্তীদের উপর প্রভূত প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন। তিনি মোহিতলাল মজুমদার।

মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ একই পর্যায়ের কবি। এই পর্যায়ই 'কল্লোল' প্রভৃতির আধুনিক কাব্যান্দোলনের পূর্বসূরী। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রভাব যেমন রূপের দিক থেকে এবং সংশয়-অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি-সৃষ্টিতে, মোহিতলালের প্রভাব তেমনি জীবনধ্যানে, বাস্তব-প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যসাধনায় অর্থাৎ প্রকৃতিপন্থায় নবমানবতাবাদে— রূপের দিক থেকে ততটা নয়। মোহিতলালের কাব্যের ভাষা ও ছন্দ ধ্রুপদী চালের গাম্ভীর্যে পূর্ণ। এর পিছনে আছে যথেষ্ট নিষ্ঠা ও সতর্ক উপস্থাপনা। এই কাব্যরূপ সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাকে সঙ্গী করা কঠিন। যতীন্দ্রনাথের ভাষার আটপৌরে ভঙ্গি সেজন্যই সহজব্যবহার্য। এই ভাষায় রচিত উজ্জ্বল শাণিত বচনগুলি সহজেই মুখে মুখে চলে যায়। পরবর্তী কালে কবিতাকে লোকজীবনের বাস্তবক্ষেত্রে নামিয়ে নিয়ে আসবার যে চেষ্টা হয়েছে যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা

---

৫ কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৫৭), পৃ ১৯৫

তার একটা পথনির্দেশ দিয়েছিল। মোহিতলালের কাব্যকলা সেদিক থেকে তেমন অনুসৃত হয় নি। আধুনিক বাংলা কাব্যের একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই যে নবীন কবিরা কোনো একজনের মধ্যে পূর্ণ আদর্শের সন্ধান পান নি। তাঁরা মোহিতলালের থেকে পেয়েছিলেন বাণী— প্রেতপুরী নাগার্জুন কালাপাহাড় রুদ্রবোধন পান্থ বুদ্ধ প্রভৃতি কবিতায়, আর যতীন্দ্রনাথ থেকে পেয়েছিলেন ভাষা ভঙ্গি ও রূপরীতি। মোহিতলালের দেহকৌতূহল এবং বাস্তব-সৌন্দর্যবাদ নবীন কবিগোষ্ঠীর পুরোধা বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কিছু আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত হরনাথ পাল।

মোহিতলাল আধুনিক বাংলা কাব্যের নূতন ধারার অন্যতম প্রবর্তক রূপে গণ্য হলেও রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার ও বরণ করেই কাব্যচর্চা করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে প্রধানত স্বীকার করেছিলেন কবিতাকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করার আগ্রহে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার ভাবে এবং ভাষাতেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবই বরং স্পষ্টতর। স্বপনপসারী নিশ্চিন্ত রূপোল্লাস পরের কাব্যে ধীর-গম্ভীর হয়ে বাণীরূপ গ্রহণ করেছে। মোহিতলালের প্রসঙ্গে তাঁর যেমন কাব্যকলাপরীক্ষার একটা নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি তাঁর ভাবকল্পনার আলোচনার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আছে। মোহিতলালের শেষের কাব্যে— 'হেমন্তগোধূলি'তে— উদ্যত বিদ্রোহিতা অনেকটাই শান্ত হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যতীন্দ্রনাথের মতোই এও তাঁর কবিশক্তির ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ। অবশ্য ভাবের পরিবর্তনকেই কবিশক্তির ক্ষয়িষ্ণুতা বলে না। তবু এই পরিবর্তন অধ্যাত্মবিশ্বাসের অভিমুখী বলে মোহিতলালের সেই যোদ্ধরূপ এর মধ্যে পাই না।

মোহিতলাল বাংলা কাব্যে যে নতুন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার 'আধুনিকতা' ছিল 'চিরকালের আধুনিকতা'। বাস্তবকে স্বীকার করার বলিষ্ঠ সাহসের সঙ্গে মানুষের নিত্যকালীন আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমের হাহাকার ধ্বনিত করেছিলেন তিনি। মানবাত্মার এই তৃপ্তিহীন পিপাসার কাব্যই মোহিতলাল রচনা করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় ভাব যেমন দুঃখবোধ, মোহিতলালের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় ভাবটি তেমনি কামনা। কামনার একটা স্থূল রূপ আছে, আবার তার একটা মহিমময় ব্যর্থতা ও সাফল্যের রূপও আছে। জীবনের প্রতি অনুরাগের আর একটি রূপ ফুটেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। বস্তুতঃ কবিরা কবি হন এই জীবনেরই প্রেমে। মোহিতলালের কাব্যেও প্রকৃতি মানুষ ও জীবনের প্রতি অপরিসীম মমতার রসসৃষ্টি হয়েছে। জীবনের এই নিত্যসৌন্দর্যবস্তুর শিল্পরচনার সাফল্যের দিকটিই হরনাথ পাল মোহিতলালের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। মোহিতলালের এই কাব্য বিশুদ্ধ অরূপের সাধনা নয় বলেই পরবর্তী কাব্যের আদর্শ এর থেকে পুষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু রূপ ও দেহজীবনের প্রতি আগ্রহ তাঁর যতই থাক্ রূপের মধ্যে অরূপের পিপাসাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে বিশ্বাসের ধ্রুবলোকে, যেখানে নীড় বাধে না আধুনিকের দল।

বস্তুত লক্ষ করলে দেখা যায়, মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথ কারও কাব্যের মূলেই কোনো যুগোচিত বা অন্য কোনো সাময়িক কারণ কিছু ছিল না, যার থেকে এই শ্রেণীর কাব্যের উদ্‌ভব হতে পারত। নজরুল ইসলামের কাব্যরচনার মূলে যেমন সাময়িক প্রবর্তনা ছিল, এঁদের কাব্যে সে রকম কিছুর সন্ধান মেলে না। এঁরা জীবন সম্পর্কে গভীরতর চিন্তা করেছেন। তাঁদের সেই গভীর অন্বেষণই বিচিত্র কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই

অন্বেষণ যতই গভীর হয়েছে ততই তাঁরা হয়েছেন উদ্‌ভ্রান্ত। একজন ব্যর্থ সন্ধানে নিরস্ত হয়ে বললেন—

একমাত্র সত্য এ যে! ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যাপারাবারে
মুক্তিতীর্থ মৃত্যুকারাগারে।

আর যতীন্দ্রনাথ জীবনটাকে অর্থহীন প্রলাপ ('a tale told by an idiot') বলে বিস্মরণের শান্তি খুঁজেছেন, শেক্সপীয়র যেমন বলেছিলেন—

Canst thou not minister to a mind diseased
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতে জীবনের যে দুঃখের রূপ ফুটে উঠেছে, তারই লিরিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে এই দুই কবির কাব্যে। শেক্সপীয়রের ক্লান্ত নায়করা প্রার্থনা করেছে ক্লান্তিহর ঘুম যা জীবনের দুঃখদহনকে ভুলিয়ে দেয়—

To die, to sleep,
To sleep: perchance to dream.

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের নিদ্রাবাচক শব্দগুলি বারবার সেই বেঁচে থাকার অপরিসীম ক্লান্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এই তুলনার দ্বারা বুঝতে পারা যায় এঁদের কাব্য সাময়িক উপলক্ষকে কিভাবে অতিক্রম করে গিয়েছে। নজরুলের কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য নেই।

এ বিষয়ে নজরুল নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দেশের এবং জাতির দুর্দিনে 'চিত্তসাগর মথন-করা চিন্তামণিমুক্তা' আহরণ করতে তিনি আগ্রহ দেখান নি। নজরুল ইসলামকে এই দুইজনের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় সত্য, কিন্তু মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ যেমন চেয়েছেন তিনি জীবনের রহস্যকে তেমন বুঝতে চান নি। নজরুলের মন একটি যুগের মন। প্রথম মহাযুদ্ধ, রাজনৈতিক আন্দোলন, জনজাগরণ প্রভৃতি সাময়িক সামাজিক উত্তেজনার সঙ্গে তাঁর কাব্য জন্মসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ। কথাটা নজরুলের প্রতি কটাক্ষ অথবা প্রশস্তি উভয় অর্থে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্ত বলছেন—

'তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথাবদনার জন্যেই শুধু নয়, স্বজাতি ও স্বদেশের অপমান অত্যাচার বেদনা ও লাঞ্ছনা-জনিত দুঃখের কারণেও কবি বড় কিছু চিন্তা করবার অবকাশ পান নি। দুঃখবেদনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই নজরুলকে সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল থেকে পৃথক একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। উক্ত তিনজন কবির মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রজ্ঞা ও মননশীলতার অধিকারী না হয়েও নজরুল তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সর্বানুভূতির জোরেই বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ আসন লাভ করেছেন।'[৬]

৬ নজরুলচরিতমানস, পৃ ৩১১

বিবিধ কারণে, এটাই বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হয়ে রয়েছে। নজরুলের জীবনী-পাঠক এবং কাব্যপাঠক উভয়েই জানেন আবেগপ্রবণতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। আবেগের সঙ্গে যতটুকু সতর্ক অনুশীলন শিল্পসার্থকতার পক্ষে অত্যাবশ্যক, দুর্ভাগ্যক্রমে ততখানি সতর্কতা তাঁর ছিল না; বরং তিনি এই সতর্কতাকে প্রকারান্তরে উপহাসই করে গিয়েছেন। এজন্য মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যভাষায় ছন্দ ও শব্দভাবনায় যে ক্লাসিক রীতির প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও উদ্যম করে-ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর পর যা সত্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল সেই উদ্যম স্বল্পকালস্থায়ী একটা পর্যায় সৃষ্টি করে নিঃশেষ হয়ে গেল। নজরুলের আকস্মিক উদ্দামতা শিল্পের নিষ্ঠা সংযম ও গভীরতাকে পর্যুদস্ত করে যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্যকেও জনরুচিতে ম্লান করে দিয়েছিল।

নজরুলের কাব্যসমালোচকই এ কথা বলেছেন যে—

'বস্তুত আবেগপ্রাবল্যই বিদ্রোহ বিক্ষোভ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কবিতাকে সহজেই আবেদনপূর্ণ করে তুলতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে আবেগজনিত হৈচৈটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রজ্ঞার দ্বারা এই আবেগ যথাযথভাবে চালিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে নজরুলের আবেগপ্রধান কবিতায় একঘেয়েমি দেখা দিয়েছে এবং তাতে পরিপক্কতার কোনো রঙ্ ধরে নি। প্রেম-বা প্রকৃতিসম্পর্কিত কবিতাবলীতে নজরুলের হৈচৈ ও চড়া গলার স্বর খুবই কম। এখানে কবি আশ্চর্যভাবে রসনিমগ্ন। এইসব কবিতায় উদ্দীপনার পাশাপাশি একটি গ্রাম্যপ্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়।'[৭]

অনেকেই মনে করেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাতেই নজরুলের সত্যকার সাফল্য ঘটেছে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে গভীরতা ও সাময়িকতা দুয়েরই আকর্ষণ ছিল। এতে তাঁর অনেক বড় কবিতারই রস বিচলিত হয়েছে। সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই একটি দৃষ্টান্ত। মোহিতলালের গদ্যকথিকা 'আমি' (মানসী ১৩২১ পৌষ) নজরুলকে প্রেরণা দিয়েছিল, এটা স্বাভাবিক কিন্তু মোহিতলাল-কল্পিত মৃত্যুহীন প্রাণের বিদ্রোহ-মহিমা নজরুলের কবিতায় দেশ এবং কালের সাময়িক বিদ্রোহিতায় পরিণত হয়ে দ্বিধা ঘটিয়েছে তাও লক্ষ না করে পারা যায় না।

কিন্তু বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ভাবের আদর্শ রবীন্দ্রনাথে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল সেই বিস্ময় বাংলার কবিকে কিছুদিন পর্যন্ত চকিত করেছে এ কথাও সত্য। এই শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সার্থক অনুসরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় এবং প্রিয়ম্বদা দেবী বিশেষ স্মরণীয়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এঁরা রবীন্দ্রানুগামী বলে বর্ণিত হলেও বিশুদ্ধ রসের বিচারে এঁদের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। এঁদের অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-স্টাইলকে নিজের নিজের প্রয়োজনে প্রযুক্ত করেছে। সতীশচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের শব্দচয়নবৈশিষ্ট্যই যে অক্ষুন্ন ছিল তা নয়, রবীন্দ্রমানসের 'অশরীরী আনন্দে'র স্পর্শও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবী আয়ত্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সংহত পরিমিত ক্ষুদ্রকায় কাব্যরূপ। রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর কাব্যে এসেছিল অর্থগভীরতা। ব্যাপ্তি নয়, গভীরতাই তাঁর কবিতার গুণ।

---

৭ নজরুলচরিতমানস, পৃ ৩৩১

এই দুই কবির এই দুই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রপ্রভাবের ফল। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য বিহারীলাল-প্রবর্তিত সৌন্দর্যবাদের ফল। সেকালের দিনে এই রোমান্টিক সৌন্দর্যবাদকেই কাব্যরচনার উপজীব্য করেছিলেন অক্ষয়কুমার বড়ালের মত কবি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁদের কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরবর্তী তদনুগামী কবিদের সাদৃশ্য কোথায়? সে যুগ প্রধানত হেমচন্দ্রের যুগ। বস্তুগ্রাহ্য পরিমিত স্পর্শক্ষম কল্পনার জগৎ ছিল সেকালের ভাবজগৎ। সেকালের সৌন্দর্যবোধও ছিল এমনি বস্তুগ্রাহ্য ও স্পষ্ট। বিহারীলালের সারদামঙ্গলেও তাই ক্ষীণ হলেও একটি কাহিনীর কাঠামো না থেকে পারে নি; দ্বিজেন্দ্রনাথ তো রূপক সৃষ্টি করে নির্বিশেষকেই সবিশেষ করতে চেয়েছেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যেও আমাদের বাঙালি জীবনের সুপরিচিত পরিবেশের স্পষ্টতা অক্ষুণ্ণ। তাঁদের কাব্যভাষা, অনেক সময়েই মনে হয়, যেন লিরিকের ভাষা নয়। সেকালের কাহিনীকাব্যের ভাষাকেই কবিরা লিরিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র। গীতিকবিতার ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যখন শব্দকে পরিমিত অর্থের গুরুভার থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে ব্যঞ্জনা ও সুরের ঐশ্বর্যে সম্পন্ন করলেন, বাংলা গীতিকাব্য তখন সত্যই আপন ভাষা খুঁজে পেয়েছিল; এই বিশিষ্ট ভাষা বা স্টাইলকেই রবীন্দ্রানুগামী কবিরা ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যভাষার সংগীতধর্মকে পরের যুগে বিশেষ ভাবে চর্চা করেছেন চার জন— যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়।[৮] এঁরা সবাই বিশ্বাস ও আশ্বাসের কবি। জীবনের রুদ্র জিজ্ঞাসার রূপ এঁদের কাব্যে নেই। এমনকি কেউ কেউ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসংস্কারের সঙ্গে এঁদের যুক্ত করে বিচার করেছেন। মধ্যযুগোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের নানা আদর্শের উদয়-বিলয়ের সঙ্গে এঁদের যেন কোনো যোগই ঘটে নি। প্রকারান্তরে এটাই মেনে নিতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় সৌন্দর্যবাদী কবির কাব্যেও চলচ্চিত্ততার যে লক্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তা নেই। বাংলার প্রকৃতিতেই যে এঁরা শুধু নির্ভর করেছেন তা নয়, বাংলার যে সংস্কৃতির একটা নিজস্ব সাধনা ও সিদ্ধি ছিল এঁরা তারই দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধে বিশী মহাশয় যখন বলেন যে, তাঁর মধ্যেই 'রবীন্দ্রপ্রভাব ন্যূনতম' তখন কথাটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকলেও কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। 'রবীন্দ্রপ্রভাব' শব্দটা আমরা বিশেষ এক অর্থেই গ্রহণ করে থাকি। আধুনিক রবীন্দ্রবিরোধী আদর্শের প্রসঙ্গেই এই শব্দটার বিশেষ প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তার নির্বিশেষ সৌন্দর্য -সাধনার সূত্রে দেশ ও কালকে অতিক্রম করে গিয়েছে, কুমুদরঞ্জনের মত কবিরা সেই কাব্যপ্রকৃতির দ্বারা ততখানি প্রভাবিত না হয়ে নাগরিক পাঠকের কাছে প্রায় বিগত বাংলার পল্লীজীবনের সৌন্দর্যে স্বেচ্ছালগ্ন হয়ে থাকলেন।

বাংলা কাব্যের এই দুই আদর্শ একবার সমন্বিত হবার চেষ্টা করেছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে। এর একটা প্রমাণ এই যে রোমান্টিক এবং রোমান্টিকতাবিরোধী দুই আদর্শের কবিই প্রথম যুগে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গ্রহণ করেছেন; ইতিহাসের দিক দিয়েও সত্যেন্দ্রনাথকেই উভয়ের পূর্বসূরী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মোহিতলাল নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথকেও যেমন সত্যেন্দ্র-প্রভাব স্বীকার

৮ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য বা রমণীমোহন ঘোষ প্রভৃতি কবিরা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নন।

করতে দেখি করুণানিধান কালিদাস রায় প্রভৃতিকেও তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাবরীতির অনুসরণ করতে দেখি। দুই প্রকৃতির কবিই সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে নিজের নিজের আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তথ্যনিষ্ঠ প্রত্যক্ষতার কবি বলেই সাধারণত পরিচিত কিন্তু তিনি নিজে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে না পারলেও দ্বিজেন্দ্রলালের মত অশরীরী কল্পনারীতির বিরোধী ছিলেন না। তার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল এবং তাঁর কবিতায় সেই সূক্ষ্মতা সৃষ্টির প্রয়াস বিরল নয়। এটি লক্ষ করেছেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র—

'মননাতিরেক ও হৃদয়বিরলতা সাধারণভাবে সত্যেন্দ্র-কাব্যের এই দুই প্রধান লক্ষণের কথা মেনে নিয়ে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) থেকে শুরু করে তাঁর শেষ পর্বের রচনা অবধি সমান্তরাল এই দুটি প্রবণতারই প্রকাশ ঘটেছিল। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্মুখিতার প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আবার বস্তুবর্ণননিষ্ঠ শব্দ ছন্দ অলংকার কারুকৃৎ নিজস্ব সত্তার বহির্মুখিতাও তিনি পরিহার করতে পারেন নি। 'ফুলের ফসলে' ও 'কুহু ও কেকা'তে এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থেও এই দুই ধারার সমান্তরলতা স্পষ্ট।'[৯]

রবীন্দ্ররীতির প্রতি এই শ্রদ্ধার ফলে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার অভাবে খেয়ালি কল্পনার লীলাবিলাসে পর্যবসিত। তবে প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর বিশিষ্টতা স্বীকার করতেই হবে। ফুলের ফসলের কবিতায় তাঁর সাফল্য সমালোচকরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠার ফলে তাঁর প্রকৃতি হয়েছে চিত্রার্পিত। রবীন্দ্রমানসে প্রকৃতি যেমন রূপ ও রেখাকে অতিক্রম করে ভাবের প্রতীকে পরিণত হয়ে যায়, সত্যেন্দ্রনাথে তেমন অতিক্রমণের দৃষ্টান্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব এসব কবিতায় তিনি মেনে নিয়েছেন। প্রাকৃতিক বস্তুকে তিনি ভাবের রূপক-এ পরিণত করতে পারতেন না বটে তবু রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতি ও মানবমনের পারস্পরিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। শ্রীমতী সনজীদা খাতুন সত্যেন্দ্রকাব্যের বিষয়-বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে আলোচনা করেও তাঁর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তৎসত্ত্বেও শ্রীমতী সনজীদা যখন বলেন—

'সত্যেন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তখন পর্যন্ত বাংলা কাব্যে প্রধানত অবাস্তব কল্পনার চর্চা চলছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐ সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে যাওয়ায় ঐ পথে আর কোনো নতুন সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনায় কাব্যের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল। এ পথে সাহিত্যে বাস্তবতার অবতারণা হচ্ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনা এই পথটিকে পাকা করে দিল।'[১০]

তখন এই শেষের কথাটিও স্ববিরোধী না হয়ে প্রণিধেয় হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বসূরিত্ব আলোচনা করেছি। সত্যেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে সেই বিষয়ই যদি আবার উত্থাপনের প্রয়োজন হয়, তবে বুঝতে হবে সত্যেন্দ্রনাথেও সেই আদর্শই দেখা দিয়েছিল পরবর্তী কালেও যতীন্দ্রনাথকে

---

৯ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ (২য় সং), পৃ ১৩৯

১০ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ ১৯৯

যা উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তবে এ বিষয়ে শুধু মাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকে যুক্ত না দেখে উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্‌টিকতাবিরোধী হেমচন্দ্রীয় ধারার সঙ্গেই তাঁকে যুক্ত করে দেখাই সংগত। এ বিষয়ে মোহিতলাল যা বলেছিলেন তা খুবই অর্থপূর্ণ—

'আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী যে নবজাগরণ আনিয়াছিল—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও মনীষী তাহার যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন তাহারই সাধনক্ষেত্রের এক প্রান্তে সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কর্ষিত হইয়াছিল, তিনিও সেই নব্যসংস্কৃতির পতাকা বহন করিয়াছিলেন।'[১১]

নিভৃত বাণীসাধনা নয়, জাগ্রত জনসমাজের মধ্যে থেকে নিত্য নতুনের অগ্রগতির সঙ্গে জয়ধ্বনি যুক্ত করে একটা যুগের প্রতিনিধিত্ব যেমন সেকালে করেছিলেন হেমচন্দ্র তেমনি একালে করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের ধীশক্তি ও গ্রহণক্ষমতা অধিকতর পরিণত ছিল বলে এ বিষয়ে হেমচন্দ্রের চেয়েও তাঁর কাব্যবৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি এবং মার্জিত। সেকালের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মতোই তিনি যে বুদ্ধিবাদী তথ্যপ্রিয় সেই সঙ্গে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত নব ভাব-প্রবুদ্ধ কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মতই জীবনের শুভ পরিণামে ও মানবকল্যাণে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। এ যুগের সংশয় অবিশ্বাস বা ব্যঙ্গপরায়ণতা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। এই বিশ্বাস এবং শুভবোধের সঙ্গে এই শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন, শূদ্রগরিমার নবঅভ্যুত্থান এবং বিশ্বতোমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের আনন্দ সহজেই মিলিত হতে পেরেছিল। তাই নজরুলের মত আধুনিকমনা কবিদের পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ থেকে ভাবের প্রেরণা সংগ্রহ করা সহজ হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে কাব্যের শিল্পচেতনার ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের চিত্তপ্রবণতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মিল যতই থাক, সত্যেন্দ্রকাব্যের ভাষা ও ছন্দপরিপাট্যের সঙ্গে মধুসূদনকে বাদ দিলে আর কোনো কবির তুলনা হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আদর্শ অবশ্যই পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ভাষাগত শুচিতা, ছন্দগত কৌতূহল, পরীক্ষা ও সাদৃশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়। রবীন্দ্রপ্রবর্তিত শিল্পাদর্শের পর বাংলাসাহিত্যে শৈথিল্য একেবারেই সহ্য করা হয় না। শিল্পনিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ কখনও কখনও আতিশয্য দেখিয়েছেন, এ কথা সত্য। শব্দ ও ছন্দের অতিরিক্ত অনুশীলনে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে সমালোচকমহলেও দ্বৈমত্য নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরও কিছু বলবার থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিছুমাত্র বিনয় না করেও বলা যায় ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের দখল ছিল তাঁর চাইতে বেশি।— দ্রষ্টব্য সনজীদা খাতুনের গ্রন্থ, পৃ ১৮৯। তুলনার মধ্যে না গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যে সত্য, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। যেসব দুরূহ কিংবা অল্পপ্রচলিত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলিতে তাঁর পুঁথিগত ভাষার উপরে বিস্ময়জনক অধিকার প্রমাণিত করে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রর বিস্তৃত আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের যুগে বাংলা ভাষা ও শব্দসম্পর্কিত অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দচেতনাকে এরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

---

১১ অধুনিক বাংলা সাহিত্য, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'

এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে লোকপ্রচলিত খাঁটি বাংলা ভাষারীতিকে কাব্যে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এই ব্যাপারে তিনি কবিদের মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বপুরোবর্তী। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি অন্ততঃ এই বিষয়ে যথার্থ। বাংলা কবিতায় ফার্সী শব্দকেও তিনিই স্বাভাবিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই বাঙালি কবিদের সচেতন করে দিয়েছিলেন ফার্সী শব্দকে রোমান্টিক কাব্যকল্পনায় ব্যবহার করতে। আধুনিক কাব্য যখন প্রাত্যহিকতার পথে নেমে আসছে, সত্যেন্দ্র-প্রবর্তিত ভাষারীতির এই অফুরন্ত সম্ভাবনা তখন তাতে শক্তিসঞ্চার করেছিল; তাঁর ছন্দের পরীক্ষা ও উদ্‌ভাবন দুর্লভ শক্তির পরিচায়ক—এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য শ্রীমতী সনজীদার বইখানি দ্রষ্টব্য—কিন্তু তাঁর ছন্দকীর্তি তাজমহলের মতই আশ্চর্য এবং নিঃসঙ্গ। সেখানে তাঁর সার্থক এবং ব্যাপক অনুবর্তন নেই।

প্রবন্ধটি এই বইগুলির পর্যালোচনাসূত্রে লিখিত—

বাংলার কবি। প্রমথনাথ বিশী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ৪'০০ টাকা

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ৪'০০ টাকা

কবি মোহিতলাল। হরনাথ পাল। এস ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং। ৫'০০ টাকা

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার। ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয়। ২'৭৫ টাকা

নজরুলচরিতমানস। সুশীলকুমার গুপ্ত। ভারতী লাইব্রেরী। ১০'০০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ। হরপ্রসাদ মিত্র। কথামালা প্রকাশনী। ৮'০০ টাকা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সনজীদা খাতুন। ভারতী লাইব্রেরী। ৫'০০ টাকা

রবীন্দ্র-অভিধান। প্রথম খণ্ড। শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৬। ছয় টাকা।

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ। প্রথম খণ্ড: প্রথম পর্ব। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি। পরিবেশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা ৯। সাড়ে ছয় টাকা।

রবীন্দ্রশতবর্ষের উৎসব শেষ হল। এই একবৎসরব্যাপী উৎসব আলোকচিত্র, মাটির পুতুল এবং কবির পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনীতে অথবা রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রপ্রতিভা-বিশ্লেষণী বক্তৃতামালা পরিবেশনেই শেষ হয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবন কর্মসাধনা এবং সাহিত্যসাধনার আলোচনামূলক বহু বই এই এক বছরে প্রকাশিত হয়েছে। এসব বই শুধু বাংলায় লেখা হয় নি; হয়েছে ভারতের এবং বিদেশের নানা ভাষায়। এ ছাড়া কবির রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রচারও শতবার্ষিক উৎসবের উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে রচিত এই বইগুলি শতবার্ষিক উৎসবের স্থায়ী দান। বিদেশী কোনো লেখকের স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে এত বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। সংখ্যার প্রাচুর্যের জন্যই সামগ্রিক বিচারে গুণের দিকটা কিছু খাটো হয়েছে; কতকগুলি বই প্রচারপুস্তিকার মতই দুদিন পরে হারিয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালের পাঠকদের জন্য অনেকগুলি বই বেঁচে থাকবে। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসাহিত্যবোধক কয়েকটি রেফারেন্স বই।

রবীন্দ্ররচনার পরিমাণ বিপুল এবং বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সাধারণ পাঠক তাই রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠের জন্য সহায়ক গ্রন্থ কামনা করে। বিদেশের খ্যাতনামা লেখকদের রচনা পাঠের সহায়ক হিসাবে এ জাতীয় বই অনেক প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বসূত্র, ব্যক্তির নাম, জায়গার নাম, কিংবা অপরিচিত কোনো তত্ত্বের উল্লেখ পাঠকের নিকট প্রায়ই রচনা উপভোগের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লেখক ও পাঠকের মধ্যে কালের ব্যবধান যত বাড়ে এই জাতীয় সাহিত্যবোধক গ্রন্থের প্রয়োজন তত বেশি অনুভূত হয়।

ব্রাউনিং-সাইক্লোপিডিয়ার সংকলক বার্ডো এই শ্রেণীর সহায়ক গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Up to its appearance there was no single book to which the reader could turn, which gave an exposition of the leading ideas of every poem, its key-note, the sources— historical, legendary or fanciful— to which the poem was due, and a glossary of every difficult word or allusion which might obscure the sense to such readers as had short memories or scanty reading"

কোনো লেখকের রচনা উপভোগের জন্য উপরোক্ত তথ্যগুলি জানবার সুযোগ পেলেই সাহিত্যবোধক গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা চলে। তবে রেফারেন্স গ্রন্থের দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। প্রথমত, রেফারেন্স বই শুধু তথ্য পরিবেশন করবে, মত নয়; দ্বিতীয়ত, এই তথ্য সংক্ষেপে এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস করা আবশ্যক। সমালোচনা একটি বিশেষ মানসিকতার মাধ্যমে

পাঠককে সাহিত্যের পরিচয় দেয়। অপরপক্ষে সাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই বুদ্ধিমান রুচিশীল পাঠককে রসোপলব্ধির জন্য আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করে। সাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই থাকলে পাঠককে সমালোচনা-গ্রন্থের অরণ্যে পথ হারাতে হয় না।

রবীন্দ্ররচনাবোধক আলোচ্য রেফারেন্স বই দুটিতে এই আদর্শ কতদূর সফল হয়েছে তা এখনো সম্পূর্ণরূপে বলা চলে না। কারণ দুটি বইয়েরই মাত্র একটি করে ভাগ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ বই পেলেই সামগ্রিক বিচার সম্ভব।

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু -সংকলিত 'রবীন্দ্র-অভিধানে'র প্রথম খণ্ড আমরা পেয়েছি। সংকলক, তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন, 'যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি গান গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ ও চরিত্রের আলোচনা করবো এই রকমই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সমুদ্রের সব তরঙ্গ কে কবে ধরেছে। বাদ নিশ্চয়ই কিছু পড়েছে।'

বাদ কিছু-কিছু পড়েছে, কিন্তু সেগুলি হয়তো পাঠকদের চোখে পড়বে না। তবে সংকলক তাঁর অভিধানের ক্ষেত্র সংকুচিত করবার ফলে এর উপযোগিতা হয়তো কিছু কমেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যেসব নাম পূর্বসূত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন তাদের টীকা দেওয়া হয় নি। 'বন্দী বীর' পড়ে কেউ যদি 'অলখ নিরঞ্জনে'র অর্থ রবীন্দ্র-অভিধানে দেখতে চান তা হলে পাবেন না। আবার কিছু-কিছু তথ্য আছে যা পাঠক রবীন্দ্র-অভিধানে আশা করবেন না; যেমন, শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী অথবা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর পারিবারিক পটভূমিকা।

অনেকগুলি প্রসঙ্গই বেশ দীর্ঘ এবং বিস্তৃত করে লেখা। তার ফলে একমাত্র 'অ' অক্ষর দিয়েই একটি খণ্ড পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি অক্ষর শেষ হলে অভিধানের আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। সংক্ষেপে যথাযথ তথ্যটুকু সত্বর সংগ্রহ করবার সুযোগ না থাকলে রেফারেন্স বইয়ের উপযোগিতা হ্রাস পায়।

ভূমিকায় সোমেনবাবু বলেছেন, 'অভিধানের কাজ অর্থ পরিস্ফুট করা— সমালোচনা নয়'। কাযত অনেক ক্ষেত্রে এই আদর্শ রক্ষিত হয় নি। তিনি নিজে সমালোচনা না করলেও বিভিন্ন সমালোচকের মতামত এত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে কোনো কোনো প্রসঙ্গ সমালোচনাধর্মী হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অচলায়তন' প্রসঙ্গটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অচলায়তন সম্পর্কে সুকুমার সেন, বিনায়ক সান্ন্যাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ২৭শে অগ্রহায়ণের (১৩১৮) যে চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার উত্তর নয়; রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ডের ৫০৮ পৃষ্ঠার টীকা থেকে দেখা যায় যে আর্যাবর্তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি ললিতকুমারকে লিখেছিলেন। সোমেনবাবু বলেছেন, অচলায়তন প্রথমে যদুনাথ সরকারকে উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু "পরবর্তী মুদ্রণে আর উৎসর্গপত্র দেখতে পাওয়া যায় না।" রচনাবলীর অন্তর্গত অচলায়তনে উৎসর্গপত্রটি এখনও রয়েছে। অচলায়তন প্রথম কবে অভিনীত হয়েছিল এ তথ্যটি প্রায় এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে না। অথচ নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য।

সোমেনবাবুর কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁর অভিধান থেকে ছাত্র

শিক্ষক ও সাধারণ পাঠক রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। অনেকগুলি প্রসঙ্গ পৃথক প্রবন্ধের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি -সংকলিত রবীন্দ্র-রচনা-কোষ ভিন্ন জাতের বই। এখানে রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে তথ্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এটি হল রবীন্দ্র-রচনার ইন্‌ডেক্স। নির্ঘণ্টে সাধারণত বিষয় প্রসঙ্গ নাম ইত্যাদি স্থান পায়। কিন্তু এখানে 'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার শিরোনাম ও প্রথম ছত্র, গানের প্রথম ছত্র, গল্প-প্রবন্ধের শিরোনাম, গল্প-উপন্যাস-নাটকে বর্ণিত পাত্রপাত্রীর নাম, সকল প্রকার রচনায় উল্লিখিত ব্যক্তি, স্থান, দেবদানব, বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের উদ্ধৃতি, বেদ, উপনিষদাদির মন্ত্রাংশ, প্রবাদ-প্রবচনাদি, অর্থবোধক বিশেষ শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ, কবির রচিত উদ্ভট শব্দ এবং তাঁহার জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও বিষয়াদি বর্ণানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্র-রচনা-কোষের এই পর্বে সংকলিত হইয়াছে।'

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ দুখণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপরে আভাস দেওয়া হল। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের নির্বাচিত প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও টীকা থাকবে। এর ফলে পুনরুক্তি ঘটবে। প্রত্যেকটি খণ্ডের থাকবে কয়েকটি ভাগ বা পর্ব। আলোচ্য পর্বে স্বরবর্ণ শেষ হয়েছে। সুতরাং দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বইএর আয়তন বৃহৎ হবে।

সংকলকদের পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় তাঁরা একটি বইয়ের মধ্যে কন্‌করডান্স, কবিতার প্রথম লাইনের সূচী, বচনাভিধান, সাধারণ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলি একত্র করতে চেয়েছেন। নানা বিষয়ের সংমিশ্রণ পাঠকের নিকট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে শুধু এইটুকু হদিশ পাওয়া যাবে যে, একটি প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোথায় আছে। তার অতিরিক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা পাবার জন্য আবার আর-একটা বই খুঁজতে হবে। দুটি খণ্ড একত্র করলে এবং প্রসঙ্গগুলির ব্যাখ্যা থাকলে আয়তন যেমন কমত তেমনি বইএর উপযোগিতাও বাড়ত। রবীন্দ্রনাথের কোন্ বইএর কোন্ পৃষ্ঠায় একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে, শুধু এই নির্দেশটুকু পাবার জন্য খুব কম পাঠকই রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করবেন।

অন্য জাতীয় রেফারেন্স গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও রবীন্দ্র-রচনা-কোষে সাধারণ নির্ঘণ্ট বা ইনডেক্সের লক্ষণই স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধগ্রন্থের নির্ঘণ্ট নেই, এটা পাঠকদের অনেক দিনের অভিযোগ। কিন্তু বই থেকে পৃথক করে নির্ঘণ্ট করা কতদূর যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে ভেবে দেখবার মত। সংস্করণ পরিবর্তনের সঙ্গে প্রসঙ্গটি অন্য পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারে; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চাশ হাজার ক্রেতা আলোচ্য পর্বের রচনা-কোষ থেকে সহায়তা পাবেন না।

নির্ঘণ্ট হিসাবে বিচার করলেও প্রসঙ্গনির্বাচন এবং তাদের বিন্যাস সম্বন্ধে ত্রুটি চোখে পড়বে। "The standard index entry describes its subject accurately, briefly and under the initial heading where the majority of people seeking it will most naturally look." ইন্‌ডেক্সের এই সংজ্ঞা মনে রেখে রচনা-কোষের পাতার উপর চোখ বুলালেই দেখা যাবে ইনডেক্সের মূলসূত্র সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। 'আমি কোনোদিন পরীক্ষা দিইনি' 'আমি গান গাবার উদ্যোগ করেছিলুম' 'আমি চলেছি সমুদ্রপারে' 'আমি ছেলেদের ভালবাসি' ইত্যাদি বাক্যাংশ নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত করায়

জায়গা বেশি লেগেছে এবং এজাতীয় নির্ঘণ্ট পাঠকদেরও বিশেষ কাজে আসবে বলে মনে হয় না। যথাক্রমে 'পরীক্ষা' 'গান' 'সমুদ্র' 'ছেলে' এই মূল প্রসঙ্গগুলি নির্ঘণ্টে থাকলেই যথেষ্ট হত বলে মনে হয়। 'আমি' দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যত বাক্য আরম্ভ করেছেন তার কতকগুলি রচনা-কোষে নেওয়া হয়েছে, এবং অন্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, তার কারণ সংকলকরা দেন নি।

রবীন্দ্র-অভিধান এবং রবীন্দ্র-রচনা-কোষের সংকলকরা ব্যক্তিগত উদ্যমে যে বিরাট কাজের সূচনা করেছেন তার জন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বাংলা ভাষায় সাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই -সংকলনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন এঁরা। আশা করি, তাঁদের বই শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রচারে সহায়তা করবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-প্রণাম। বিশ্ব মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা ৭। পাঁচ টাকা।

কালপুরুষ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত। গ্রন্থবিতান, কলকাতা ২৬। তিন টাকা।

শতাব্দী শতক [১৮৬১-১৯৬১]। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত -সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা ১২। চার টাকা।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) তাঁর 'গোলাপগুচ্ছে'র "হারজিৎ" (১৩১৯) কবিতার নীচে একটি মন্তব্যে জানিয়েছিলেন, 'বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা, তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি।' বয়সে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথকে সে-কালের নবীন কবিদের শিরোমণি এবং নেতা হিসেবে চিনে নিতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) কিন্তু কটাক্ষ করে লিখেছিলেন—

না হয় না হবে মানে
রস চাই— কবিতার।
মিষ্টি হলে বেঁচে যাই
ভাবনা থাকে না আর
মাঝেতে ইংরাজী কথা
(জানা আছে কত দূর)· ·

'মানসী'র "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন" লেখাটিতে এইসব আঘাতে জর্জরচিত্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল—

কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই!
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে,
তাহা কি আমার দোষ?

কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)—
কেন তাহে তব রোষ ?

সে লেখার তারিখ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮। তার বছর-তিনেক পরেই তখনকার 'সাহিত্য' পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ নিজে এগিয়ে এসে কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া'র জবাব লিখেছিলেন। কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গবিদ্রূপের উত্তরে পাল্টা বিদ্রূপ নিক্ষেপ করবার সামর্থ্য ছিল তাঁর। তিনি জবাব দিয়েছিলেন—

বায়স কহিল হর্ষে, শোন পক্ষী সব
আম্রের মদিরা নিয়ে ওই যে ডাকিছে
উহু! উহু! শুনে ওর কুহু কুহু রব
আমার বায়স-প্রাণ ফাটিয়া যাইছে।

এ উক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, সুপ্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সেকালের সমকালীন কবি এবং পাঠক সকলেই যে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা নয়। পাঠকের পক্ষেও সামর্থ্যের ত্রুটি ছিল, লেখকদের দিকেও সমকালীনতার বাধা ছিল। কালীপ্রসন্নই একমাত্র প্রতিবাদী ছিলেন না। তাঁর কথা দিয়ে বিরোধী ধারার আলোচনা শুরু করলে একে একে অনেকের নাম মনে আসতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি একাধিক বিরোধী ছিলেন। গদ্যরচনার বিরুদ্ধ সমালোচনায় নেমেছিলেন প্রসিদ্ধ বিপিনচন্দ্র পাল। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে সে-প্রতিবাদের প্রতিবাদ লিখতে হয়েছিল। বড় শক্তিকে এরকম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হয়। মানুষের মন এক বিস্ময়। এসব ক্ষেত্রে মন সত্যিই বরণে অপেক্ষাকৃত বিমুখ, কিন্তু বিরোধে তার যেন আগ্রহের অন্ত নেই! কবিমনের স্বরূপ জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো কিছুদিন পরে তাঁর 'ক্ষণিকা'য় লিখেছিলেন—

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।

তার পর, আরো যাট-বাযট্টি বছর কেটে গেল। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত অথবা রবীন্দ্র-সম্পর্কিত অথবা ১৮৬১ থেকে ১৯৬১— এই শতবর্ষের মধ্যে লেখা নানা কবির কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশের উদ্যম এখন নিঃসন্দেহে অবাধ। অবাধ এবং স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-বিরোধের কথা একালেও যে পুরোপুরি অনুপস্থিত তা নয়। তবে, সে অন্য ভূমিকায়, অন্য অর্থে। বিশু মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'কবি-প্রণাম' বইখানিতে যথাক্রমে 'বন্দনা' 'সংগীত' এবং 'বিলাপ'— এই তিন বিভাগে রবীন্দ্র-প্রতিভার উদ্দেশে নিবেদিত এক শ পঞ্চাশজন কবির কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকায় সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একাশি জন কবির কবিতা-সংগ্রহ 'কালপুরুষ' সম্পাদনা করে ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, এর আগেও রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, সাধারণতঃ সেসব সংকলনে কবি-রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশেই শ্রদ্ধা-প্রীতি-বন্দনার ভাব ব্যক্ত হত। আর, 'আজিকের তরুণ কবিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মুগ্ধ, সন্দেহ নেই ; কিন্তু কবিতার বাইরেও যে তাঁর প্রতিভার অন্য আশ্রয় এবং উপকরণ আছে, এজন্যও তাঁরা গভীর আনন্দ অনুভব করেন।' তা ছাড়া আগেকার সংকলনে একালের অবশ্যস্বীকার্য প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক কবিই অনুপস্থিত ছিলেন। অতএব একালের নতুন সংকলনের প্রয়োজন মানতেই হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত -সম্পাদিত 'শতাব্দী শতক'এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্র-

নাথের জন্মকাল থেকে ধরে পরবর্তী একশ বছর— অর্থাৎ মধুসূদন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত— বাংলা কবিতার ধারাটি যে নানা সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নে চিহ্নিত, তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে তাই তাঁরা এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। সম্পাদকদের নিজেদের কথায়, 'মধুসূদন থেকে আধুনিক কালের তরুণতর কবি পর্যন্ত কত বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল তার পরিচয়ের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক,'— এবং 'একটি মাত্র সংকলন গ্রন্থে কোনো সময়ে সমস্ত কৃতী কবিকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না; সম্পাদককে এক জায়গায় এসে থামতেই হয়'। এই অনিবার্য অসম্পূর্ণতার কথা এই তিনখানি গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদক সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তিনখানি তিন রকমের সংকলন। 'শতাব্দী শতক' স্পষ্টভাবে পৃথক শ্রেণীর; 'কবি-প্রণাম' এবং 'কালপুরুষ' কতকটা সমশ্রেণীর হলেও দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিক প্রকৃতিভেদ আছে। প্রথমোক্ত বইয়ে মধুসূদন, বিহারীলাল, বলদেব, সুরেন মজুমদার ইত্যাদি সেকালের কবিরা তো আছেন,— একালে, ১৯৩৩ সালে যাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছেন, এরকম তিনজন কবিও আছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার আর হেমেন্দ্রলাল রায় এবং আরো কয়েকজনের জায়গা হলে ভালো হত। তবে, স্থান-সংকোচের কথা সম্পাদকের স্বীকৃতিতেই সূচিত। অতএব সে-বিষয়ে কোনো তীব্র অনুযোগ অবান্তর। 'কালপুরুষ' এবং 'কবি-প্রণাম' দুখানি সংগ্রহেরই লক্ষ্য অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দুখানি বইয়েতেই, 'শতাব্দী-শতকে তা নয়। 'কবি-প্রণাম'এর আসর দরাজ। তাতে প্রসিদ্ধ-অনতিপ্রসিদ্ধ সব রকম কবিই আছেন। অন্যক্ষেত্রে যাঁদের নাম আছে, কিন্তু কবি হিসেবে যাঁরা বিশেষ পরিচিত নন, এমন অনেক রবীন্দ্রভক্তেরও জায়গা আছে এই সম্মিলনে। বইখানির তিন বিভাগে যথাক্রমে 'সপ্তপর্ণতরুতলে বন্দনারত রবীন্দ্রনাথ' 'সংগীতরত রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ' এবং 'সপ্তপর্ণতরুলের শূন্য বেদিকা'— এই তিনখানি আলোকচিত্র এবং তা ছাড়া সুরম্য মলাটের উপর রবীন্দ্রনাথের রঙিন প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু ইত্যাদি কয়েক-জনের রচনা কতকটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বললে ভুল হবে না। তেমনি 'কালপুরুষ'এর সতীশচন্দ্র রায়ের 'শান্তিনিকেতন'ও উল্লেখযোগ্য। নানা কবি নানা কথা বলে গেছেন, বলছেন, বলবেনও। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রেখে 'কালপুরুষ' এবং 'কবি-প্রণাম' দুখানি সংকলনই এইদিক থেকে এক কবিতা-সমারোহের ধারণা জাগিয়ে তোলে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে কবি, তাঁর নির্বাচনে প্রশংসনীয় রুচির ছাপ পড়েছে। বিশু মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রিয় সাহিত্যিক, তাঁর ঢালাও আসরের আমন্ত্রণে অনেকেই যোগ দিয়েছেন, 'মুখবন্ধে' অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'বহুমুখী প্রতিভায় মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে বলে কবি সাহিত্যিক সংগীতকার রাজনীতিক শিক্ষাবিদ্ সমাজসংস্কারক ও ধর্মগুরু সকলেই সাগ্রহে এ সমারোহ-উৎসবে যোগদান করেছেন।' আর 'শতাব্দী-শতকে' দুইই আছে— তরুণ কবি আনন্দ বাগচীর কবিতায় যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে, বাকি অধিকাংশ রচনাতেই তেমনি অন্যান্য প্রসঙ্গ বিদ্যমান।

একই উপলক্ষ্যে এই তিনখানি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হওয়া সত্যিই তৃপ্তিকর ব্যাপার।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বরলিপি

আমি আশায় আশায় থাকি ।

আমার তৃষিত আকুল আঁখি ॥

ঘুমে-জাগরণে-মেশা প্রাণে স্বপনের নেশা—

দূর দিগন্তে চেয়ে কাহারে ডাকি ॥

বনে বনে করে কানাকানি অশ্রুত বাণী,

কী গাহে পাখি ।

কী কব না পাই ভাষা, মোর জীবন রঙিন কুয়াশা

ফেলেছে ঢাকি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

সা সা II সা -া সন্ -সা । রা -সা -রা -সা I রা -পা -া -া । -া -া -া -া I

আ মি আ ০ শা০ য়্ আ ০ ০ ০ শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I মা -[ধ]পা মা -জ্ঞা । -া -া মা মা I {মা -া মা -পা । পা -া পা -া I

থা ০ কি ০ ০ ০ আ মার্ তৃ ০ ষি ০ ত ০ আ ০

I -পা -ধা -ণা -র্সা । -ধা -র্সা [র্স]ণা ণা I পধা -া পা -া । (পা -ধা মা -া)} I

০ ০ ০ ০ ০ ০ কু ল আঁ০ ০ খি ০ আ ০ মা র্

I -পধা -মা মজ্ঞা -রা II

০ ০ ০ কা০ র্

-া -া II {মা -া পা -া । ণা[২] -পা না -া I না -া র্সা -র্রা । না -া র্সা -া I

০ ০ ঘু ০ মে ০ জা ০ গ ০ র ০ ণে ০ মে শা ০ ০

I মা -া মা -পা । পা -া পা -া I পা -ধা ণা -র্সা । [র্স]ণা -[ণ]ধা পা -া} I

প্রা ০ ণে ০ স্ব ০ প ০ নে ০ র ০ নে ০ শা ০

I র্রা -া -া র্জ্ঞা । র্রা -া র্জ্ঞা -া I র্রা -র্সা র্সা -া । -া -া -া -া I
দূ ০ র্ দি গ ন্ তে ০ চে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্রর্সা -না । না -া না -র্সা I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
কা ০ হা ০ রে ০ ডা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা -া র্রা -র্মর্জ্ঞা I র্রা -া র্সা -া । -া -া -া -া I
দূ ০ র্ দি গ ন্ তে ০ চে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্সণা -া । ধা -পা মা -ধপা I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া রা -সা II
কা ০ হা০ ০ রে ০ ডা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ কা র্

-া -া II {ধা -া ণা -া । ধা -া ধা -র্সা I ণা -া ণা -া । ধা -া পা -া I
০ ০ ব ০ নে ০ ব ০ নে ০ ক ০ রে ০ কা ০ না ০

I পধা -া -মা -া । পা -া -া -া I পর্সা -া -া -া । ণা -ধা পা -া I
কা ০ ০ ০ নি ০ ০ ০ অ ০ ০ ০ শ্রু ০ ত ০

I মা -া -ধপা -মপা । মা -জ্ঞা -া -া I জ্ঞা -া -া -া । রা -া সা -া I
বা ০ ০০ ০০ ণী ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ গা ০ হে ০

I সন্‌া -া -ন্‌া -া । সা -া -া -া} I {মা -া -পা -া । না -া না -া I
পা ০ ০ ০ খি ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ ক ০ ব ০

I না -া -া -া । র্সা -া -র্রা -া I র্সা -া -না -া । র্সা -া -া -া I
না ০ ০ ০ পা ০ ০ ই৲ ভা ০ ০ ০ ষা ০ ০ ০

I -া -া -া -া । মা -া -া -গা I মা -া -ণা -া । ধা -া ধা -মা I
০ ০ ০ ০ মো ০ ০ র্ জী ০ ০ ০ ব ০ ন ০

I ধা -া ণা -া । র্সা -া র্সা -া I ণা -ধা -র্সণা -ধা । পা -া -া -া} I
র ০ ঙি ০ ন ০ কু ০ য়া ০ ০০ ০ শা ০ ০ ০

I পর্সা -া ণা -ধা । পা -ধা মা -ধপা I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া রা সা II II
ফে০ ০ লে ০ ছে ০ ঢা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ "আ মি"

সম্পাদকের নিবেদন

গত এক বৎসরকাল দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রশতপূর্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রশতবার্ষিক-উৎসবসমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার এই সংখ্যা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের বিভিন্ন আলোচনা দ্বারা ভূষিত করে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হল।

এই সংখ্যার উদ্‌বোধন করা হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধ দিয়ে— 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। এই রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা থেকে রচনাটি এখানে উদ্ধার করা হল। রচনাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত 'অগ্রদূত' শীর্ষক প্রবন্ধে আছে।

গত সংখ্যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম ও ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত কবিসংবর্ধনার বিবরণ পত্রস্থ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় আর-একটি তথ্য পরিবেশন করা হল। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসব' উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের 'আশ্রমবাসিবৃন্দ' ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। সেই উৎসবের দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানপত্রটি সংরক্ষণের উদ্দেশে তার প্রতিলিপি মুদ্রিত হল; উক্ত উৎসব উপলক্ষে পূর্বদিন শান্তিনিকেতনে রাজা নাটক অভিনীত হয়, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা -সহ তার দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানসূচীর প্রতিলিপিও আমরা মুদ্রিত করলাম।

এই সঙ্গে আমরা দুজন রবীন্দ্রসমসাময়িক রবীন্দ্র-অন্তরঙ্গের কথা স্মরণ করলাম। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ও ডাক্তার নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করে তাঁদের প্রতি শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হল।

স্বী কৃ তি

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উৎসবে 'অর্ঘ্যাভিহরণ'এর অনুষ্ঠানপত্র ও রাজা নাটকের অনুষ্ঠানসূচী এবং চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ ও নীলরতন সরকার আলোকচিত্রদ্বয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও 'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি শ্রীসুকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের আলোকচিত্র তাঁর কন্যা শ্রীসুনীতি দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির আলোকচিত্র শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বিচিত্রা'-গৃহের ও পাথুরিয়াঘাটা-ঠাকুরবাড়ির আলোকচিত্র শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ -কর্তৃক গৃহীত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বর্ষসূচী

অষ্টাদশ বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৬৮ - আষাঢ় ১৩৬৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

অষ্টাদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬৮ - আষাঢ় ১৩৬৯ : ১৮৮৩-৪ শক

বিষয়সূচী

শ্রীঅমিয়কুমার সেন
- স্মরণ : 'শেষ রবিরেখা' ৭২
- রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা ৪২৬

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা
- রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর ১৫৬

কবিসংবর্ধনা
- পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ২৪৩
- ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে : 'রবীন্দ্রমঙ্গল' ২৪৮
- 'অর্ঘ্যাভিহরণ' ৩৭৮

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
- নীলরতন সরকার ৪৬৭

ক্ষিতিমোহন সেন
- শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান ৩২৪

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ৬৪
- গ্রন্থপরিচয় ৪৮৮

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর কালপারম্পর্য ও স্থানপটভূমি ২২১

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
- গ্রন্থপরিচয় ৩০৮

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- পত্রাবলী ৭৭

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- গ্রন্থপরিচয় ১০৪

শ্রীপরিমল গোস্বামী
- রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ৪১৯

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
- স্বরলিপি : 'নহ মাতা…' ২১০

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : পাহাড়পুরের স্মৃতি ২৮৬

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
- ভোরের পাখি ১১৪
- অগ্রদূত ৩৯৮

ফাদার পিয়ের ফালোঁ
- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৪

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
- গ্রন্থপরিচয় ৯৩

শ্রীবিনয় ঘোষ
- গ্রন্থপরিচয় ২০০
- ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ ৩৮৩

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
- ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান ৩৪

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্য ২৮৯

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিশ্বকবি ১৯৪

চিঠিপত্র ১৯৫

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান ৪৪৯

শ্রীভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাটকের নায়ক ৫৫

বিংশ শতাব্দীর কাব্যসূচনা ৪৭৭

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ ২৭৮

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৭৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র ১, ১১১, ২১৫, ৪৪৭

অভিভাষণ ২৬৬

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী ৩১৭

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৬

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন ৩৩৯

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি ৪৩১

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

স্বরলিপি : ‘আমার আপন গান’ ১০৭

স্বরলিপি : ‘এই উদাসী হাওয়ার’ ৩১২

স্বরলিপি : ‘আমি আশায় আশায় থাকি’ ৪৯৪

সজনীকান্ত দাস

বাংলার নবজাগরণের প্রত্যূষ-‘সন্ধ্যা’ ১৯৮

সম্পাদকের নিবেদন ২১৩, ৩১৫, ৪৯৭

শ্রীসুকুমার বসু

বিচিত্রা-পর্ব : স্মৃতিকথা ৪৩৭

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : জীবনকথা ২৭১

শ্রীসুকুমার সেন

রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৪৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে ২, ১৫২, ২১৭, ৩২৮

শ্রীসুনীতি দেবী

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৪৬১

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

কবি-গুরুদেব ২৫

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

গ্রন্থপরিচয় ৩০৭

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

গ্রন্থপরিচয় ২০৭, ৪৯১

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আশীর্বচন ২৫১

শ্রীহিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষা ৩৬৫

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অভিনন্দন ২৬৫

চিত্রসূচী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নুরুদ্দিনের শাদি ১১১

পারাবত ৩৬

আলোকচিত্র

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৭১

অর্ধশতপূর্তিতে কবিসংবর্ধনার উদ্যোগীবর্গ ২৫৪

'অর্ঘ্যাভিহরণ'-অনুষ্ঠানলিপি ৩৭৮

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ৭২

এসপ্লানেড। ১৮৩৮ ৩৯৩

গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির। ১৭৯২ ৩৯২

চিৎপুর রোডের একাংশ। ১৭৯২ ৩৯৩

চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ ৪৭২

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি ৩৮৪

ডাকঘর অভিনয়ের দৃশ্য ৪৪৫

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৮০

নীলরতন সরকার ৪৬৭

পঞ্চাশত্তম বৎসরে কবিসংবর্ধনার আমন্ত্রলিপি ২৪৩

পাথুরিয়াঘাটা-ঠাকুরবাড়ি ৩৮৫

পাহাড়পুরের অভিযাত্রী ২৮৬

ফোর্ট উইলিয়াম। ১৭৩৬ ৩৯২

'বিচিত্রা' ৪৩৮

'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি ৪৩৯

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৪৬৬

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬

মৃণালিনীদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৪৪

রবীন্দ্রনাথ ২৪৩

রবীন্দ্রনাথ : আনুমানিক পনেরো বৎসর বয়সে ৩২০

রবীন্দ্রনাথ গান্ধী টলস্টয় ৮

'রবীন্দ্রমঙ্গল' পুস্তিকার অনুষ্ঠানপত্র ২৪৯

রাজা নাটকের অনুষ্ঠানসূচী ৩৮১

'সন্ধ্যা' পত্রিকার একটি পাতা ১৯৮

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

পুষ্পচয়িনী ১

শ্রীনন্দলাল বসু

তুষারগিরি ২১৫

মানচিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানপটভূমি ২৩৪, ২৩৬

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত

বহুবর্ণ চিত্র ৩১৭
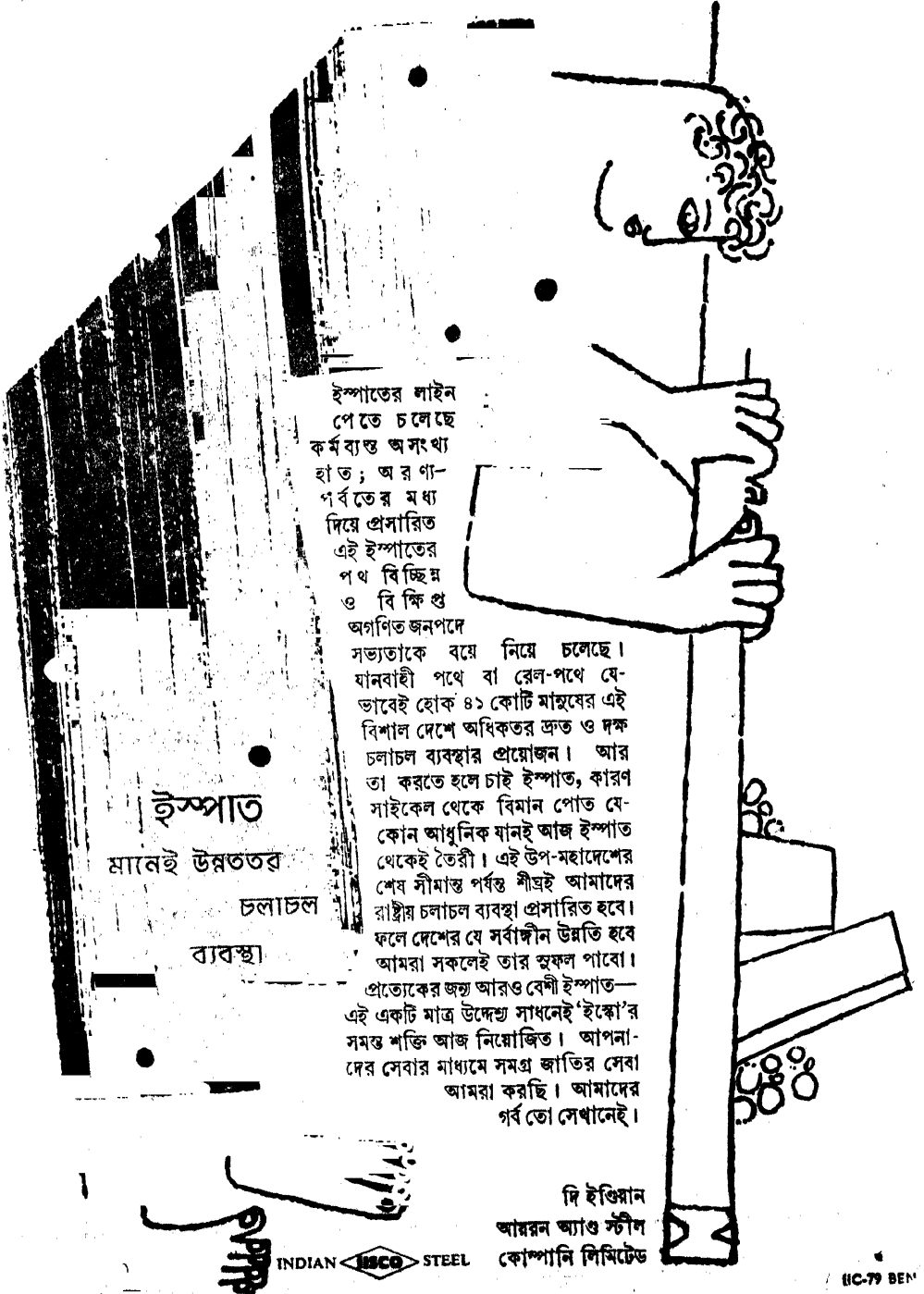
ইস্পাত
মানেই উন্নততর
চলাচল
ব্যবস্থা
ইস্পাতের লাইন পেতে চলেছে কর্মব্যস্ত অসংখ্য হাত; অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রসারিত এই ইস্পাতের পথ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অগণিত জনপদে সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। যানবাহী পথে বা রেল-পথে যে-ভাবেই হোক ৪১ কোটি মানুষের এই বিশাল দেশে অধিকতর দ্রুত ও দক্ষ চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োজন। আর তা করতে হলে চাই ইস্পাত, কারণ সাইকেল থেকে বিমান পোত যে-কোন আধুনিক যানই আজ ইস্পাত থেকেই তৈরী। এই উপ-মহাদেশের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত শীঘ্রই আমাদের রাষ্ট্রীয় চলাচল ব্যবস্থা প্রসারিত হবে। ফলে দেশের যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে আমরা সকলেই তার সুফল পাবো।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী ইস্পাত—এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত শক্তি আজ নিয়োজিত। আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র জাতির সেবা আমরা করছি। আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
INDIAN IISCO STEEL
দি ইণ্ডিয়ান
আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল
কোম্পানি লিমিটেড
IIC-79 BEN

অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণরৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৬০
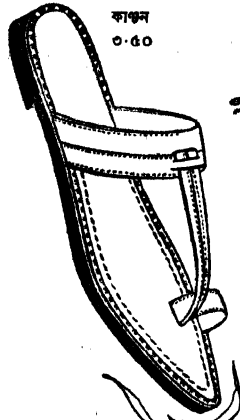
কাঞ্চন
৩·৫০
গরমে চলুন হালকা পায়ে
পা হাওয়ায় খেলবে
চলবে যেন আছে কি নেই
তবেই না গরমে
আরামে চলা। তার মানে
চপ্পলে চলা।
পা বেশি ঢাকবে না
এমন চপ্পল।
হাঁটবে হালকা এমন চপ্পল।
ভাঙবে না, মচকাবে না,
থাকবে ছিমছাম,
এক কথায় বাটার চপ্পল।
তরুণ
৫·২৫
কেতকী
৬·৫০
রীনা
৪·৭৫
বিক্রম
৫·৯৫
Bata